সামাজিক গণতন্ত্র রিডার ১

টোবিয়াস গোমবার্ট ইউ. এ.

সামাজিক গণতন্ত্রের ভিত্তি

AKADEMIE FÜR SOZIALE DEMOKRATIE

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG

ISBN 978-984-33-9769-0

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG

বাংলা সংস্করণ প্রকাশনায়:
ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস) বাংলাদেশ

প্রকাশকাল:
ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০১৫

সম্পাদনা: সাধন কুমার দাস, কর্মসূচি সমন্বয়কারী, এফইএস বাংলাদেশ

যোগাযোগ: হেনরিক মাইহাক, আবাসিক প্রতিনিধি, এফইএস বাংলাদেশ

বর্ণ বিন্যাস ও মুদ্রণ: স্ট্রিক্ এসোসিয়েটস্, মিরপুর, ঢাকা

ভাষান্তর: শাহজাদা এম. আকরাম

প্রচ্ছদের ছবি: ফ্রেডেরিক সিলন, ফটো আলটো

বিষয়বস্তুর জন্য নিজ নিজ অধ্যায়ের লেখকরা এককভাবে দায়বদ্ধ।

এখানে উপস্থাপিত মতামতের সাথে ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং-এর মতামত প্রয়োজনীয়ভাবে এক নাও হতে পারে।

সামাজিক গণতন্ত্র রিডার ১

টোবিয়াস গোমবার্ট ইউ. এ.

সামাজিক গণতন্ত্রের ভিত্তি

সূচি

মুখবন্ধ	৪
১. সামাজিক গণতন্ত্র কী?	৮
২. মূল চেতনা	১১
২.১. স্বাধীনতা	১২
২.২. সমতা/ ন্যায্যতা	১৯
২.৩ একতা	৩৬
২.৪ অন্যান্য চিন্তাধারা	৩৮
২.৫ মূল চেতনাগুলোর চর্চা	৪০
৩. সমাজের বিভিন্ন মডেলের মধ্যে তুলনা	৫৬
৩.১ বাজার পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র	৫৮
৩.২ উদারনৈতিক অবস্থান	৬৩
৩.৩ রক্ষণশীল অবস্থান	৬৬
৩.৪ সামাজিক গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র	৬৮
৪. থমাস মেয়ার-এর সামাজিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব	৮১
৪.১ শুরুর বিষয়	৮৪
৪.২ আপেক্ষিক উদারনৈতিকতাবাদ বনাম সামাজিক গণতন্ত্র	৮৮

৪.৩ অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা: মূল চেতনা, মৌলিক অধিকার ও মাধ্যম ত্রয়ী ৯১

৪.৪ ইতিবাচক ও নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা ৯৬

৪.৫ রাষ্ট্রের কর্তব্য ৯৯

৫. বিভিন্ন রাষ্ট্রের মডেল ১০১

৫.১ যুক্তরাষ্ট্র ১০২

৫.২ যুক্তরাজ্য ১০৮

৫.৩ জার্মানি ১১৬

৫.৪ জাপান ১২৩

৫.৫ সুইডেন ১২৯

৬. উপসংহারে শুরু ১৩৭

গ্রন্থপঞ্জী ১৪০

সহায়ক গ্রন্থ ১৪২

২০টি মূল শব্দ ১৪৭

সিরিজের প্রশংসা ১৪৮

লেখক পরিচিতি ১৫০

প্রথম বাংলা সংস্করণের মুখবন্ধ

সামাজিক গণতন্ত্র একটি সার্বজনীন ও আন্তর্জাতিক ধারণা। এটি এই দৃঢ় বিশ্বাস বহন করে যে, শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সম্পর্ক শুধু একটি দেশেই নয় বরং সকল দেশের রাজনৈতিক বিতর্ক ও বাস্তবতাকে একটি রূপ দিয়ে থাকে। আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অর্থনীতি, বিশ্বীয় চ্যালেঞ্জ এবং বিশ্ব-পরিবেষ্টনকারী যোগাযোগ নেটওয়ার্কের বর্তমান প্রেক্ষিতে পূর্বের যে কোনো সময় ও অবস্থার তুলনায় সামাজিক গণতন্ত্র অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। ত্রিশ বছরের অধিক সময় এশিয়ায় কাজ করার অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস) একটি শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী উন্নয়নে এবং জার্মানি, ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে সমঝোতা গভীরতর করতে অবদান রাখছে।

২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে এফইএস আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা/বাংলাদেশে এর কার্যালয় চালু করে। এটি এশিয়ায় একেবারে নতুন। সহযোগী সংস্থাসমূহকে সাথে নিয়ে, এফইএস বাংলাদেশ সামাজিক ন্যায়বিচারের ওপর অন্তর্ভুক্তমূলক সংলাপের সঞ্চালনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এর কেন্দ্রে রয়েছে শ্রমাধিকার, টেকসই উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক সহায়তা। একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে, এফইএস বাংলাদেশ সামাজিক গণতন্ত্রের মতবাদ ও মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের কাজের অংশ হিসেবে আমরা যেখানেই থাকি না কেন আমরা সামাজিক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে স্থানীয় ও বিশ্বীয় বিতর্ককে উদ্দীপিত করতে চায়। এই বিতর্কের কেন্দ্রে যে সকল প্রশ্ন রয়েছে: একুশ শতকে সামাজিক গণতন্ত্র কী অর্থ বহন করে? এর কেন্দ্রীয় মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্য কি কি? এটি বাস্তবিক অর্থে কিভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে?

বাংলাদেশে আমাদের কাজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এফইএস নিয়মিতভাবে প্রকাশ্য ফোরাম ও সংলাপের আয়োজন করে যেখানে সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক নীতিনির্ধারকদের মধ্য হতে বিভিন্ন অংশীজনদের একত্রে আমন্ত্রণ জানানো হয়। একটি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় যুবক শ্রেণী ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে তাদের ভূমিকার ওপর। এই মতবিনিময় আমাদের বিশেষভাবে উৎসাহ যোগায়, কারণ বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী দেশের চারটি মূলনীতির দুটিই হলো গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও পরবর্তী গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এই বিশ্বীয় আলোচনায় অনেক অবদান রাখতে পারে এবং বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কিছু শেখার অপেক্ষায় রয়েছি।

আমরা আনন্দিত যে সামাজিক গণতন্ত্রের ওপর এই বইটির প্রথম বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এটি মূলত এফইএস'র অ্যাকাডেমি ফর সোশ্যাল ডেমোক্রেসির জার্মান সহকর্মীরা প্রণয়ন করেছেন। এগুলো মূলত উপদেশমূলক ও শিক্ষামূলক রিসোর্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমরা আশা করি যে এই বাংলা সংস্করণটি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ, নীতি নির্ধারক, শিক্ষাবিদ, গবেষক, ছাত্র ও অন্যান্য পাঠকদের কাজে লাগবে। বাংলাদেশের সকল পাঠকদের কাছে সামাজিক গণতন্ত্রের ধারণা, তুলনা ও ব্যাখ্যা সর্বদা নতুন নাও হতে পারে। তৎসত্ত্বেও আমরা আশা করি বাংলাদেশ ও সারা পৃথিবীতে বিরাজমান সামাজিক গণতন্ত্রের তত্ত্বীয় ও বাস্তবিক ধারণার সংযোগ বুঝতে এই বইটি বিশেষ সহায়ক হবে।

H. Maihack

হেনরিক মাইহাক
আবাসিক প্রতিনিধি
এফইএস বাংলাদেশ

প্রথম জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধ

রাজনীতির প্রয়োজন দিক-নির্দেশনার ওপর স্বচ্ছ ধারণা। শুধু যারা তাদের লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে বলতে পারে তারা নিজেরা তা অর্জন করতে পারে আর অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এই আলোকে এই রিডারে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চাই যে একবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়। এর মূল চেতনা কী? এর লক্ষ্য কী? এটি কিভাবে অনুশীলনের মধ্যে নিয়ে আসা যায়?

একটি বিষয় পরিষ্কার: সামাজিক গণতন্ত্র সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য কোনো পাথরে খোদাই করা বাণী নয়; তবে একে প্রতিনিয়ত দর-কষাকষি ও গণতান্ত্রিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কাজেই এই বই কোনো তৈরি উত্তর দেবে না, বরং আরও বেশি পড়াশোনা ও আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করবে।

আমাদের প্রাথমিক পাঠক হচ্ছে অ্যাকাডেমি ফর সোশাল ডেমোক্র্যাসি'র শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা, যাদের জন্য এই বই পাঠ্য হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তবে এই বই অন্য যে কারও পড়া বা ব্যবহারের জন্য হতে পারে যারা সামাজিক গণতন্ত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে চায় বা এ বিষয়ে আগ্রহ আছে।

পরবর্তী পাতাগুলোতে আপনারা সামাজিক গণতন্ত্রের বিভিন্ন ধরন দেখতে পাবেন। স্বাধীনতা, ন্যায্যতা ও একতা হচ্ছে সামাজিক গণতন্ত্রের মূল চেতনা, যা শুরুর দিকের বিষয় হিসেবে কাজ করছে। এর ওপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই ধারণা অন্যান্য রাজনৈতিক মতবাদ থেকে কিভাবে ভিন্ন। সবশেষে থমাস মেয়ার-এর *সামাজিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব* কিভাবে পাঁচটি দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে সামাজিক গণতন্ত্রের চর্চার পেছনে কাজ করছে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

সামাজিক গণতন্ত্রের ভিত্তি রিডার এই সিরিজের প্রথম বই। অ্যাকাডেমি ফর সোশাল ডেমোক্র্যাসি'র অন্যান্য মডিউলের জন্যও পরবর্তী রিডারগুলো প্রকাশিত হবে।

আমরা টোবিয়াস গোমবার্ট ও মার্টিন টিমপে'কে ধন্যবাদ দিতে চাই। টোবিয়াস গোমবার্ট এই রিডারের বেশিরভাগ অংশের লেখক, আর মার্টিন টিমপে বিভিন্ন অংশে সহায়তা করেছেন। এছাড়াও তাঁরা অসাধারণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতায় সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করেছেন। তাঁদের একনিষ্ঠতা ও প্রয়োগের ফলেই এত কম সময়ে এই বই প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। তাঁরা ও জড়িত অন্যান্য লেখকদের তাঁদের অসাধারণ সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য।

অ্যাকাডেমি ফর সোশাল ডেমোক্র্যাসি'র চিহ্ন হচ্ছে একটি কম্পাস। অ্যাকাডেমির কর্মসূচির মাধ্যমে ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং বিভিন্ন মতবাদ ও ধারণার জন্য একটি কাঠামোর প্রস্তাব করতে চায়। আমরা খুবই আনন্দিত হব যদি আপনারা আমাদের কর্মসূচি ব্যবহার করে আপনাদের রাজনৈতিক পথ খুঁজে পান। অবিরাম জন-সম্পৃক্ততা ও বিতর্ক সামাজিক গণতন্ত্রের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই।

ক্রিশ্চিয়ান ক্রেল
পরিচালক
অ্যাকাডেমি ফর সোশাল ডেমোক্র্যাসি

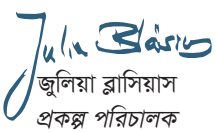

জুলিয়া ব্লাসিয়াস
প্রকল্প পরিচালক
সোশাল ডেমোক্রেসি রিডার্স

১. সামাজিক গণতন্ত্র কী?

সামাজিক গণতন্ত্র কী? চারটি উত্তর

কেউ হয়ত বলবে, 'সামাজিক গণতন্ত্র - নাম দিয়েই কি বোঝা যাচ্ছে না? গণতন্ত্রের ধারণার মধ্যেই নিহিত আছে যে সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে সাম্যের ভিত্তিতে এটি বিবেচনা করবে - এটি কি নিজেই ব্যাখ্যা দিচ্ছে না?'

অন্যরা বলবে, 'সামাজিক গণতন্ত্র - সামাজিক বাজার মডেলের মাধ্যমে কি ইতোমধ্যে এটি জার্মানিতে বিদ্যমান নয়?'

আবার অন্য অনেকের মতে, 'সামাজিক গণতন্ত্র - ইতোমধ্যে এসপিডি (সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি) এটির দাবিদার আর কাজেই এটি শুধু সোশাল ডেমোক্র্যাটদেরই মাথাব্যাথা; এটি তাদের তত্ত্ব।'

অন্যরা বলবে, 'সামাজিক গণতন্ত্র - কেন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র নয়? এটিই কি এর চিরন্তন অর্থ নয়?'

কিন্তু কে ঠিক?

ঠিক এই জায়গাতেই এই বিতর্ক অনিশ্চিত হয়ে যায়। কে ঠিক?

তাহলে প্রথম কাজটি হবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি ভাষায় আলোচনা করতে সম্মত হওয়া, যেন ভিন্ন ভিন্ন মতামতকে বোঝা ও ব্যাখ্যা করা যায়। আলোচনা যে কোনোখানে নিয়ে যেতে পারে, তবে প্রথমে শুরুটা ঠিক করতে হবে। ওপরের সামাজিক গণতন্ত্রের চারটি ধারণাই এ বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ রসদ জোগাচ্ছে।

কোনো কোনো ধারণা মৌলিক ভিত্তি ও ক্ষেত্র নিয়ে, যেমন বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে সামাজিক গণতন্ত্র থেকে কী প্রত্যাশিত?

অন্যদের মতামত এখন পর্যন্ত কী হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন করে; অন্য কথায়, বর্তমান সমাজের বাস্তবভিত্তিক পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ।

এর বিপরীতে তৃতীয় একটি পক্ষ জিজ্ঞাসা করে সামাজিক গণতন্ত্রের প্রতিনিধি কারা? এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন।

সবশেষে, আরেকটি পক্ষ রয়েছে যারা ভাবে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি ধারণা থেকে বের হয়ে কী লাভ? কাজেই প্রশ্নটি হচ্ছে সামাজিক গণতন্ত্রের মূল ধারণাটি কী আর অন্যান্য ধারণা থেকে এটি কিভাবে অন্যরকম?

কেউ সামাজিক গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলতে চাইলে প্রথমে পরিষ্কার করে নিতে হবে সে এটি বলতে কী বোঝে এবং কাদের সাথে কথা বলছে। সামাজিক গণতন্ত্রের কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নেই। এটি পরিবর্তনশীল আর মানুষ এর সাথে বিভিন্ন ধরনের চেতনা আরোপ করে। এই ধারণা সামাজিকভাবেই আরোপিত কারণ এটি সামাজিকভাবে কাজ করে, আর ভিন্ন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দলের পক্ষ থেকে হয় এর পক্ষে বলা হয় অথবা প্রত্যাখ্যান করা হয়।

আমাদের একটি সংজ্ঞা প্রয়োজন

ওপরের চারটি প্রশ্ন থেকে বোঝা যায়, এই শব্দ ব্যবহার করার আগে তার সংজ্ঞা ঠিক করে নিতে হবে আর পুরোপুরি সচেতন থাকতে হবে কী কী সামাজিক লক্ষ্য এর সাথে জড়িত।

'সামাজিক গণতন্ত্রে'র ধারণা তাত্ত্বিক বিতর্কে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। এখানে এর কোনো একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই।

সামাজিক গণতন্ত্রের সংজ্ঞা

কিন্তু এত ভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা থাকার ফলাফল কী? তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে ধারণাগত ভিত্তি ও তাদের ব্যাখ্যার মধ্যে তুলনা হবে, এসব ধারণার ভিত্তি পরীক্ষা করা হবে, এবং বাস্তবভিত্তিক ফলাফলগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে। আরও অনুসন্ধান করে দেখা হবে যে এসব সংজ্ঞা ধারাবাহিক ছিল কিনা, পরস্পরবিরোধী তথ্য ছিল কিনা এবং এর উৎসগুলো সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল কিনা।

তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে এগুলো নিশ্চিতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যারা এই ক্ষেত্রে জড়িত না, কিন্তু অবসর মুহূর্তে সামাজিক বা রাজনৈতিকভাবে সক্রিয়, তাদের পক্ষে এত গভীর তাত্ত্বিক দিক দেখা সম্ভব হয় না। তাহলে এসব তাত্ত্বিক সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করলে এখান থেকে কোথায় যাওয়া যাবে?

বাস্তব উদ্যোগ (practical action)

এই বই এই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান দেবে না, তবে এটি এই বিতর্কের শুরুটা করে দিতে পারবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক ধারণাগুলো দেখা হবে। পাঠককে তার নিজের খাদ্য খুঁজে নিতে হবে - এই বই তা পুরোপুরি মেটাতে পারবে না বা পারা উচিতও না - তবে এটি একটি আগ্রহের উৎস হিসেবে কাজ করবে।

বিভিন্ন ধারণা

কাজেই পরবর্তীতে আমরা কয়েকটি ধারণা নিয়ে বিবেচনা করব। এরপর এটি পাঠকের ওপর নির্ভর করবে যে সে কোনটিকে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মনে করবে।

পরবর্তী সূত্রগুলো শুরুর প্রশ্নগুলো থেকে উঠে আসে:

- আদর্শিক (normative) দিক, যা সামাজিক গণতন্ত্রের নীতি ও মূল চেতনাকে সন্ধান করে;
- তাত্ত্বিক দিক, যা সামাজিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামায়;
- বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) দিক, যা বিভিন্ন দেশে সামাজিক গণতন্ত্রের বাস্তবায়নকে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে।

এই তিনটি বিষয় তিনটি ভিন্ন অধ্যায়ে আমরা দেখার চেষ্টা করব।

তাত্ত্বিক দিক: থমাস মেয়ারের সামাজিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব

আদর্শিক দিকটি পরবর্তী দুইটি অধ্যায়ে (অধ্যায় দুই ও তিন) আলোচিত হবে, যেখানে বিস্তারিতভাবে স্বাধীনতা, ন্যায্যতা ও ঐক্যের মূল চেতনা নিরীক্ষা করা হবে, এবং দেখা হবে কিভাবে সমাজের বিভিন্ন মডেল (উদারবাদ, রক্ষণশীলতাবাদ, সমাজতন্ত্র/ সামাজিক গণতন্ত্র) চর্চার মধ্যে নিয়ে আসার চিন্তা করে।

তাত্ত্বিক দিকটি থমাস মেয়ারের সামাজিক গণতন্ত্রের তত্ত্বের ভিত্তিতে চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। থমাস মেয়ারের তত্ত্বটি বেছে নেওয়া হয়েছে কারণ এতে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে এবং কয়েকটি পর্যায় এতে অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম অধ্যায়ে বিভিন্ন দেশের উদাহরণের মাধ্যমে বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা থমাস মেয়ারের তত্ত্ব থেকেই নেওয়া। তিনি তাঁর বই প্র্যাক্সিস ডার সোজিয়ালেন ডেমোক্রাটি'তে (সোশাল ডেমোক্রেসি ইন প্র্যাকটিস) দেখিয়েছেন সামাজিক গণতন্ত্র আলাদা আলাদা হাতিয়ারের মাধ্যমে এবং একইসাথে বিভিন্ন মাত্রার সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করা যায়।

২. মূল চেতনা

এই অধ্যায়ে:

- সামাজিক গণতন্ত্রের মূল চেতনা হিসেবে স্বাধীনতা, সমতা/ ন্যায্যতা ও একতাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে;
- ঐতিহাসিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এসব মূল চেতনা বর্তমানে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত;
- জার্মান আইনসভায় প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলো কিভাবে মূল চেতনা ধারণ করে;
- শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পূর্ত ও উচ্চশিক্ষার সাপেক্ষে মূল চেতনার রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

স্বাধীনতা! সমতা! একতা!

ফরাসি বিপ্লবের মূল আন্দোলনের বিষয় ছিল 'স্বাধীনতা, সমতা, একতা!'। এগুলো এখনো রাজনৈতিক দলগুলোর মূল চেতনা বা নীতি। ঊনবিংশ শতকে বুর্জোয়া শ্রেণির উত্থানের সাথে সাথে এসব মূল চেতনার উদ্ভব আর সারাবিশ্বকে জয় করা শুরু করে বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। এসব চেতনা বর্তমানে একটি মানদণ্ডে পরিণত হয়েছে যার নিরিখে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজকে মাপা হয়।

একটি ভিত্তি হিসেবে জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদসমূহ

জাতিসংঘের আইনি স্তম্ভগুলোতেও এসব চেতনা প্রতিফলিত। জাতিসংঘের ১৯৬৬ সালের দুইটি মানবাধিকার সনদে মৌলিক নাগরিক (সিভিক), রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার স্বীকৃতি পায় এবং বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্র এগুলো অনুমোদন করে। এসব মূল চেতনা একটি বৈশ্বিক আইনি ভিত্তি গঠন করে। এসব মৌলিক অধিকার মূল চেতনাগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক আইনে রূপান্তরের কাজ করে।

তবে এরপরও বলতে হবে অনেকগুলো দেশেই মৌলিক অধিকারগুলো প্রয়োগ করা হয় না যেসব বিষয়ে তারা যৌথভাবে ঐকমত্যে পৌঁছেছিল। কিছু সনদ অনুমোদনকারী দেশও সগর্বে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে।

মূল চেতনা ও মৌলিক অধিকার

অনেক দেশেই মৌলিক অধিকারগুলো আসলেই প্রয়োগ হয় কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে, আর সেক্ষেত্রে মূল চেতনা নিয়ে আসলেই কাজ করার সুযোগ আছে। এক্ষেত্রে এগুলো শুধু তাত্ত্বিক ধারণাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে সামাজিক দর-কষাকষি আর ক্ষমতার সম্পর্কের বিষয়ে পরিণত হয়।

তবে একটি রাজনৈতিক অগ্রযাত্রা ঠিক করার ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার হিসেবে এসব মূল চেতনা ও তাদের প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কাজেই এসব মূল চেতনার ক্ষেত্রে কোনো না কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।

মূল চেতনা ও সাধারণ রাজনৈতিক ধারণা নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয় ২০০৭ সালে। জার্মানির প্রধান দুই দল, এসপিডি ও সিডিইউ, নতুন দলীয় কার্যক্রম হাতে নেয় যার অন্যতম লক্ষ্য ছিল কিভাবে এসব মূল চেতনা সংজ্ঞায়িত হবে ও বর্তমান রাজনীতিতে প্রয়োগ করা হবে।

রাজনৈতিক দিক-নির্দেশক হিসেবে মূল চেতনা ও মৌলিক অধিকার

সামাজিক গণতন্ত্রও আদর্শিক পর্যায়ে মূল চেতনা ও মৌলিক অধিকার থেকে নির্দেশনা নেয়। এদের আদর্শিক ক্ষেত্রে আর এগুলো আসলেই প্রয়োগ করা যাবে কিনা তার বিবেচনায় যেকোনো রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনার ক্ষেত্রে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়।

ঐতিহাসিকভাবে মূল চেতনাগুলোর সংজ্ঞা ও তারা যেভাবে একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত, তা অষ্টাদশ শতকের আলোকায়নের (Enlightenment) সময় থেকেই ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে।

বর্তমানে সার্বিকভাবে স্বাধীনতা, সমতা/ ন্যায্যতা ও একতা - এসব মূল চেতনার যেকোনো একটি বিষয় থেকেই শুরু করা যায়।

২.১. স্বাধীনতা

স্বাধীনতার গোড়া

কোনো বিতর্ক ছাড়াই বলা যায় স্বাধীনতা হচ্ছে এমন একটি মূল চেতনা যা সব রাজনৈতিক ব্যক্তি ধারণ করে। এটি আলোকায়নের আদর্শের সাথে হাতে হাত ধরে চলে, যা জার্মান ইতিহাসবিদদের মতে 'বুর্জোয়া' যুগের (সাধারণভাবে ১৮১৫ থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত)। জন লক, জাঁ জাক রুশো, ইমানুয়েল কান্ট ও কার্ল মার্ক্স-এর মত দার্শনিক এবং ক্রিটিক্যাল থিওরির প্রতিনিধিরা ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ভেবেছেন ও বর্ণনা দিয়েছেন কিভাবে স্বাধীনতার প্রয়োগ ঘটানো যায়।

স্বাধীনতার ওপর বিতর্ক তিনটি মূল প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত:
১. কিভাবে স্বাধীনতাকে সংজ্ঞায়িত করা যায়?
২. সমাজে কিভাবে স্বাধীনতার প্রয়োগ ঘটানো যায় বা নিশ্চিত করা যায়?
৩. সমাজে স্বাধীনতার মাত্রা কী?

কিভাবে স্বাধীনতাকে সংজ্ঞায়িত করা যায়?

ইংরেজ দার্শনিক জন লকের দেওয়া স্বাধীনতার সংজ্ঞা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

> *"মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতা হচ্ছে পৃথিবীর যেকোনো অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছ থেকে মুক্ত থাকা, এবং মানুষের ইচ্ছা বা আইনি এখতিয়ারের অধীনে না থাকা; তবে তার শাসনের জন্য শুধু প্রকৃতির আইনকে রাখা। সমাজে মানুষের স্বাধীনতা কোনো আইনি ক্ষমতার অধীনে নয়, বরং ঐকমত্যের ভিত্তিতে সাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে; কোনো ইচ্ছার প্রভাবে নয়, অথবা কোনো আইনের বিধিনিষেধের মধ্যে নয়, বরং যা সেই আইনের ওপর আস্থা জ্ঞাপনের মাধ্যমে পাওয়া যায় তা।"*
>
> (লক ১৯৭৭: ২১৩ছ; টু ট্রিটিজ অব গভর্নমেন্ট, প্রথম খণ্ড, অধ্যায় ৪)

লকের ধারণায় স্বাধীনতার তিনটি মাত্রা চিহ্নিত করা হয়: একজন ব্যক্তির নিজস্ব স্বাধীনতা, একজন ব্যক্তির নিজস্ব ভাবনা ও অনুভূতির স্বাধীনতা, এবং আইনগতভাবে প্রাপ্ত সম্পদ

জন লক (১৬৩২-১৭০৪) ছিলেন লিবারেলিজম-এর প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি।

লক 'এমপিরিসিজম'-এর ধারণা তৈরিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এমপিরিসিজম হচ্ছে মানুষ কিভাবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখে তার ওপর গভীর অনুসন্ধান। এই ভিত্তিতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার তুলনা হচ্ছে তত্ত্বের শুরু।

১৬৯০ সালে লক প্রকাশ করেন টু ট্রিটিজ অব গভর্নমেন্ট যেখানে তিনি ইংরেজ রাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তিকে নাড়া দেন, এবং স্বাধীনতার ভিত্তিতে একটি সামাজিক সংবিধান তৈরি করেন।

থেকে মুক্তি। স্বাধীনতার এই তিনটি মাত্রা অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন সংবিধানে ও মৌলিক মানবাধিকারের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন তত্ত্বে লকের সংজ্ঞাকে উল্লেখ করা হয়েছে আর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

লকের সংজ্ঞার মূল কথা হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবেই এসব স্বাধীনতা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাপ্য। অন্য অর্থে, এসব স্বাধীনতা সমাজে তৈরি হয় নি, বরং কোনো না কোনোভাবে 'আগে থেকেই ছিল'।

স্বাধীনতা ও স্বাভাবিক অধিকার

সমাজে এসব স্বাভাবিক অধিকারের 'রক্ষণাবেক্ষণ' শুধু পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সম্ভব। তখন এগুলো সমাজের ওপর ব্যক্তির দাবি হিসেবে পরিণত হয়।

বিভিন্ন দার্শনিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও লকের মূল যুক্তি এখনো শক্তিশালী। স্বাধীনতার ধারণা এখনো একটি মৌলিক চেতনা হিসেবে বিভিন্ন বিতর্কের সূত্র হিসেবে ব্যবহৃত। উদারনৈতিকতাবাদ-এর (Liberalism) একজন প্রধান প্রবক্তা হিসেবে জন লক এখনো বিদ্যমান।

সমাজে কিভাবে স্বাধীনতা বাস্তবায়িত ও নিশ্চিত করা যায়?

তবে সূত্র হিসেবে ক্রমাগত উল্লিখিত হলেও এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও মূল উৎস ছাড়া এটি ঠিকমত ব্যাখ্যা করা যাবে না এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে একে সরাসরি প্রয়োগ করা যাবে না। কিভাবে স্বাধীনতাকে সমাজে নিশ্চিত করা যাবে বা বাস্তবায়ন করা যাবে তা নিয়েই প্রশ্নের উদ্রেক হয়।

এটি ঐতিহাসিক বিতর্কের একটি সিদ্ধান্ত যে আলোকায়নের পরবর্তী অন্যান্য দার্শনিকের সাথে সাথে জন লক এই ধারণার বিরোধী ছিলেন যে প্রাকৃতিক অসমতার ভিত্তিতে স্বাধীনতার ঘাটতিকে মেনে নেওয়া সম্ভব। একটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ যেখানে রাজাদের শাসনকে ঈশ্বর-প্রদত্ত আইন বলে মেনে নেওয়া হত সেখানে প্রাকৃতিক সমতা ও সমান স্বাধীনতার ধারণা একটি বৈপ্লবিক ধারণা ছিল। তবে লক নিজেকে প্রাকৃতিক সমতা ও সমান স্বাধীনতার ধারণার মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নি, বরং সমাজে প্রাকৃতিক সমতাকে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

প্রাকৃতিক সমতা ও সমান স্বাধীনতা

তাঁর যুক্তির সারমর্ম হচ্ছে যে সমাজে চর্চার মাধ্যমে স্বাধীনতা ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজে চিন্তা ও অনুভূতির স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। আইনগতভাবে প্রাপ্ত দ্রব্য ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সক্ষম হওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজন একটি মুক্ত বাজার যেখানে সবার অভিগম্যতা রয়েছে। কাজেই প্রাকৃতিক স্বাধীনতা শুধু সমাজে একটি প্রক্রিয়া হিসেবেই রক্ষিত নেই, বরং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একে রক্ষা করতে হবে।

জন লকের স্বাধীনতার ধারণার ওপর রুশোর সমালোচনা

কিভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে তা নিয়েই জন লকের তত্ত্ব অষ্টাদশ শতকে সমালোচিত হয়। তবে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমালোচক ছিলেন জাঁ জাক রুশো, যিনি চারটি মূল ক্ষেত্রে লকের ধারণার বিরোধিতা করেছেন বা সম্প্রসারণ করেছেন।

১. একটি ভাল সামাজিক চুক্তি বাস্তব হবে শুধু তখনই যখন সমাজের প্রতিষ্ঠায় সব মানুষ নাগরিক অধিকার হিসেবে ফিরে পাওয়ার জন্য তাদের সব প্রাকৃতিক অধিকার ত্যাগ করবে।

২. সমসাময়িক বুর্জোয়া-রাজতান্ত্রিক সমাজের সামাজিক চুক্তিটি কোনো ভাল সামাজিক চুক্তি নয়।

৩. দীর্ঘমেয়াদি 'স্বাধীনতা' বাস্তবায়িত হবে যদি সব রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত শুধু আইনি প্রক্রিয়ায় নেওয়া হয়। শুধু তখনই প্রত্যেক নাগরিক প্রকৃতপক্ষে তাদের নিজেদের ইচ্ছার অধীনে থাকবে আর মুক্ত হবে।

৪. তবে রুশোর ক্ষেত্রেও 'স্বাধীনতা' উন্নয়নের ধারণার সাথে যুক্ত। রুশো বিশ্বাস করতেন প্রত্যেক মানুষের একটি 'বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র আছে যা অন্যগুলোর উন্নয়ন ঘটায়', যাকে তিনি বলেছেন 'পারফেকটিবিলিটে' (বেনার/ ব্রাগেন ১৯৯৬: ২৪)। এই 'বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র' পূর্ব-নির্ধারিত নয়, তবে সমাজের মধ্যে শিক্ষা ও বেঁচে থাকার সম্ভাবনার সাপেক্ষে এর উন্নয়ন ঘটে।

আদর্শ: স্বাধীন ও সমান ব্যক্তিদের সমাজ

প্রথম সমালোচনাটি প্রথম দেখায় বিশেষভাবে চমকে দেয়। কেন একজন ব্যক্তি সমাজের কাছ থেকে আবার পাওয়ার জন্য তার সমস্ত স্বাভাবিক অধিকার ত্যাগ করবে? এটি কি উচ্ছৃঙ্খলতার দরোজা খুলে দেবে না? এই বিষয়ে রুশোর ক্রমাগত জোর দেওয়া প্রায় বাকরুদ্ধ করে দেওয়ার মত। তিনি এ ধরনের অবস্থান বেছে নিয়েছিলেন তার আংশিক কারণ হচ্ছে তিনি এটি পরিষ্কার করতে চেয়েছিলেন যে যদি সবাই স্বাধীনতা লাভ করতে চায়, তবে কোনো দায়িত্বহীন পদাধিকার, কোনো বস্তুগত অধিকার, আর কাজেই কোনো সামাজিক অসমতাকে সমাজে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তাঁর আদর্শ হচ্ছে একটি মুক্ত ও সমান ব্যক্তিদের সমাজ।

শুধু ধনীদের জন্য স্বাধীনতা?

এভাবে রুশো সমাজে স্বাধীনতার প্রকৃত অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সমসাময়িক সমাজ নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ দেখায় যে অনেক বেশি স্বাধীনতা শুধু ধনীদেরই রক্ষা করে। এই কাল্পনিক সামাজিক চুক্তি ও একপেশে স্বাধীনতার কারণে একজন ধনী ব্যক্তি গরিবের ওপর বিজয়ী হবে বলে তিনি জোরালো মত প্রকাশ করেন।

রুশোর সাথে সাথে আমরাও বলতে পারি যে স্বাধীনতা একটি পরাজিত করার যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এ কারণে স্বাধীনতা আসলেই সবার জন্য কার্যকর কিনা তা সাবধানতার সাথে বিশ্লেষণ করা আরও গুরুত্বপূর্ণ।

জাঁ জাক রুশো (১৭১২ - ১৭৭৮) ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম রূপকার।

রুশো সমাজে অসমতা গড়ে ওঠার ওপর গুরুত্ব দিয়ে একটি মৌলিক ডিসকোর্স লেখেন, যা কিছুটা দার্শনিক, আবার কিছুটা ঐতিহাসিক-বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তত্ত্ব ও শিক্ষা নিয়ে তাঁর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে।

'আসুন', তিনি তাদের (গরীব) [লেখকের মন্তব্য] বললেন, 'আমরা একসাথে দুর্বলদের নিপীড়ন থেকে রক্ষা করি, উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের বাধা দেই, আর যার যা আছে তা রক্ষা করতে কাজ করি; আসুন, আমরা ন্যায় ও শান্তির জন্য ক্ষমতাবান ও দুর্বলদের সমান বিবেচনায় ও পারস্পরিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে নিয়ম তৈরি করি, যা কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই সবাই মেনে নেবে। আসুন, আমরা নিজেদের শক্তিকে নিজেদের বিরুদ্ধে কাজে না লাগিয়ে একসাথে করে একটি বৃহত্তর শক্তিতে রূপান্তর করি যা উপযুক্ত আইন দিয়ে আমাদের শাসন করবে, এই সমাজের সব সদস্যকে রক্ষা করবে, তাদের সাধারণ শত্রুকে বাধা দেবে, আর আমাদের মধ্যে চিরদিনের সম্প্রীতি বজায় রাখবে।'

(রুশো ১৯৯৭: ২১৫-২১৭ [ডিসকোর্স অন দি অরিজিন অব ইনইকুয়ালিটি, দ্বিতীয় খণ্ড])

স্বাধীনতা ও ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক

রুশোর তৃতীয় সমালোচনা ক্ষমতার সাথে স্বাধীনতার সম্পর্ক নিয়ে। যেখানে লক এবং তার চেয়েও আরেকটু বেশি মাত্রায় থমাস হবস-এর মতে যখন আইন প্রণয়ন জনগণের দ্বারা অনুমোদিত, তখন তা যে চর্চা করা হবেই তা নয়, সেখানে রুশো একটি গণতান্ত্রিক অবস্থান নেন। তাঁর মতে একজন ব্যক্তি মুক্ত, যার অর্থ তিনি শুধু একজনের রাজনৈতিক ইচ্ছারই অধীন তখনই যখন এই আইন গঠনের প্রক্রিয়ায় তার অংশগ্রহণ থাকে।

'একটি বুদ্ধিমত্তা যা অন্যান্য বুদ্ধিমত্তাগুলোর উন্নয়ন ঘটায়'

চতুর্থ সমালোচনার মাধ্যমে রুশো লকের স্বাধীনতার ধারণাকে একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে সমর্থন করেন। রুশো এই মতবাদে বিশ্বাস করতেন যে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে শুধু 'বুদ্ধিমান'ই নয়, বরং এর মাধ্যমে অন্যদের বুদ্ধিমত্তার উন্নয়ন ঘটানোর জন্যও ক্ষমতাপ্রাপ্ত (বেনার/ ব্রাগেন ১৯৯৬:২৪)। কাজেই ব্যক্তিত্বের উন্নয়নে সহায়তা করা একটি গণতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ।

সমাজে স্বাধীনতার সীমা কী?

সমাজে এবং রাষ্ট্রের সাপেক্ষে একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা কতটুকু এই প্রশ্নই একটি চিরন্তন বিতর্কের বিষয়। গোপনে আড়ি পাতা অনুমোদনের যোগ্য কিনা বা একটি যাত্রীবাহী বিমানকে গুলি করে ভূপাতিত করার অধিকার একজন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর আছে কিনা তা স্বাধীনতার সীমা নিয়ে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোকে সামনে নিয়ে আসে।

স্বাধীনতার সীমা সম্পর্কে দুটি দার্শনিক উত্তর প্রায়ই দেওয়া হয়ে থাকে।

দুটি উত্তর

'এটি সত্যি যে গণতন্ত্রে একজন ব্যক্তি তার খুশিমত কাজ করতে পারে বলে মনে হয়; তবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অসীম নয়। সরকার বা প্রকারান্তরে সমাজে যা আইন দ্বারা পরিচালিত হয়, আমাদের যা করা উচিত তার মধ্যে কিছু করার ক্ষমতা, আর আমাদের যা করা উচিত নয় তা না করার ক্ষমতার মধ্যেই স্বাধীনতা নিহিত। আমাদের মনে স্বাধীনতা ও মুক্তির মধ্যকার তফাত সবসময় মনে রাখতে হবে। মুক্তি হচ্ছে আইনের আওতায় থেকে যা ইচ্ছা তা করার অধিকার; আর যদি কোনো নাগরিক তার যা করা নিষেধ তা করতে পারত তাহলে তার মুক্তি থাকত না, কারণ তার প্রতিবেশি অন্যান্য নাগরিকদেরও একই ক্ষমতা থাকত।'

মনটেসকিউ ১৯৯২: ২১২ [দি স্পিরিট অব দি লজ, বুক ১১]

'এখানে মাত্র একটি শ্রেণিবিভাজন রয়েছে: যা করতে পারবে সেই মাত্রা পর্যন্ত করা যাবে এবং একইসাথে এটি একটি সর্বজনীন আইনে পরিণত হতে পারে!'

(কান্ট ১৯৯৫: ৫১ [গ্রাউন্ডওয়ার্ক অব দি মেটাফিজিক্স অব মরালস])

মনটেসকিউ

চার্লস ডি সেকনডাট মনটেসকিউ (১৬৮৯-১৭৫৫) ছিলেন একজন আইনজ্ঞ এবং নৈতিক দার্শনিক - তিনি দি স্পিরিট অব দি লজ (১৭৪৮) এর জন্য বেশি পরিচিত।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ও ক্ষমতার বিভাজনের (আইনসভা, নির্বাহী ও বিচার বিভাগ) সমর্থক ছিলেন।

মনটেসকিউ-এর মতে স্বাধীনতার সীমা আইন মেনে চলার প্রতি দায়বদ্ধতাই নয়, বরং এর সাথে অন্যরাও এসব আইন মেনে চলবে এই প্রত্যাশার সাথে সম্পর্কিত।

কান্ট

কান্টের ভাবনা আরও সুদূরপ্রসারী-বিমূর্ততার উচ্চ পর্যায়ে স্বাধীনতার সীমা। প্রত্যেক কাজের ক্ষেত্রে এর সর্বোচ্চ সীমা সর্বজনীন আইনে পরিণত হতে পারে কিনা তা জানতে হবে। কাজেই কোনো আইন মেনে চলার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কিভাবে আইনি কাঠামোর মধ্যে আইন মেনে চলা হচ্ছে তা নিয়ে কান্টের এই ধারণার সম্প্রসারণ। একটি সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে: পরিবেশের জন্য বন্ধুভাবাপন্ন নয় এমন গ্যাসচালিত ফোর-হুইল জিপ চালানো আইনগতভাবে নিষিদ্ধ নয়। তা হলেও সবাই যদি এ ধরনের জিপ চালানো শুরু করে তাহলে তা পরিবেশের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে।

কাজেই কান্টের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার সীমা হচ্ছে নৈতিক, এবং একজন ব্যক্তির জন্য সর্বসাধারণের কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত। তবে স্বাধীনতার এই ব্যক্তিগত প্রেক্ষিত

স্বাধীনতার সীমা হচ্ছে নৈতিক ও সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য

কোনোভাবেই সমাজের সবার জন্য স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। অন্য কথায় এটি শুধু স্বাধীনতার চর্চায় বাধা দেওয়া ঠেকানোর বিষয় নয়, বরং যাদের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত তাদের স্বাধীনতাকে সম্প্রসারণ করারও বিষয়। সমাজে এটি শুধু সবার জন্য সমান স্বাধীনতার চর্চার মাধ্যমেই সম্ভব। এসপিডি'র হামবুর্গ কর্মসূচির ভাষায়: 'প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীনতার জন্য সক্ষম ও দক্ষ। কিন্তু একজন ব্যক্তি কিভাবে এর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে তা সমাজের ওপর নির্ভর করে।'

ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) আলোকায়নের যুগের অন্যতম প্রভাবশালী জার্মান দার্শনিক। তাঁর কাজ তাঁর সময়ের প্রায় সব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে।

তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে: ক্রিটিক ডার রেইনেন ভারনাফট [ক্রিটিক অব পিওর রিজন] (১৭৮১), ক্রিটিক ডার প্রাকটিসেন ভারনাফট [ক্রিটিক অব প্র্যাকটিকাল রিজন] (১৭৮৮), ক্রিটিক ডার উরটেইলসক্রাফট [ক্রিটিক অব জাজমেন্ট] (১৭৯০), জুম এউইজেন ফ্রাইডেন [অন পারপেচুয়াল পিস] (১৭৯৫), মেটাফিজিক্স ডার সিটেন [দি মেটাফিজিক্স অব মরালস] (১৭৯৬/৯৭)।

আরও সাম্প্রতিক তত্ত্ব যেমন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও 'সক্ষমতা' নিয়ে বলেছেন, যা সমাজে বেঁচে থাকতে হলে ব্যাপক অংশগ্রহণের জন্য আর্থিক সমতার চেয়েও ব্যাপক।[১]

সামাজিক গণতন্ত্রের জন্য স্বাধীনতার ওপর বিতর্ক কতগুলো মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে প্রকাশ করা যায়, যেসব মানদণ্ড অবশ্যই পূরণ করতে হয়।

স্বাধীনতা ও সামাজিক গণতন্ত্র

এসপিডি'র হামবুর্গ কর্মসূচির ভাষায় 'স্বাধীনতা'

'স্বাধীনতার অর্থ নিজস্বতার সম্ভাবনা। প্রতিটি মানুষ স্বাধীনতার জন্য যোগ্য ও দক্ষ। কিন্তু একজন ব্যক্তি কিভাবে এর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে তা সমাজের ওপর নির্ভর করে। প্রতিটি মানুষকে হতে হবে ক্ষয়িষ্ণু পরনির্ভরতা, চাহিদা ও ভীতি থেকে মুক্ত। তাদের সক্ষমতা বাড়ানোর সুযোগ পেতে হবে, এবং সমাজ ও রাজনীতিতে দায়বদ্ধতার সাথে অংশগ্রহণ করতে হবে। [কিন্তু] মানুষ তাদের স্বাধীনতার প্রয়োগ ঘটাতে পারে তখনই যখন তারা জানে যে তাদের যথেষ্ট পরিমাণ সামাজিক সুরক্ষা রয়েছে।'

(হামবুর্গ কর্মসূচি ২০০৭: ১৫)

[১] দারিদ্র্য ও সম্পদের ওপর জার্মান সরকারের প্রথম দুটি প্রতিবেদনে দারিদ্র্য পরিমাপের জন্য কোনো বস্তুগত নির্দেশক আর ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও বিচ্ছিন্নতা বিবেচনা করা হয়।

স্বাধীনতার বিতর্ক থেকে উদ্ভূত যেসব মানদণ্ড সামাজিক গণতন্ত্রের থাকতে হবে

- ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সমাজে এবং এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য স্বাধীনতা প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে ও নিশ্চয়তা দিতে হবে।
- স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি এই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। এজন্য প্রয়োজন সামাজিক উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠান যা একে সম্ভব করতে পারবে। একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে শুধু স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাই যথেষ্ট নয়।
- স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে মানুষ দায়বদ্ধতার সাথে ও যৌক্তিকভাবে ভূমিকা পালন করবে। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে এটি হচ্ছে শিক্ষার দায়িত্ব।

২.২. সমতা/ ন্যায্যতা

সমতা অথবা ন্যায্যতা?

দ্বিতীয় মৌলিক চেতনার কাছে এসে অনেক ব্যক্তিই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এটি কি 'সমতা' নাকি 'ন্যায্যতা'?

এই দ্বিধাগ্রস্ততা খুব সহজেই একটি ঐতিহাসিক-দার্শনিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা যায়।

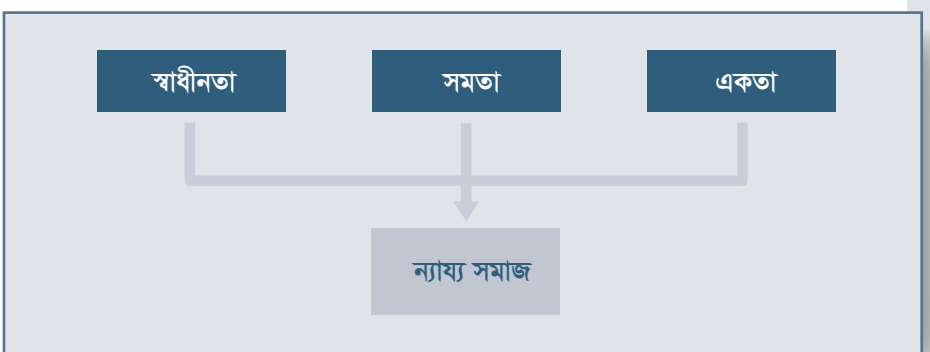

চিত্র ২: ন্যায্য সমাজ ও মূল চেতনা

ঐতিহাসিকভাবে ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে তিনটি মৌলিক চেতনা বিদ্যমান ছিল - 'স্বাধীনতা, সমতা ও একতা' ('লিবার্তে, এগালিতে এ ফ্রাটারনিতে')। কাজেই দার্শনিক প্রেক্ষাপটে এসব চেতনা বাস্তবায়নে একটি 'ন্যায়ভিত্তিক সমাজ'-এর ধারণা উঠে আসে।

দার্শনিক ধারণা ও সমসাময়িক রাজনৈতিক ব্যবহারের পার্থক্য

একই সময়ে আরেকটি মৌলিক চেতনা 'সমতা' সম্পর্কে বিতর্ক যে প্রশ্নটি উত্থাপন করে তা হচ্ছে বস্তুগত ও অবস্তুগত পণ্যের ন্যায্য বণ্টন কী হতে পারে। এ কারণে ১৯৮০'র দশক থেকে ক্রমাগতভাবে 'ন্যায্যতা' হয় 'সমতা'র ধারণা থেকে আলাদা অথবা আরও নির্দিষ্ট করে একটি মৌলিক চেতনা হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। ইতোমধ্যে একটি ধারণা হিসেবে 'স্বাধীনতা, ন্যায্যতা ও একতা'র ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তবে এরপরও এর পেছনে একটি দার্শনিক বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। 'স্বাধীনতা'র ধারণা যা প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে, তার বিপরীতে 'সমতা' ও 'ন্যায্যতা' হচ্ছে তুলনামূলকভাবে আপেক্ষিক ধারণা। এসব ধারণা প্রত্যেক ব্যক্তি ও তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের অন্যান্য সদস্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে।

আপেক্ষিক ধারণা হিসেবে সমতা ও ন্যায্যতা

দার্শনিক দিক থেকে বলতে গেলে 'ন্যায্যতা' একটি উচ্চতর ধারণা। নিচের বক্তব্যে লেখক 'ন্যায্যতা'র ধারণাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছেন:

> *'ন্যায্যতা' কী? এই প্রশ্ন কি কেউ করতে পারে? "কী" কোনো একটি বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। ন্যায্যতা কোনো বস্তু নয়। এটি একটি সম্পর্কের ক্ষেত্র। এটি মানুষের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়। নির্দিষ্ট ধরনের সম্পর্ক যা ন্যায্য বলে বর্ণনা করা যায়। কাজেই প্রশ্নটি "ন্যায্যতা কী?" হবে না, বরং হবে "ন্যায্যতা কী সম্পর্কে?" ... ন্যায্যতার ধারণা হচ্ছে কিভাবে একজন ব্যক্তি সমাজের সাথে, যার সে একটি অংশ, এবং অন্যান্যদের সাথে যাদের সাথে তার লেনদেন রয়েছে তার সাপেক্ষে কোন অবস্থানে আছে। ... একজন মানুষ মনে করে সে যাদের সংস্পর্শে আসে তাদের সাথে তার অবস্থান কী হবে, সে কিভাবে মূল্যায়িত হয় ও তার সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করা হয় তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ... একজন মানুষের নিজস্বতা যদি অন্যরা তাকে কী চোখে দেখে তার সাথে মিলে যায়, তাহলে সে মনে করে যে তাকে সঠিকভাবে মূল্যায়িত করা হচ্ছে। এই মূল্যায়ন প্রতিফলিত হয় বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যের বণ্টন (distribute), প্রত্যাখ্যান ও প্রত্যাহারের মধ্যে।'*
> (হাইনরিখ ২০০২: ২০৭ চ)

কাজেই ন্যায্যতার ধারণা বেশ কয়েকটি যোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত। ব্যক্তিগতভাবে কেউ মনে করতে পারে যে তাকে অন্যায়ভাবে দেখা হচ্ছে, যেখানে বস্তুনিরপেক্ষভাবে একটি 'ন্যায়ভিত্তিক' বিবেচনা বিদ্যমান। কাজেই কোনটি ন্যায় ও কোনটি নয় তা শুধু সামাজিক দরকষাকষির মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করা যায়। অন্য কথায়, ন্যায্যতার জন্য প্রয়োজন:

- সমাজ দ্রব্য (অবস্তুগত ও/ বা বস্তুগত) বণ্টন করে; এবং
- সবার ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত সর্বজনগ্রাহ্য শর্তের সাপেক্ষে এসব দ্রব্যের বণ্টন ঘটে থাকে।

ওপরের দুটি শর্ত যখন পূরণ হবে কেবলমাত্র তখনই আমরা 'ন্যায্যতা' সম্পর্কে বলতে পারব। তবে সমতা হচ্ছে অবস্তুগত ও বস্তুগত দ্রব্যের বণ্টনের একটি বিশেষ অবস্থা।

সমতা ও ন্যায্যতার ধারণা সচেতনভাবে সংজ্ঞায়িত হতে হবে

> *'সমতা কোনো (সামাজিক) ব্যবস্থার ফলাফল নয়, বরং এ বিষয়ের শেষ কথা (*point of departure*)। এক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক নিয়ম প্রয়োজন যার ভিত্তিতে বিতরণে কোনো ধরনের ব্যত্যয় হলে তা মূল্যায়ন করা যাবে। এই বিতরণের মৌলিক নিয়ম হচ্ছে সংখ্যাগত সমতা - যাদের মধ্যে বিতরণ হবে তাদের মধ্যে সম্পদের বিভাজন হবে সংখ্যার ভিত্তিতে। ন্যায্যতার বিপরীতে সমতার কোনো ন্যূনতম শর্তের প্রয়োজন নেই। ... যখন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে দ্রব্যের বণ্টনে কোনো ন্যূনতম শর্ত থাকে না, যখন একজনের তুলনায় আরেকজনকে বেশি দেওয়ার কোনো ভিত্তি থাকে না, তখন বিতর্ক এড়ানোর জন্য সবাইকে একই পরিমাণ দিতে হয়।'*
> (হাইনরিখ ২০০২: ২১১ চ)

কাজেই সমতার জন্য চাহিদা হচ্ছে যে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য কোনো বিতর্ক থাকবে না, যা দ্রব্যের বণ্টনে বৈষম্যকে আইনি ভিত্তি দেবে।

সমস্যা: কিভাবে 'ন্যায্য বৈষম্য'কে যুক্তিসংগত করা যায়?

এখন পর্যন্ত 'সমতা' ও 'ন্যায্যতা'র ধারণাকে বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ছাড়াই সংজ্ঞায়িত করা গিয়েছে। তবে প্রশ্ন ওঠে কিভাবে 'অসম বণ্টন'কে তাত্ত্বিকভাবে যুক্তিসংগত করা যায়। এ ধরনের সংজ্ঞায়ন ও যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্য এ পর্যন্ত অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অবশ্যই এদের সবগুলো দেখার মত সুযোগ আমাদের নেই। তবে রাজনীতিতে উৎসাহ আছে এমন যে কেউ সাধারণভাবে রাজনীতিতে বাস্তবে কিভাবে কোনো প্রস্তাবিত নীতি ন্যায়সংগত বা অন্যায় বলে মূল্যায়িত হতে পারে তা খতিয়ে দেখতে পারেন।

পরবর্তী অংশে ন্যায্যতার ধারণার ওপর চারটি ভিন্ন মতবাদ উপস্থাপন করা হবে, যার সবগুলো ১৯৮০ ও ১৯৯০ থেকে তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিতর্কিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন সংজ্ঞা ও মতবাদ থেকে এটি পরিষ্কার যে ন্যায্যতার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, আর এটি রাজনৈতিক বিতর্কের একটি বিষয়।

ন্যায্যতার চারটি মতবাদ

- জন রলস-এর এ থিওরি অব জাস্টিস
- ন্যায্যতার উদারনৈতিক তত্ত্বের সমাজতান্ত্রিক সমালোচনা
- ন্যান্সি ফ্রেজারের 'স্বীকৃতি ও পুনর্বণ্টনের মাঝামাঝি' একটি সংজ্ঞা
- ন্যায্যতার রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

২.২.১ জন রলস-এর *এ থিওরি অব জাস্টিস*[২]

জন রলস

দর্শনের প্রেক্ষাপটে জন রলসের এ থিওরি অব জাস্টিস তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। তাঁর উদারনৈতিক ঘরানার এই তত্ত্ব ১৯৭১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, যা প্রকৃত রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করতে শুরু করে ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে। রিগ্যান ও থ্যাচারের সময়কার বাজার চরমপন্থা (market radicalism) এবং হেলমুট কোহলের 'আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পিছুটান'-এর (ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের জন্য দেখুন নিডা-রুমেলিন ১৯৯৭: ১৫চ) একটি বিরুদ্ধ-মতবাদ হিসেবে এর উত্থান। বিশেষভাবে সামাজিক গণতান্ত্রিক ক্ষেত্রে রলসের তত্ত্ব বিশেষভাবে বিতর্কের অবকাশ রাখে।

জন রলস (১৯২১-২০০২) উদারনৈতিক ঘরানার একজন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক দার্শনিক হিসেবে বিবেচিত। তিনি ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক দর্শনের অধ্যাপক। ১৯৭১ সালে তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রভাবশালী তত্ত্ব, এ থিওরি অব জাস্টিস প্রকাশ করেন।

সামাজিক গণতান্ত্রিক ক্ষেত্রে রলসের তত্ত্ব ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

একটি 'ন্যায্য মৌলিক ব্যবস্থা' (just basic order) প্রতিষ্ঠা

রলস তাঁর তত্ত্বে সমাজে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণকে বিশ্লেষণ করেছেন, যে সমাজের সদস্যরা সহযোগিতার মাধ্যমে তুলনামূলক দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য বণ্টনের চেষ্টা করতে বাধ্য। এই উদ্দেশ্যে এর বিপরীত একটি স্বার্থ দেখা যায়, যাকে বলা যায় একটি 'ন্যায্য মৌলিক ব্যবস্থা', যেখানে রয়েছে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান (সংবিধান, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ও অন্যান্য)। এই তত্ত্বে রলস এই ন্যায্য ব্যবস্থা ও নীতির শর্তগুলো তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন।

তিনি নিম্নলিখিত ধারণার ভিত্তিতে শুরু করেন:

- ন্যায্যতার জন্য প্রাথমিক ধারণা ও সাধারণ নীতি তৈরি করা যায় যার ওপর সবাই সম্মতি দেবে;
- আধুনিক গণতন্ত্রে এটি ধরে নেওয়া যায় যে মানুষ একজন আরেকজনকে মুক্ত ও সমান মনে করে;
- এই ভিত্তিতে সামাজিক সহযোগিতার নীতিগুলো আবিষ্কার করা যায়।

একটি পরীক্ষামূলক ভাবনা: মুক্ত, সমান ও লক্ষ্য অর্জনে উদ্যোগী ব্যক্তিদের 'আসল অবস্থান'

এই উদ্দেশ্যে জন লকের মতই রলস একটি প্রাথমিক পরিবেশ ধরে নেন। তবে তিনি কোনো কাল্পনিক অবস্থাকে প্রকৃত হিসেবে ধরে নেন নি, বরং একটি প্রস্তাবিত (hypothetical) অবস্থা ধরে নেন যেখানে মানুষেরা মুক্ত ও সমান, তাদের নিজেদের স্বার্থ দেখে আর ন্যায্যতার মূলনীতিতে উপনীত হওয়ার জন্য ঐকমত্য পোষণ করে।

[২] জন রলস-এর তত্ত্বের সবটুকুর ব্যাখ্যা দেওয়া এই আলোচনার আওতার মধ্যে পড়ে না। এর উদ্দেশ্য বরং ন্যায়বিচারের সংজ্ঞার সাথে সম্পর্কিত বাস্তব সমস্যাগুলো আলোচনা করা, যা রাজনৈতিক চর্চার মধ্যেও উঠে আসতে পারে।

রলসের মতে নিরপেক্ষ অবস্থায় এই মৌলিক অবস্থা ও এসব প্রক্রিয়াই হচ্ছে ন্যায্য যার ওপর ভিত্তি করে একটি সমাজের (বা সম্প্রদায়ের) সদস্যরা কোনো বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছায়।

সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন (ম্যাক্সিমিন) নিয়ম

এই পরীক্ষামূলক ভাবনার আরেকটি বিষয় হচ্ছে মানুষেরা জানে না সমাজে তাদের অবস্থান কোথায়। রলসের মতে, এর ফলে সবচেয়ে কম স্বচ্ছল ব্যক্তির অবস্থানও যেন সর্বোচ্চ পর্যায়ে সুবিধা নেওয়া হয় ('ম্যাক্সিমিন' নিয়ম) এটি নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেকের একটি স্বার্থ থাকতে হবে।

আলোচনার বিষয়বস্তু ও পরবর্তী অনুশীলন

জন রলস পরীক্ষামূলক ভাবনায় অংশ নিতে পাঠকদের আমন্ত্রণ জানান।

নিজেকে কল্পনা করুন মুক্ত, সমান ও 'উদ্দেশ্যমূলকভাবে যৌক্তিক' ব্যক্তিদের দলভুক্ত হিসেবে:

- কোন কোন নীতিতে আপনারা একমত হয়েছেন?
- কোন কোন নীতি বিতর্কিত?
- কোন কোন যুক্তিতে এসব বিতর্কিত বিষয় নিষ্পন্ন হয়েছে?
- সমসাময়িক জার্মানিতে এর কোন কোন নীতি বাস্তবায়িত হয়েছে, আর কোনগুলো হয় নি?

ন্যায্যতার দুটি নীতি

কোনো বিষয় ন্যায্য কিনা তা বলতে পারার জন্য রলসের ব্যাপক তত্ত্বের অধীন দুটি মৌলিক নীতির দিকে বিশেষ গভীরভাবে লক্ষ করা প্রয়োজন।

ন্যায়সংগত বণ্টনের একটি নতুন সংজ্ঞা

রলসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে সামাজিক দ্রব্যের পুনর্বণ্টনের বাইরে গিয়ে চিরন্তন উদারনৈতিক বিতর্কের একটি তত্ত্ব তৈরি করা যা ন্যায়সংগত বণ্টনকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে। এভাবে রলস উদারনৈতিক ভাবনাকে নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার রক্ষণাবেক্ষণকে সমতা ও ন্যায্যতার সামাজিক গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার সাথে যুক্ত করেন।

দুটি কেন্দ্রীয় নীতি

তাঁর এ থিওরি অব জাস্টিস-এ রলস দুটি নীতি প্রণয়ন করেন:

নীতি ১

'একটি সমতাভিত্তিক স্বাধীনতা ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার রয়েছে যা সবার জন্য স্বাধীনতার সমার্থক একই ধরনের একটি ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।' (রলস ১৯৭৯: ৮১) [৩]

নীতি ২

'সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা দূর করতে হবে এমনভাবে যেন এগুলো (ক) সবচেয়ে কম সুবিধাপ্রাপ্তদেরও সর্বাধিক লাভ হয় (একটি ন্যায়সংগত সঞ্চয় নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ), এবং (খ) ন্যায়সংগত সুযোগের সমতার অধীন অবস্থায় অফিস ও পদগুলো যেন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে।' (রলস ১৯৭৯: ৩৩৬)

মৌলিক স্বাধীনতা

প্রথম নীতি দ্বারা বোঝায় মৌলিক স্বাধীনতার সবগুলো ধরন যা সবার জন্য থাকতেই হবে, যেন তারা তাদের স্বাধীনতার চর্চা করতে পারে। একটি 'একই ধরনের ব্যবস্থা' বলার কারণে বোঝা যায় যে জলজ্যান্ত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সব ধরনের আচরণকে বিমূর্ত করা যায়। কাজেই 'আইনের চোখে সমতা' আর নিশ্চিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয়ে জোর দিয়ে বলা যায়। দর্শনের আলোচনায় প্রায় সবাই প্রথমোক্ত নীতিটি চিহ্নিত করেছেন।

রলস মনে করেন যে উদারনৈতিক ভাবধারায় প্রথমোক্ত নীতিটি দ্বিতীয় নীতির ওপর পুরোপুরি অগ্রাধিকার পাবে। [৪]

পার্থক্যের নীতি

ব্যাপকভাবে অবিতর্কিত প্রথমোক্ত নীতির বিপরীতে দ্বিতীয় নীতিটি, যা 'পার্থক্যের নীতি' হিসেবে পরিচিত, বরং একটু বেশি কঠিন। এখানে রলস একটি বিমূর্ত রীতির প্রস্তাব করেছেন যার সাথে বৈষম্যকে তুলনামূলক নিরপেক্ষ বলা যায়। একটি অসম বণ্টনকে ন্যায়সংগত করা যায় যদি এটি দুটি শর্ত পূরণ করে:

১. যদি এটি তাদের সুবিধার জন্য হয় যারা সবচেয়ে দরিদ্র;
২. বিভিন্ন কার্যালয় (অফিস) ও পদ সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে।

[৩] এই ধারণাটি কান্ট-এর প্রস্তাবিত আরেকটি ধারণার সাথে মিলে যায়: "প্রতিটি কাজ ন্যায্য যা নিজস্ব বা যার ওপর এটি নির্ভরশীল তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে এমনভাবে চলমান যে এটি প্রত্যেকের ও সবার ইচ্ছার স্বাধীনতার সাথে এবং একটি সর্বজনীন নিয়ম মেনে থাকতে পারে।" (কান্ট ১৯৬৩: ৩৩)

[৪] মেয়ার এটি পরিষ্কার করেছেন যে বাস্তবিকভাবে ও যৌক্তিকভাবে এটি সমস্যা হিসেবে প্রমাণিত (দেখুন পৃষ্ঠা ৮৮)।

রলস অসম বণ্টনের প্রত্যাশিত ফলাফলের ভিত্তিতে 'ন্যায়সংগত অসম বণ্টনের' প্রথম শর্ত চিহ্নিত করেন: যদি সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তিসহ সবাই এ থেকে সুবিধা পায়, তাহলে একটি অসম বণ্টন ব্যবস্থা (এর ফলাফলের মধ্যে) ন্যায়সংগত হিসেবে দেখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে এর ফলাফলের ওপর প্রশ্ন সাময়িকভাবে বিলম্বিত হয়।

একটি 'ন্যায়সংগত অসম বণ্টনের' শর্তাবলী

দ্বিতীয় শর্তটি হচ্ছে অবাধ অভিগম্যতা। শুধু যদি 'বিভিন্ন কার্যালয় ও পদ' নীতিগতভাবে সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে তাহলে অসম বিতরণ ব্যবস্থা ন্যায়সংগত হবে। আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে, 'সবার সমান সুযোগ থাকতে হবে'।

একটি বাস্তব উদাহরণ

এই পার্থক্যের নীতি চরমভাবে বিতর্কিত - শুধু দর্শনগতভাবেই নয়, বরং রাজনৈতিকভাবেও। এটি ন্যায্যতার সঠিক ও পর্যাপ্ত সংজ্ঞা কিনা তা কেউ জিজ্ঞেস করার আগেই তাকে এর বাস্তব উদাহরণ প্রয়োগ করে দেখতে হবে। নিচের বক্সে কয়েকটি রাজনৈতিক বিতর্ক দেওয়া হয়েছে যা আপনাকে যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে এগুলো রলসের দুটি নীতির ভিত্তিতে 'ন্যায্য' কিনা।[৫] সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি হচ্ছে আপনি প্রথমে কোনগুলোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ন্যায্য বলে মনে করেন তা ঠিক করা।

আলোচনা: পর্যায়ক্রমিক (Progressive) আয়কর - হ্যাঁ অথবা না?

যদিও একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তি পল কির্চহফ ও উগ্র উদারনীতিকদের যুক্তির বিরোধিতা করে, এসব যুক্তি এখনো সূক্ষ্মভাবে যাচাই করতে হবে।

পল কির্চহফ সিডিইউ (ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন)-এর একজন ছায়া অর্থমন্ত্রী হিসেবে ২০০৫ সালের আইনসভার নির্বাচনে সবার জন্য সাধারণ আয়করের হার ২৫ শতাংশ নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নেন, যদিও জার্মানিতে বহু দশক ধরে পর্যায়ক্রমিক কর ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এই ব্যবস্থার অধীনে প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট করমুক্ত বরাদ্দ রয়েছে, যার পরবর্তী পর্যায়ের আয়ের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিকভাবে আয়কর বাড়ানো হয়।

অন্য কথায় প্রত্যেকের আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারে পর্যায়ক্রমিক আয়কর বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন

রলসের কাঠামোর মধ্যে বিবেচনা করলে ওপরের ক্ষেত্রগুলোর কোনটি ন্যায্য বলা যায়?

[৫] প্রসঙ্গক্রমে কেউ কেউ রলসকে ভুল বুঝবেন যদি তিনি শুধু পার্থক্যের নীতির ভিত্তিতে অসম ব্যবস্থা নিরীক্ষা করেন। রলস মনে করেন যে ন্যায্যতা হচ্ছে দুটি নীতির ওপরেই একইসাথে নির্ভরশীল।

২.২.২ ন্যায্যতার উদারনৈতিক ধারণার সমাজতান্ত্রিক সমালোচনা

'এটি হচ্ছে স্বাধীনতা, সমতা, সম্পদের বিশেষ বাস্তবতা। ... স্বাধীনতা, যেহেতু একটি পণ্য, ধরা যাক শ্রমশক্তি, তার ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই নির্ধারিত হয় শুধু তাদের নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে। তারা স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, যারা আইনের চোখে সমান। ... সমতা, যেহেতু প্রত্যেকে অন্যজনের সাথে কোনো সম্পর্কে আবদ্ধ হয় আর তারা সমান বিষয়ের সাথে বিনিময় করে। সম্পদ, যেহেতু প্রত্যেকে শুধু তার যা আছে তাই ত্যাগ করে।' (মার্ক্স, ক্যাপিটাল, প্রথম

সামাজিক বাস্তবতা

হাইনরিখ ও রলসের সংজ্ঞার ভিত্তিতে এখন পর্যন্ত উপস্থাপিত ন্যায্যতা ও সমতার ব্যাখ্যা তাদের দার্শনিক প্রেক্ষাপটের আলোকে সংজ্ঞায়িত ও পার্থক্য করা হয়েছে।[৬] কাজেই তাঁরা সামাজিক বাস্তবতা নয় বরং ধারণার দিকে নির্দেশ করেন। সংজ্ঞার খাতিরে, কোনো নির্দিষ্ট সমাজে ন্যায্যতা বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা প্রাসঙ্গিক নয়।

তবে সমাজে মৌলিক চেতনাগুলোর প্রকৃত প্রভাব যে রয়েছে তা একটি মৌলিক চাহিদা। এই দাবির ওপরেই ন্যায্যতার সমাজতান্ত্রিক ধারণা বিস্তার লাভ করেছে।

কিভাবে সমাজে অসমতা ও ন্যায্যতাহীনতার প্রাধান্যকে ব্যাখ্যা করা যায়?

ন্যায্যতার সমাজতান্ত্রিক ধারণা সাধারণত শুরু হয় এই অবস্থান থেকে যে একজন ব্যক্তি সমাজে বিদ্যমান অসমতা ও ন্যায্যতাহীনতাকে ব্যাখ্যা অবশ্যই করতে পারবে। দারিদ্র্য ও সম্পদের পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় সমাজ নিজে থেকে সমতা বা ন্যায্য বণ্টনকে বিকশিত হতে দেবে না। কাজেই অসমতা ও অন্যায্যতা শুধু আকস্মিক বা কোনো বিচ্ছিন্ন একটি ভারসাম্যতাহীনতা নয়, বরং সমাজকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কলুষিত করে এমন একটি সমস্যা। অসমতা ও অন্যায্যতার প্রধান কারণ হিসেবে পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে উৎপাদনের শর্তকে চিহ্নিত করা হয়। তবে এটিই একমাত্র কারণ নয়।

গত ১৫০ বছরে সমাজতান্ত্রিক যুক্তিগুলো দুটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একদিকে তারা সমাজের সম্পদের পুনর্বণ্টন দাবি করে, অন্যদিকে তারা দাবি করে যেভাবে পণ্য উৎপাদিত ও কেনা হয় তা গোড়া থেকে পাল্টাতে হবে, যেন সবার জন্য স্বাধীনতার বাস্তবায়ন করা যায়। এর মূল ধারণা হচ্ছে স্বাধীনতা সবার জন্য নিশ্চিত করার জন্য সমতার বাস্তবায়ন করতে হবে।

[৬] নিশ্চিত করে বলা যায় হাইনরিখসের মনে প্রাথমিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনের সামাজিক-দার্শনিক প্রেক্ষাপট ছাড়া কোনো উদারনৈতিক তত্ত্ব ছিল না।

সাধারণভাবে পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে সবচেয়ে গরিব সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাবে এই বিষয়ের ওপর জোর দেওয়ার মাধ্যমে রলস তাঁর ভাবনায় এই ধারণার বিরোধিতা করেছিলেন।

অসমতা কি সবার জন্য সুবিধা নিয়ে আসতে পারে?

সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা রলসের ধারণার বিরোধিতা এভাবে করে যে অর্থনৈতিক অসমতা সবার জন্য (এবং সর্বোপরি যারা সবচেয়ে গরিব) সুবিধা নিয়ে আসতে পারে। বরং তারা মনে করে এর ফলে অসমতা ও অন্যায্যতা আরও বেশি তীব্র হয়। সম্প্রতি সম্পন্ন বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিভিন্ন গবেষণা তাদের এই ধারণাকে সমর্থন করে বলে দেখা যায়।[৭]

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই বিভাজন তাত্ত্বিকভাবেও প্রতিভাত হয়। ন্যায্যতার ওপর বিতর্কে দুটি ভিন্ন মডেল বিশেষভাবে কাছাকাছি অবস্থান করে: একদিকে সামাজিক ও বস্তুগত দ্রব্য বণ্টনে ন্যায্যতা, আর অন্যদিকে অভিগম্যতা সংক্রান্ত ন্যায্যতা, বা নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীগুলো স্বীকৃতি পায় কিনা আর পেলেও কিভাবে, আর বিভিন্ন সামাজিক পদে তাদের অভিগম্যতা (অন্য কথায় সামাজিক মর্যাদা) রয়েছে কিনা। এই বিতর্ক শুধু তাত্ত্বিক নয়, বরং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও চলছে। উপরন্তু, একদিকে বণ্টনে ন্যায্যতা ও অন্যদিকে অভিগম্যতার ন্যায্যতার মধ্যকার বিরোধপূর্ণ অবস্থান প্রধানত দুটি দিকেরই পূর্ব ধারণার ফলাফল।

বণ্টনে ন্যায্যতা বনাম অভিগম্যতার ন্যায্যতা

বিশেষকরে যেসব তাত্ত্বিক অভিগম্যতার ন্যায্যতার বিশাল ঝাঁপি খুলে বসে তারা নীতিগতভাবে পুনর্বণ্টনের প্রতি চোখ বন্ধ করে থাকে না। বরং বেশি সংকটে আছে ন্যায্যতার আরও জটিল ধারণা যা অর্থনৈতিক অসমতাকে ন্যায্যতার সমস্যা বলে মনে করে।

এই বিতর্ক আরও গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এটি শ্রমিক, যারা সামাজিক গণতন্ত্রের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তাদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে পারে। বর্তমানে এই লক্ষিত জনগোষ্ঠী এর ইতিহাসের শুরু থেকেই মেরুকরণের অধীন হয়ে আসছে, যে মেরুকরণ স্বাধীনতা ও সমতার প্রশ্নে একেবারেই হয় নি।

এই পর্যায়ে আমরা ন্যান্সি ফ্রেজার-এর ন্যায্যতার দ্বিমাত্রিক তত্ত্ব সংক্ষেপে উপস্থাপন করব, যা ন্যায্যতার দুটি মাত্রাকেই উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে একত্র করে।

[৭] উদাহরণ হিসেবে দেখুন বোর্দিউ ও অন্যান্য ১৯৯৭; কাসটেল ২০০০; শুলথেইস/ শুলজ ২০০৫।

২.২.৩ ন্যান্সি ফ্রেজার-এর ন্যায্যতার দ্বি-মাত্রিক ধারণা

ন্যায্যতার দ্বি-মাত্রিক ধারণা

ন্যান্সি ফ্রেজার তাঁর ন্যায্যতার ধারণায় পুনর্বণ্টনমূলক ন্যায্যতা এবং অভিগম্যতার ন্যায্যতা বা উদারনৈতিক ধারণার মধ্যকার দ্বন্দ্ব দূর করার চেষ্টা করেছেন, এবং ন্যায্যতার একটি দ্বিমাত্রিক ধারণা প্রস্তাব করেছেন:

> *'তাত্ত্বিকভাবে এটি হচ্ছে ন্যায্যতার ধারণার দুইটি মাত্রাকে ধারণায় পরিণত করা যা সামাজিক সমতা ও পার্থক্যের স্বীকৃতির উভয় দাবিকেই ধারণ করতে পারে। ব্যবহারিকভাবে এটি হচ্ছে রাজনৈতিক কর্মসূচি তৈরি করা, যা পুনর্বিতরণের রাজনীতির সবচেয়ে ভাল দিকের সাথে স্বীকৃতির রাজনীতির সবচেয়ে ভাল দিককে মিলিয়ে দিতে পারে।'* (ফ্রেজার ২০০৩: ১৭৮)

এখানে ফ্রেজারের তত্ত্ব হচ্ছে, প্রতিটি অন্যায় বা অসুবিধার মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যা ও স্বীকৃতির ঘাটতি উভয়ই রয়েছে, যদিও নিশ্চিতভাবেই নির্দিষ্ট অনুপাতে রয়েছে:

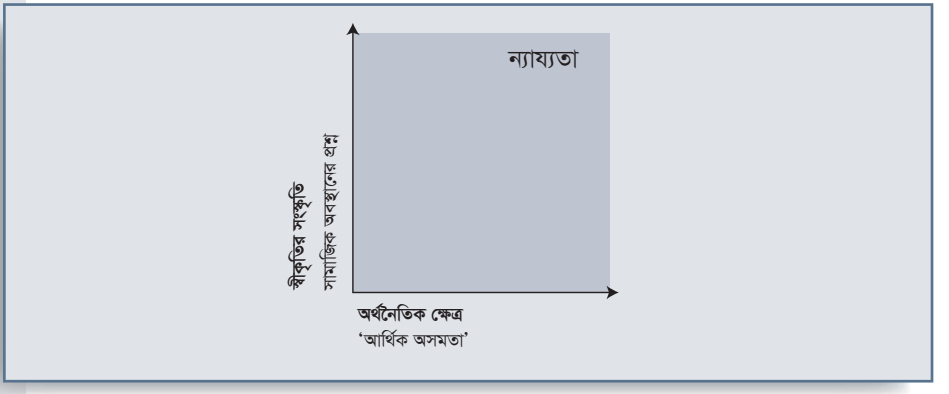

চিত্র ৩: ন্যান্সি ফ্রেজারের ন্যায্যতার ধারণা

ব্যবহারিক উদাহরণ

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সমাজে সমকামীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য প্রাথমিকভাবে অবস্থান ও সম্মানের প্রেক্ষাপটে ঘটে থাকে। একইসাথে এটি জীবনসঙ্গীর নিবন্ধনের ওপর করারোপের ফলে যে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপিত হয় তার সাথে সম্পর্কিত। কাজেই এখানে 'ন্যায্যতা' অর্জিত হতে পারে শুধু যদি অবস্থান ও অর্থনৈতিক উভয় মাত্রার অসুবিধা দিয়ে তৈরি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলো বিবেচনা করা হয়।

ন্যান্সি ফ্রেজার (১৯৪৭ -) নিউ ইয়র্কের নিউ স্কুল ফর সোশাল রিসার্চ এর পলিটিক্যাল অ্যান্ড সোশাল সায়েন্সের অধ্যাপক। তিনি নারীবাদের বিখ্যাত তাত্ত্বিকদের মধ্যে অন্যতম।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে নারীবাদী তত্ত্ব, ন্যায্যতার তত্ত্ব ও ক্রিটিকাল তত্ত্ব।

ন্যায্যতার জন্য প্রয়োজন একটি বহুমাত্রিক সামাজিক কৌশল

আরেকটি উদাহরণ হিসেবে আমাদের সমাজে বেকারদের বিষয়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী আর তাদের দূরে সরিয়ে রাখার উল্লেখ করা যায়। যেখানে প্রধানত তাদের নেতিবাচক বস্তুগত অবস্থানের কারণে তাদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, সেখানে বিভিন্ন গবেষণা থেকে এটি বারবার প্রমাণিত যে সমাজের সম্মান আর স্বীকৃতি, অন্যকথায় সামাজিক অবস্থান, তাদের জন্য একটি গুরুতর সমস্যা। সমাজে ন্যায্যতা ও অংশগ্রহণ বাস্তবায়ন করতে গেলে এমন কৌশল নিতে হবে যা উভয় মাত্রাকে যথাযথভাবে বিবেচনায় নেবে।

'অংশগ্রহণে সাদৃশ্যের' ধারণা

কাজেই ফ্রেজার বৈষম্য বা অন্যায্যতার অনুসন্ধানে একটি বিশ্লেষণমূলক প্রক্রিয়া বর্ণনা করেন। তাঁর মতে ন্যায্যতা কী হওয়া উচিত তার একটি নির্দেশনামূলক বিবরণ দিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে ন্যায্যতা হচ্ছে 'অংশগ্রহণে সাদৃশ্য':

> *'আমার ধারণার আদর্শিক কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে অংশগ্রহণের সাদৃশ্যের ধারণা। এই আদর্শ অনুযায়ী ন্যায্যতা একটি সামাজিক ব্যবস্থা দাবি করে যা সমাজের সব (প্রাপ্তবয়স্ক) সদস্যকে সঙ্গী হিসেবে একেকজনের সাথে আরেকজনের যোগাযোগ করার অনুমতি দেয়। অংশগ্রহণমূলক সাদৃশ্যকে সম্ভব করার জন্য আমার মতে দুটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে। প্রথমত, বস্তুগত সম্পদের বিতরণ অবশ্যই এমন হতে হবে যেন অংশগ্রহণকারীদের স্বাধীনতা ও বক্তব্য নিশ্চিত হয়। আমি একে বলব অংশগ্রহণমূলক সাদৃশ্যের বস্তুনিষ্ঠ শর্ত। এটি অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার ধরন ও পর্যায় ও অসমতা যা অংশগ্রহণের সাদৃশ্যকে বাধাগ্রস্ত করে তাকে বাধা দেয়। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে সাংস্কৃতিক চেতনার প্রাতিষ্ঠানিক ধরন সব অংশগ্রহণকারীদের জন্য সমান সম্মান প্রকাশ করে আর সামাজিক সম্মান অর্জনের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে। একে আমি বলব অংশগ্রহণের সাদৃশ্যের আন্তঃনিজস্ব (intersubjective) শর্ত।'* (ফ্রেজার ২০০৩: ৫৪ছ)

(অ)ন্যায্য বৈষম্যের শর্ত

এই পর্যায়ে রলসের মতই ফ্রেজারকেও যা তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চান, অথবা এই দুটি মাত্রায় ন্যায্য বা অন্যান্য বৈষম্যকে বাতিল করতে চান তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শর্তগুলো নির্দিষ্ট করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি নিচের পদ্ধতি প্রস্তাব করেন:

'কাজেই দুটি মাত্রার ক্ষেত্রেই নিশ্চিত ও অনিশ্চিত দাবির পার্থক্য করার ক্ষেত্রে একই সাধারণ শর্ত কাজ করে। বিষয়টি বন্টন বা স্বীকৃতি যাই হোক, এটি অবশ্যই দেখতে হবে যে বর্তমান অবস্থা অন্যদের সাথে সামাজিক জীবনে একই পর্যায়ে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছে কিনা।' (ফ্রেজার ২০০৩: ৫৭ছ)

পরীক্ষা পদ্ধতি

১. *বিশ্লেষণ:* আমরা কী ধরনের বৈষম্য নিয়ে কথা বলছি? এই দুটি মাত্রা নিজেদের কিভাবে প্রকাশিত করছে?

২. *শর্তের প্রয়োগ:* কী উপায়ে সামাজিক রীতি অংশগ্রহণের সাদৃশ্যকে বাধাগ্রস্ত করে?

৩. *বিকল্প:* অংশগ্রহণের সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য কী পরিবর্তন ও কৌশল দরকার হবে?

ফ্রেজারের মতে এসব পরীক্ষণ পদ্ধতি (অন্যায্যতা, প্রয়োগ ও বিকল্পের জোরদার ঘটনার প্রেক্ষিতে উভয় মাত্রার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ) প্রাথমিকভাবে দর-কষাকষির বিষয়।

একটি ব্যবহারিক বা মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষণ দিয়ে এটি বোঝা যাবে। যেমন সর্বজনীন (বা নাগরিক) স্বাস্থ্য বীমা বনাম সাধারণ বীমার ওপর আলোচনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। (নিচে দেখুন)

ন্যায্যতা প্রয়োগের জন্য দুটি কৌশল

ফ্রেজার অন্যায্যতা মোকাবেলায় দুটি সামাজিক কৌশলের উল্লেখ করেন: সত্যকথন ও রূপান্তর (ফ্রেজার ২০০৩: ১০২ছ)। যেমন, উদারনৈতিক কল্যাণ রাষ্ট্র মুক্তবাজার অর্থনীতির অর্থনৈতিক ধস থেকে উন্নতির জন্য একটি ইতিবাচক কৌশলের প্রতিনিধিত্ব করে। পুঁজি ও শ্রমের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা না হলেও এটি কিছুটা প্রশমিত হয়।

সমাজতান্ত্রিকরা যে কৌশলের কথা বলেন তা হচ্ছে রূপান্তরের কৌশল, যা হচ্ছে প্রধানত মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রচলন করা।

শুরুর বিষয়: 'অসংস্কারপন্থী সংস্কার'

তৃতীয় একটি কৌশলসহ ফ্রেজার দুটি কৌশলই বর্জন করেন, যাকে তিনি বলেছেন 'অসংস্কারপন্থী সংস্কার' (আন্দ্রে গর্জ-এর অনুসরণে)। তিনি এই অদ্ভূত ও সহজবোধ্য নয় এমন ধারণাকে একটি সামাজিক গণতান্ত্রিক প্রকল্পের সাথে যুক্ত করেন।

'ফর্ডিস্ট সময়ে [এই কৌশল] সামাজিক গণতন্ত্রের কিছু বামপন্থী ধারণার বিষয়ে জানায়। এই প্রেক্ষাপটে সামাজিক গণতন্ত্রকে একটি রূপান্তরমূলক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সরল বোঝাপড়া হিসেবে দেখা হয় নি। বরং একে একটি চলমান শাসন ব্যবস্থা হিসেবে দেখা হয়েছিল যার চলার পথ সময়ের সাথে সাথে রূপান্তরিত হওয়ার কথা। এর মূল চিন্তা-ভাবনা ছিল একগুচ্ছ ইতিবাচক পুনর্বিতরণের সংস্কার তৈরি করা, যার মধ্যে সর্বজনীনভাবে প্রাপ্য সামাজিক কল্যাণ, ধারাবাহিক করারোপ ব্যবস্থা, সবার জন্য কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি, একটি বৃহৎ বাজার ব্যবস্থার বাইরের সরকারি খাত এবং উল্লেখযোগ্য সরকারি এবং/বা সম্মিলিত মালিকানা রয়েছে। যদিও এসব নীতির কোনোটিই পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামো আপাতদৃষ্টিতে পরিবর্তন করতে পারে নি, তবে এগুলো একসাথে শক্তির ভারসাম্য পুঁজি থেকে শ্রমে সরিয়ে দেবে আর দীর্ঘমেয়াদে রূপান্তরকে উৎসাহিত করবে বলে প্রত্যাশা ছিল। অবশ্যই এই প্রত্যাশা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। তবে আসলে এটি পুরোপুরি কখনোই পরীক্ষিত হয় নি যেহেতু নব্য-উদারনীতিবাদ কার্যকরভাবেই এই পরীক্ষায় ইতি টেনেছে।' (ফ্রেজার ২০০৩: ১১০ছ)

এই 'অসংস্কারপন্থী সংস্কার'-এর কৌশলের লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক উদারনীতি ও ন্যায্যতার সমাজতান্ত্রিক ধারণার মধ্যে একটি যোগাযোগের মাধ্যম তৈরি করা।

২.২.৪ 'অর্জন বা যোগ্যতা-ভিত্তিক ন্যায্যতা' ও 'প্রয়োজন-ভিত্তিক ন্যায্যতা'র মধ্যে ন্যায্যতার রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

অসম বণ্টনের রাজনৈতিক সমর্থন -দুটি রাজনৈতিক ধারণা

ওপরের বিভিন্ন দার্শনিক আলোচনা থেকে দেখা যায় যে ন্যায্যতাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। তবে দার্শনিক ব্যাখ্যা আমাদের শুধু এ পর্যন্তই নিয়ে যায়। প্রকৃত বিষয় যেটি তা হচ্ছে একটি আপেক্ষিক সংজ্ঞা যা সামাজিক দর-কষাকষির ওপর নির্ভর করে আর বিভিন্ন সামাজিক দল (যেমন ট্রেড ইউনিয়ন, নিয়োগকর্তাদের সমিতি ও রাজনৈতিক দল) দাবি করে।

দার্শনিক আলোচনায় যেভাবে উঠে এসেছে তা হচ্ছে শেষ পর্যন্ত ন্যায্যতার প্রশ্ন সবসময়ই বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যের বণ্টন (বিতরণমূলক ন্যায্যতা) নিয়ে, যা ন্যায্য বা অন্যায্য হিসেবে মূল্যায়িত হয়।

রাজনৈতিক বিতর্কে অন্যদিকে ন্যায্যতার দুটি ভিন্ন ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার লক্ষ্য হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পণ্যের বণ্টনকে যুক্তিসংগত ও আইনগত ভিত্তি দেওয়া।

অর্জনভিত্তিক ন্যায্যতা

অর্জনভিত্তিক ন্যায্যতার ধারণা প্রকাশের আরেকটি উপায় হচ্ছে 'অর্জনকে আবার পুরস্কৃত করতে হবে' - এই শ্লোগানটি। এফডিপি (ফ্রি ডেমোক্রাটিক পার্টি) ও সিডিইউ-এর সনাতন ধ্যান-ধারণা সাধারণত এই মতামত দেয় যে পণ্যের বিতরণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছলতর হওয়াকে অর্জন বা যোগ্যতা বৈধতা দেয়। কাজেই অর্জনভিত্তিক ন্যায্যতা ধরে নেয় যে বণ্টনমূলক ন্যায্যতা ব্যক্তির অর্জন বা যোগ্যতার প্রেক্ষাপটে মাপা যায়।

এর একটি উদাহরণ হচ্ছে স্বাস্থ্য বীমার ক্ষেত্রে আয়ের শেষ সীমা। একটি নির্দিষ্ট বার্ষিক আয়ের ওপরে হলে কোনো একটি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বীমার স্কিম বেছে নেওয়া সম্ভব হয়, যে স্কিমের উদ্দেশ্য হচ্ছে রীতি অনুযায়ী কেউ অসুস্থ হলে তার ভাল চিকিৎসা নিশ্চিত করা। বামপন্থীদের অনেকেই এ বিষয়ে স্বাচ্ছন্দ্য নয়, এবং এমনকি কখনো কখনো এর একেবারেই বিরোধী।

অন্যদিকে অর্জনভিত্তিক ন্যায্যতা বামপন্থীদের আরেকটি যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে একটি বহুল-ব্যবহৃত যুক্তি হচ্ছে -'শক্তিশালী কাঁধের বেশি বোঝা বহন করা উচিত'। যাদের বেশি আছে তাদের জনকল্যাণের জন্য আরও বেশি দেওয়া উচিত। সামাজিক নিরাপত্তা যেমন বেকার ও অবসর বীমা নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান রক্ষিত হবে - যারা বেশি দেয় তারা তাদের প্রয়োজনে বেশি পাবে।

কর্পোরেট বেতন কাঠামোর সমালোচনার ক্ষেত্রেও একই ধরনের যুক্তি দেওয়া যায়। কোনো একটি কোম্পানির একজন প্রধান নির্বাহী ঐ কোম্পানির সাফল্যে এর একজন কর্মীর তুলনায় কি আসলেই ঐ পরিমাণ অবদান রাখে? একজন সেবিকার কাজের তুলনায় একজন স্টক মার্কেটের বিশ্লেষকের কাজ কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

অন্য কথায় বেশ কিছু রাজনৈতিক পক্ষ 'অর্জনভিত্তিক ন্যায্যতা'কে বেছে নিয়েছে। অসম বণ্টনের পক্ষে একটি রাজনৈতিক যুক্তির ভিত্তি হিসেবে এটি এখন প্রতিষ্ঠিত। তবে এটি এখনো একটি আপেক্ষিক যুক্তি আর কাজেই সামাজিক সম্পর্ক ও দর-কষাকষির একটি বিষয়।

প্রয়োজনভিত্তিক ন্যায্যতা

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান যেভাবে দাবি করে তার ভিত্তিতে তাদের কী সুবিধা পাওয়া উচিত তাই হচ্ছে প্রয়োজনভিত্তিক ন্যায্যতা। যেমন, প্রয়োজনে একজন ব্যক্তির কোনো ধরনের চিকিৎসা সেবা দরকার হতে পারে। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিরা এটি দাবি করতে পারে না কারণ তাদের এ ধরনের সেবার চাহিদা নেই, অথবা তাদের প্রয়োজন সামাজিকভাবে স্বীকৃত নয়। সামাজিক নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বেশিরভাগ সামাজিক পরিবর্তনের একটি প্রয়োজনভিত্তিক অবস্থান রয়েছে। কাজেই প্রয়োজনভিত্তিক ন্যায্যতা আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় বৈধতার একটি নীতি হিসেবে বিদ্যমান।

উভয় ধরনের যুক্তিই বার বার রাজনৈতিক আলোচনায় উঠে আসে।

২.২.৫ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা: সামাজিক গণতান্ত্রিক ধারণা হিসেবে সমতা ও ন্যায্যতা

ন্যায্যতার বিতর্কে গুরুত্বের পরিবর্তন

ন্যায্যতার ধারণার ওপর আলোচিত দার্শনিক ভাবধারার সাথে সাথে সামাজিক গণতন্ত্রের মধ্যেই মূল রাজনৈতিক ধারণার যে ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটে তা কৌতুহলোদ্দীপক। এই বিবর্তন ফেডারেল ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই হয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে ন্যায্যতার ওপরে রাজনৈতিক বিতর্কে একটি বিশেষ পরিবর্তন চিহ্নিত করা যায়। এটি যদিও তাত্ত্বিক বিতর্কের থেকে আলাদাভাবে উদ্ভূত, তাহলেও এর দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত।

এই পর্যায়ে আমরা অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে সামাজিক গণতন্ত্রের নীতিগত তত্ত্ব পর্যালোচনা করব, কারণ সোশাল ডেমোক্র্যাটদের কর্মসূচির আলোচনায় এটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

তাদের ধারণার সংজ্ঞায় একটি ধারাবাহিকতা চিহ্নিত করা যায়। সোশাল ডেমোক্র্যাটিক সরকারগুলোর বিভিন্ন সময় অনুযায়ী একে পরিবর্তনের দ্বারা চিহ্নিত করা যায়, যেভাবে রাজনৈতিক উপায়ে ন্যায্যতা বাস্তবায়িত বা নির্ধারিত হয়। 'সমতা'র ধারণা সময়ের পরিক্রমায় 'সমান সুযোগের' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, এবং পরবর্তীতে তা 'সমতাভিত্তিক সুযোগে' রূপান্তরিত হয়েছে।

সমতা

বিশেষভাবে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত সমতার আহবান শুধু বামপন্থী দলগুলোর দ্বারাই চিহ্নিত ছিল, যখন জার্মানিতে সোশাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি বাড গোডেসবার্গে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এর নতুন নির্বাচকদের একটি অংশের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। এটি জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ হলেও কাজের ক্ষেত্র ছিল কেন্দ্রীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সমতাকে প্রাথমিকভাবে স্বাধীনতার ঘাটতি ও উৎপাদনের সাপেক্ষে শোষণের সাথে যুক্ত করা হয়। কয়লা ও ইস্পাত শিল্পে আন্দোলন যা ১৯৫০ এর দশকের ধারাবাহিক ধর্মঘট পর্যন্ত চলেছিল, যার স্মৃতি এখন প্রায় মুছে গেছে বললেই চলে। এর লক্ষ্য ছিল আরও সমতা অর্জন করা; অন্য ভাষায়, কাজে ও জীবনযাপনের অবস্থার প্রেক্ষিতে আরও দৃঢ়সংকল্প হওয়া। এর ফলাফল ছিল মিশ্র - কর্মক্ষেত্রে এই আন্দোলনের সাফল্য ছিল আংশিক, যদিও দীর্ঘমেয়াদী কর্মজীবনে সমতার দাবি পূরণ হয় নি।

সুযোগের সমতা

ব্রানট যুগে এবং তথাকথিত 'সোশাল লিবারেল কোয়ালিশন'-এর অধীনে (এসপিডি/এফডিপি) 'সুযোগের সমতা'র ধারণা প্রবর্তিত হয়, যার প্রভাব এখন পর্যন্ত যথেষ্ট রয়েছে (আর শুধু সোশাল ডেমোক্র্যাটদের মধ্যেই নয়), আর বিশেষভাবে ব্রানট যুগে এটি প্রগতিশীল রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছিল। এই নতুন ধারণাটির সামাজিক অসমতা মেনে নেওয়ার প্রবণতা ছিল, আর এটি সামাজিক অসমতার পরিবর্তে শিক্ষানীতির ওপর মনোযোগ দেয়। শিক্ষার প্রসার ও সরকারি খাত সমাজের নতুন ও নির্বাচকদের একটি অংশের কাছে পৌঁছানোর প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠল। অসমতাকে ভাবতে গিয়ে শুধু বস্তুগত বণ্টনই নয়, বরং

সমাজে শিক্ষার সুযোগের বণ্টনও বিবেচনা করা হয়েছে। সোশাল ডেমোক্র্যাটদের ক্ষেত্রে বস্তুগত সম্পদের অসম বণ্টন আর শিক্ষার সুযোগের অসম বণ্টন যে একসাথে চলে তা উল্লেখ করা হয় নি। তবে উদারনৈতিকরা (লিবারেল) সমতা ও সুযোগের সমতাকে সম্পর্কিত করার ওপর কম জোর দিয়ে বরং সুযোগের সমতা দিয়ে সমতাকে প্রতিস্থাপনের ওপর বেশি জোর দেয়। সুযোগের সমতা এমন একটি বিষয় যার ওপর লিবারেলরা বেশি যুক্ত থাকতে পারত, যা না হলে একটি সোশাল লিবারেল জোট গঠন সম্ভব হত না।

একটি নতুন সামাজিক কাঠামোর চিহ্ন ও রাজনীতির পুনর্বিন্যাস ছিল নতুন মনোযোগের ক্ষেত্র। এর একটি শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য ছিল সুযোগের সমতার ধারণা, যা এমন একটি সময়ে প্রবর্তিত হয় যখন কল্যাণ রাষ্ট্রকে ইতিবাচকভাবে দেখা হত, আর যা অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

পক্ষপাতহীন সুযোগ

চ্যান্সেলর গেরহার্ড শ্রোয়েডার-এর সময়, সোশাল ডেমোক্র্যাটিক সরকারের তৃতীয় শাসনামলে, সুযোগের সমতার ধারণার সাথে যোগ হয় 'পক্ষপাতহীন সুযোগ'। 'পক্ষপাতহীন সুযোগ' বণ্টনের ক্ষেত্রে বেশি জোর দেয়। এই ধারণা অনুযায়ী সমাজের সুযোগগুলো বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের বণ্টনের সাথে সম্পর্কিত। আবার এসব সম্পদ অর্থনৈতিক দিক থেকে সীমিত, যা ছিল এই সরকারের মূল বিষয়।

কাজেই সীমিত সুযোগগুলো 'নিরপেক্ষভাবে' বণ্টিত হওয়া উচিত। আর এক্ষেত্রে শ্রোয়েডারের নীতি ছিল অর্জন বা যোগ্যতাভিত্তিক ন্যায্যতার ধারণা থেকে ধার নেওয়া। 'সহযোগিতা ও চ্যালেঞ্জ'-এর সূত্র সুযোগের অনুমোদন আর বস্তুগত সম্পদের বরাদ্দ ও একইসাথে প্রত্যাশিত ফলাফলকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

পক্ষপাতহীন সুযোগের সংজ্ঞা বামপন্থীদের বিভক্ত করেছে

পক্ষপাতহীন সুযোগের সংজ্ঞা নিজেই রাজনৈতিক বিতর্কে বামপন্থীদের বিভক্ত করে। এর মূল প্রশ্ন হচ্ছে:

- সম্পদ কি আসলেই সীমিত? যদি তাই হয় তাহলে কতটুকু সীমিত? অথবা এটি কি রাজনৈতিক সদিচ্ছার বিষয়, যেখানে সরকারি অর্থায়ন আর সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত?
- বর্তমানের দায় ও ত্রাণের সামাজিক বণ্টনকে কি নিরপেক্ষ বলা যায় (উদাহরণস্বরূপ, ব্যবসায়ে দায় কমানোর জন্য যেখানে সামাজিক নিরাপত্তা বরাদ্দ কমানো হয়)?

কে কীভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর দেয় তা বিবেচনা না করেই এটি পরিষ্কার যে ন্যায্যতার ধারণা যথেষ্ট বিতর্কিত - তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই।

সোশাল ডেমোক্র্যাটদের জন্য ন্যায্যতার বিতর্ক থেকে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জঃ

- বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যের বণ্টনের কথা ভাবলে ন্যায্যতা হচ্ছে একটি কেন্দ্রীয় চেতনা। একথা বলার পর সোশাল ডেমোক্র্যাটদের ন্যায্যতার কোনো মানদণ্ড থাকে না যার ওপর তারা নির্ভর করতে পারবে। বৈধতার নীতি হিসেবে ন্যায্যতা সামাজিকভাবে কার্যকর কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে বিতর্কিত।
- ভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায্যতাকে ভিন্ন উপায়ে দেখতে হয়।
- বৈধতার প্রয়োজনে দ্রব্যের সমান বণ্টন হিসেবে সমতার প্রয়োজন নেই। ন্যায্যতার দিক থেকে এর যেকোনো ব্যত্যয় অবশ্যই সংজ্ঞায়িত ও দর-কষাকষি হতে হবে।
- সমতা ছাড়া প্রকৃত স্বাধীনতাকে ভাবা যায় না।

এসপিডি'র হামবুর্গ কর্মসূচিতে 'ন্যায্যতা'

'প্রতিটি ব্যক্তির সমান সম্মানের মধ্যেই ন্যায্যতা নিহিত। কোনো পূর্ব অবস্থান বা জেন্ডার বিবেচনা ছাড়াই এটি সমান স্বাধীনতা ও সমান সুযোগের সমার্থক। কাজেই ন্যায্যতা অর্থ শিক্ষা, কাজ, সামাজিক নিরাপত্তা, সংস্কৃতি ও গণতন্ত্রে সমান অংশগ্রহণ, এবং সব সরকারি খাতে/ পণ্যে সমান অভিগম্যতা। যেখানে আয় ও সম্পদের অসম বণ্টন সমাজকে এমনভাবে বিভক্ত করেছে যেখানে একদল মানুষ দেয় আর একদল মানুষ নির্দেশ গ্রহণ করে, সেখানে সমান স্বাধীনতা খর্ব হয়, আর সেখানেই নিরাপত্তা থাকে না। কাজেই ন্যায্যতার জন্য প্রয়োজন আয়, সম্পদ ও ক্ষমতার সমান বণ্টন। ... অর্জনকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে আর শ্রদ্ধা করতে হবে। আয়ের ও সম্পদের অর্জনভিত্তিক বণ্টন হচ্ছে পক্ষপাতহীন। সম্পদের মালিকানা দায়বদ্ধতা তৈরি করে - যাদের আয় গড় আয়ের চেয়ে বেশি বা যারা অন্যদের চেয়ে বেশি সম্পদের মালিক তাদের অবশ্যই সমাজের কল্যাণের জন্য অবদান রাখতে হবে।' (হামবুর্গ কর্মসূচি ২০০৭: ১৫ ছ)

২.৩ একতা

একতার সংজ্ঞা

সবচেয়ে কম আলোচিত নীতি হচ্ছে 'একতা'। তর্কাতীতভাবেই এর কারণ হচ্ছে যে একতা আমাদের সাধারণ মানবিকতার সাথে সম্পর্কিত, আর কাজেই একে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে ফেলা বেশি কঠিন। বেশ কয়েকজন লেখকের ভাষ্য অনুযায়ী একতাকে নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, [৮]

- সম্প্রদায় ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধের অনুভূতি; যা
- একগুচ্ছ সাধারণ স্বার্থ থেকে উদ্ভূত; এবং
- আচরণ দ্বারা প্রকাশিত যা সমাজের উপকার করে এবং এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির নিজস্ব স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়, এবং
- পারস্পরিক ন্যায্যতার প্রতি আনুষ্ঠানিক দাবির বাইরে যায়।

একতা ও সামাজিক পরিচয়ের মধ্যে সম্পর্ক

কাজেই 'একতা' হচ্ছে সাধারণ 'সামাজিক পরিচয়ের' বিষয়, যার উৎস হচ্ছে জীবনের একই ধরন ও মূল্যবোধ।

মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ও নৈতিক দার্শনিক মাইকেল ওয়ালজার উল্লেখ করেন যে একতা 'বিপদজনক হতে পারে যখন প্রতিদিনকার সহযোগিতার পরিবর্তে এটি শুধু প্রকৃত ও বাস্তব একটি অনুভূতি, একটি মানসিক পরিবর্ত (প্রতিফলনের বদলে) হয়ে থাকে'। (ওয়ালজার ১৯৯৭: ৩২)

একতার প্রয়োজন সমতা ও স্বাধীনতার

কাজেই আমরা একটি গণতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীনতা ও সমতার বাস্তবায়নের আলোচনা না করে একতার কথা বলতে পারি না।

[৮] উদাহরণস্বরূপ, হনড্রিখ ও অন্যান্য ১৯৯৪; কারিগিয়েট ২০০৩।

এই ধারণাকে আয়ত্তে আনা যত কঠিনই হোক না কেন এটি স্থিতিশীলতা ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রেক্ষিতে সামাজিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যেমন মহান সামাজিক বীমা স্কিম (বেকারত্ব, চিকিৎসা, অবসর ভাতা ও দুর্ঘটনা বীমা) হচ্ছে শ্রমশক্তির একতাভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান। ১৮৯০ বা ১৯২০-এর দশকগুলোতে এর প্রচলন অবশ্যই শ্রমিকদের অব্যাহত তীব্র চাপের ফলে এবং সোশাল ডেমোক্র্যাটদের দ্বারা, এমনকি বিসমার্ক-এর রক্ষণশীল সরকারের অধীনেও বাস্তবায়িত হয়েছে।

সমবায় আন্দোলনকেও একতার একটি গোষ্ঠী হিসেবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা যায়, যেখানে একটি গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের একই স্বার্থের ভিত্তিতে গতানুগতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে একটি পর্যায় পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় করতে পারে।

এছাড়াও উল্লেখ করা উচিত যে একতা কার্যকর হতে গেলে বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে বোঝাপড়া করতে হবে। এটি এই সত্যের দিকে নির্দেশ করে যে একতা বাস্তব হবে তখনই যখন এটি ভিন্ন হবে, কিন্তু সবার ওপরে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাধারণ স্বার্থকে বিবেচনায় নিতে হবে।

এসপিডি'র হামবুর্গ কর্মসূচিতে 'একতা':

'একতা অর্থ পারস্পরিক সম্পর্ক, সহায়তা ও দায়বদ্ধতা। এটি হচ্ছে মানুষের পরস্পরকে সাহায্য করা ও পরস্পরের জন্য উঠে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি - শক্তিশালী ও দুর্বলের মধ্যে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মধ্যে আর মানুষের মধ্যে প্রস্তুতি। একতা পরিবর্তনের জন্য শক্তি তৈরি করে: এটি শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা। একতা এমন একটি তীব্র শক্তি যা একইসাথে স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যক্তিগত প্রস্তুতিতে সহায়তার জন্য একই নিয়ম-নীতি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের সমাজকে বেঁধে রেখেছে। একতা আরও আছে কল্যাণ রাষ্ট্রে যা এক ধরনের রাজনৈতিকভাবে নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত ও সংগঠিত একতা'। (হামবুর্গ কর্মসূচি ২০০৭: ১৬)

একতার আলোচনা থেকে উদ্ভূত সামাজিক গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জঃ

- সমাজের ভেতরে বন্ধন হিসেবে একতা লালিত হতে পারে, কিন্তু এটি তৈরি করা যায় না।
- একটি সামাজিক গণতন্ত্রে রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের সংগঠন কিভাবে একতার বন্ধন প্রভাবিত করে তা যাচাই করতে হবে।
- একতাকে অবশ্যই সবসময় স্বাধীনতা ও সমতার বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত করে আলোচনা করতে হবে।

২.৪ অন্যান্য চিন্তাধারা

মার্টিন টিমপে

স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক গণতন্ত্রের মূল চেতনাগুলোই একমাত্র নীতি নয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলও দলীয় কর্মসূচি বা এর মত অন্যান্য ভিত্তিমূলক দলিলে তাদের মূল নীতি তৈরি করেছে। আমরা খুব সংক্ষেপে এসব নীতির সার-সংক্ষেপ দেখব। এটি সম্পূর্ণ বলে দাবি করা হচ্ছে না, তবে বিস্তারিত বিবরণ ছাড়াই একটি সার্বিক পর্যালোচনাই আমাদের লক্ষ্য।

‘ঈশ্বরের সৃষ্টি’: সিডিইউ

‘ঈশ্বরের সৃষ্টি’

সিডিইউ-এর কেন্দ্রীয় চেতনা হচ্ছে স্বাধীনতা, ন্যায্যতা ও একতা। এই তিনটি নীতি হ্যানোভারে ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত দলীয় সম্মেলনে সিডিইউ-এর নতুন দলীয় কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যদিও প্রথম দর্শনে এসব নীতি এসপিডি’র হামবুর্গ কর্মসূচির মতই একইরকম মনে হয়, তবে কাছে থেকে দেখলে বেশ কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। যেমন, মানবতা ও ‘ঈশ্বরের সৃষ্টি’ সংক্রান্ত খ্রিস্টীয় ধারণার প্রতি সিডিইউ-এর জোরালো সমর্থন উল্লেখযোগ্য। সিডিইউ-এর জন্য খ্রিস্ট ধর্ম একটি কেন্দ্রীয় বিষয় যেখানে সোশাল ডেমোক্র্যাটদের জন্য এটি অনেকগুলো উৎসের মধ্যে একটি যা থেকে তার নীতিগুলো এসেছে। ব্যাভারিয়ার আঞ্চলিক সিএসইউ (ক্রিশ্চিয়ান সোশ্যাল ইউনিয়ন) পার্টির ক্ষেত্রে এই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ যার সাথে ডানপন্থী রক্ষণশীল দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ মিশ্রিত।

অন্তত একটি পর্যায় পর্যন্ত সিডিইউ-এর স্বাধীনতার ধারণা এসপিডি’র ধারণা থেকে ভিন্ন। প্রথমত, সিডিইউ-এর স্বাধীনতার ধারণা অন্য দুটি নীতির চেয়ে বেশি বিস্তারিত। প্রকৃতপক্ষে এর দলীয় কর্মসূচির শিরোনাম ছিল ‘আরও স্বাধীনতার মাধ্যমে নতুন ন্যায্যতা’। দুটি দলই স্বাধীনতার ধারণার একটি দেশপ্রেমের মোড়ক দিতে পারত, তবে এসপিডি এসব চেতনা সমান মর্যাদার বলে মনে করে। এছাড়া সিডিইউ-এর কর্মসূচিতে ক্ষমতায়ন ও ইতিবাচক বিষয়ের চেয়ে রক্ষণাবেক্ষণমূলক বা নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়।

এফডিপি’র তিনটি নীতি: স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা

স্বাধীনতা, স্বাধীনতা স্বাধীনতা

এফডিপি’র কোনো দলীয় কর্মসূচি নেই। তবে ১৯৯৭ সালে দলের ফেডারেল ককাস-এ গৃহীত উইজবাডেন ডিক্লারেশন অব বেসিক প্রিন্সিপলস-এ দেখা যায় পরিষ্কারভাবেই দলের দৃষ্টিভঙ্গী স্বাধীনতার নীতির প্রতি পক্ষপাতমূলক। এতে বোঝা যায় যে দলটি রাজনৈতিক উদারনীতিতে বিশ্বাসী। তবে এটিও আপত্তি করার মত যে এটি একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন, এটি মনে রাখা অযৌক্তিক হবে না যে লক-এর সমাজের ধারণায় ন্যায্যতার বিভিন্ন দিক কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে।

জন লক ছিলেন রাজনৈতিক উদারনীতির একজন অন্যতম প্রবক্তা। এর বিপরীতে এফডিপি তার প্রত্যেক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বাধীনতার ধারণার সাথে সম্পৃক্ত করতে চায় বলে দেখা যায়। 'স্বাধীনতার অর্থ প্রগতি' বা 'স্বাধীনতার অর্থ ভবিষ্যতের সাথে সংগতি' ইত্যাদি ধরনের শ্লোগান থেকে দেখা যায় কিভাবে কৃত্রিমভাবে ফ্রি ডেমোক্র্যাটরা এমন একটি নীতির সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যার গুরুত্ব নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। তবে এটি আরও পরিষ্কার, যে সমাজ তার দৃষ্টি ন্যায্যতা ও একতার ভিত্তিতে সহযোগিতার বদলে বিশেষভাবে স্বাধীনতার ওপর রাখে, সেই সমাজ খুব তাড়াতাড়িই সমস্যায় পড়বে, আর সামাজিক স্থিতি হুমকির মুখে পড়বে।

সবার জন্য কিছু কিছু: বুন্ডনিস ৯০/ দ্য গ্রিনস

সবার জন্য কিছু কিছু:

গ্রিনরা নিজস্ব ইচ্ছার ওপর জোর দেয়। তাদের ন্যায্যতার ধারণার এত বেশি ধরন আছে যে এটি বোঝা খুব কঠিন। বণ্টনমূলক ন্যায্যতার সাথে সাথে (যা মেনে চলতে হয়) গ্রিনরা অংশগ্রহণমূলক ন্যায্যতা, প্রজন্মের মধ্যকার ন্যায্যতা, জেন্ডার ন্যায্যতা ও আন্তর্জাতিক ন্যায্যতা নিয়ে কাজ করে। অবশ্যই এদের কোনোটির চাহিদার বিষয়ে কোনো অন্তর্নিহিত ভুল নেই। তবে অগ্রাধিকার নির্ণয় না করে সবগুলোকে একই মর্যাদা দেওয়ায় পাঠক ন্যায্যতা অর্থ কী সে সম্পর্কে খুব সামান্যই জানতে পারে।

একটি পরিবশবাদী দলের জন্য মানানসই হিসেবে কেন্দ্রীয় নীতিগুলো সব ধরনের নীতিগত ক্ষেত্রে টেকসই হওয়ার আহবান জানায়। তবে গ্রিনদের পক্ষে টেকসই হওয়াকে অন্যান্য চেতনা যেমন স্বাধীনতা, ন্যায্যতা ও একতার সমান মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি কম বিশ্বাসযোগ্য।

সবকিছুই এখনো পরিবর্তনশীল: ডাই লিংকে (বাম)

সবকিছুই এখনো পরিবর্তনশীল

এখন পর্যন্ত ডাই লিংকে (বাম) কোনো দলীয় কর্মসূচি গ্রহণ করে নি। এই দলটি পিডিএস (পার্টি অব ডেমোক্র্যাটিক সোশালিজম) ও ডব্লিউএএসজি-এর (লেবার অ্যান্ড সোশাল জাস্টিস - দ্যা ইলেকটোরাল অলটারনেটিভ) জোটবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি খসড়া কর্মসূচির ভিত্তিতে এই জোট গঠিত হয়। তবে এই খসড়া কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় নীতি সম্পর্কে খুব সামান্য উল্লেখ রয়েছে। এখানে চেতনা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সমতা, ন্যায্যতা, আন্তর্জাতিকতা ও একতার উল্লেখ রয়েছে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতা পরিষ্কারভাবে স্বীকৃত, যা ছাড়া 'সমতা' ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় ও বশ্যতায় পরিণত হয়। একইভাবে এটিও পরিষ্কার যে সমতা ছাড়া স্বাধীনতার অর্থ শুধু ধনীদের জন্য স্বাধীনতা। প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতের কর্মসূচিতে স্বাধীনতা ও সমতার সম্পর্ক সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে ডাই লিংকে'কে সাবধান থাকতে হবে ও তদারকির মধ্যে রাখতে হবে।

২.৫ মূল চেতনাগুলোর চর্চা

নৈতিক চেতনাগুলোর তাত্ত্বিক বিষয় পর্যালোচনার পর আমরা এখন এগুলোর ব্যবহার দেখব। প্রতিদিনকার রাজনৈতিক বিতর্কে গণতন্ত্রের জন্য এসব চেতনা কী ভূমিকা পালন করে?

বিভিন্ন পর্যায় থেকে প্রাপ্ত উদাহরণ নতুন ধারণা তৈরিতে সাহায্য করবে আর এগুলোর ব্যবহারে উৎসাহিত করবে।

২.৫.১ শিক্ষানীতি [৯]

মূল পরিকল্পনা (মাস্টার প্ল্যান): 'বিদ্যালয় ভবিষ্যতের জন্য সুযোগ তৈরি করে' - প্রগতিশীল শিক্ষানীতির স্থানীয় প্রয়োগ [১০]

মার্ক হারটার

২০০৩ সালে প্রথম পিসা (PISA) গবেষণায় জার্মান শিক্ষা ব্যবস্থার ঘাটতি চিহ্নিত করার পর থেকে জাতীয়, প্রাদেশিক (ভূমি) ও স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে শিক্ষানীতি আলোচিত হয়ে আসছে। এই আলোচনার কেন্দ্রে যে সত্য রয়েছে তা হল অন্য দেশগুলোর তুলনায় জার্মানিতে শিক্ষার ফলাফল মোটামুটিভাবে শিশু ও তরুণ প্রজন্মের সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পর্কিত। তাহলে একটি সামাজিকভাবে ন্যায্য ও একতাভিত্তিক বিদ্যালয় ব্যবস্থা, যা একইসাথে সবাইকে তাদের শিক্ষা ও পেশা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা দেবে, তা কেমন হতে পারে?

হাম-এ এসপিডি এই প্রশ্নটি লুফে নেয় আর একটি অখণ্ডিত সামাজিক গণতান্ত্রিক ধারণা তৈরি করে যা তথাকথিত 'মূল পরিকল্পনা: বিদ্যালয় ভবিষ্যতের জন্য সুযোগ তৈরি করে' নামে পরিচিত। একটি শহর হিসেবে হাম একটি প্রশাসনিক জেলা। এর নিজস্ব অধিকারে হাম তার বিদ্যালয়গুলো পরিচালনা করে, আর একইসাথে এসব বিদ্যালয়ের 'ভবিষ্যৎ-কেন্দ্রিক উন্নয়নের' জন্য দায়বদ্ধ। তাহলে এই 'মূল পরিকল্পনা'র উদ্দেশ্য কী?

এক্ষেত্রে বলা যায় হাম-এর বিদ্যালয় নীতি চরিত্রগতভাবে 'সাময়িক' (যেখানে সিডিইউ/এফডিপি'র জোট ক্ষমতায় রয়েছে)। অন্য কথায়, যখন বিদ্যালয়ে ছাত্র নিবন্ধন অনেক বেশি বেড়ে যায় বা কমে যায় তখন হয় বিদ্যালয়ের পরিসর বাড়ানো হয়, ছাত্র সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, অথবা ছাত্রদের অন্য বিদ্যালয়ে পাঠানো হয় যতক্ষণ না ভারসাম্য

[৯] শিক্ষার জন্য দেখুন রিডার ৩: কল্যাণ রাষ্ট্র ও সামাজিক গণতন্ত্র (২০১২), অধ্যায় ৭.৫, শিক্ষা।
[১০] এই উদাহরণটি বিদ্যালয় উন্নয়ন কর্মসূচির ওপর ভিত্তি করে যা এসপিডি হাম-এ বাস্তবায়ন করে।

ফিরে আসে। একটি সমস্যা মিটে যাওয়ার পর পরবর্তী সমস্যা কবে আসবে সেজন্য অপেক্ষা করা হয়।

এটি কোনো ভবিষ্যৎ-কেন্দ্রিক স্থানীয় বিদ্যালয় ব্যবস্থার জন্য যথাযথ ভিত্তি হতে পারে না।

নতুন বিদ্যালয়ের ধারণার আরেকটি আলোচনার বিষয় হচ্ছে - শুধু বিদ্যালয় ব্যবস্থা নয়, বরং শিশু ও যুব কল্যাণের জন্য গৃহীত উদ্যোগ তাদের শিক্ষার ফলাফলে সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা পালন করে। এর সাথে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সহায়তা, শ্রম বাজার ও একীভূতকরণও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি গভীর বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে 'মূল পরিকল্পনা' দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ও কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে, যার মূল বিষয় হচ্ছে শিক্ষামূলক অংশগ্রহণ ও ফলাফলের উন্নয়ন।

সামাজিক গণতান্ত্রিক মূল পরিকল্পনা

এর লক্ষ্য ছিল কিভাবে শহরের বৃহদংশের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে একটি সামাজিক গণতান্ত্রিক বিকল্প প্রস্তাব করা যায়। পূর্ববর্তী বিদ্যালয় নীতির ব্যর্থতার দুটি নির্দেশক ও সর্বব্যাপী 'পিসা' গবেষণা পরিষ্কারভাবে দেখায় এটি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ:

- ৩০ শতাংশের নিচে বার্ষিক পাশের হার নিয়ে হাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সাধারণ যোগ্যতার ক্ষেত্রে (আবিটুর) নর্থ রাইন ওয়েস্টফালিয়া প্রদেশের অন্যান্য ক্রাইসফ্রাই শহরের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। প্রতিবেশি শহর মুনস্টার-এর পাশের হার ছিল ৫০ শতাংশ।
- যেখানে বেশিরভাগ স্বচ্ছল জেলায় প্রায় ৫০ শতাংশ ছাত্র জিমনাশিয়াম-এ (যুক্তরাজ্যের গ্রামার স্কুলের মত) যায়, সেখানে প্রথাগতভাবে কর্মজীবী জেলা হেরিনজেল থেকে প্রায় ১৯.৫ শতাংশ এটি করে।

একইসাথে সমাজ-জনসংখ্যাভিত্তিক পরিস্থিতিও মনোযোগের দাবি রাখে। ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে যাওয়া ছাত্রের সংখ্যা প্রায় এক-চতুর্থাংশ কমে যাবে। ২০১০ সালের মধ্যেই হাম-এ জন্ম নেওয়া প্রতিটি দ্বিতীয় শিশুর একটি অভিবাসী ইতিহাস থাকবে। কাজেই সব প্রতিভার সর্বোচ্চ ব্যবহার ও অন্তর্ভুক্তিকরণ কেবলমাত্র রাজনৈতিক বিষয়ই নয়, বরং কাঠামোগত পরিবর্তনের অধীনে কোনো শহরের সফল উন্নয়নের একটি মূল শর্তও।

আমরা স্বাধীনতা বলতে কী বুঝি- সারাদিনের সেবা-যত্ন শুধু কয়েকজনের জন্য নয় মূল পরিকল্পনার প্রথম নীতি হচ্ছে সব ক্ষেত্রে সারাদিনের যত্ন সম্প্রসারণ করা। একবছর বয়সী শিশুদের থেকে শুরু করে উন্নত যত্ন শুরু হয় যা কার্যকরভাবে তিনবছর বয়সীদের চাহিদাও পূরণ করে। এরপর তিন থেকে ছয়বছর বয়সীদের সময়োপযোগী ও শিক্ষণবিদ্যা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ পূরণ করে যখন শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়স হয়, এরপর শুধু প্রাথমিক নয় বরং শিশুদের ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত 'উন্মুক্ত দিনভর যত্ন' দেওয়া হয়। এভাবে কর্ম ও দাম্পত্য জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান রক্ষা সম্ভব করা হয়। উপরন্তু শহরের পরিষদ কিভাবে ও কেন বাচ্চাদের বড় করা হবে তা নিয়ে ভনিতা করে না। কিন্তু পরিষদ একটি কাঠামো দেয় যেখানে বাবা-মা'রা স্বাধীনভাবে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এভাবে স্বাধীনতা শুধু স্বচ্ছল পরিবারের কুক্ষিগত থাকে না যাদের দেখাশোনা করার লোক নিয়োগ করার সামর্থ্য আছে। বরং এই স্বাধীনতা সব পরিবারের জন্য প্রযোজ্য যাতে তারা তাদের জীবন নিয়ে পরিকল্পনা করতে পারে।

প্রকৃত সামাজিক ন্যায্যতা- নতুন সুযোগের জন্য জেলা সর্বাত্মক বিদ্যালয় (District comprehensive schools)

মূল পরিকল্পনার আরেকটি নীতি হচ্ছে হাম-এর সাতটি জেলায় বিদ্যালয় ব্যবস্থায় আরও বেশি প্রবেশ্যতা ও গতির প্রচলন করা। প্রতিটি জেলায় সবগুলো পরীক্ষা সহজলভ্য হতে হবে। ছাত্রের সামাজিক অবস্থানের সাথে বিদ্যালয়ের সাফল্যের সম্পর্ক থাকার যে শৃঙ্খল তা ছিন্ন করাই এর লক্ষ্য। কাজেই এখানে জীবনের সুযোগ ও শিক্ষার সুযোগের সাপেক্ষে সমান অংশগ্রহণ থেকে সামাজিক ন্যায্যতা শুরু হয়, যা সব ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষার জন্য সমান অভিগম্যতা তৈরি করে। কাজেই অন্তর্ভুক্তি ও ব্যক্তির জন্য শক্তিশালী সহায়তার মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, বরং এরা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল।

কাজেই জেলার সর্বাত্মক বিদ্যালয়গুলো (নর্থ রাইন ওয়েস্টফালিয়া এসপিডি মডেল) পঞ্চম ও ষষ্ঠ বছরে মিশ্র ক্লাস চালানোর পর দশম বছর পর্যন্ত অখণ্ডিত ক্লাসের বিকল্প সুযোগ দেবে। এটি করা হবে একই বিদ্যালয় হিসেবে তিনটি ধারায় - হাউপশুলে (যুক্তরাজ্যের পুরানো মাধ্যমিক ধাঁচে), রিয়ালশুলে (আরও বেশি ব্যবহারিক বিষয়সহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়), এবং জিমনাশিয়াম (গ্রামার স্কুল)। স্থানীয় পর্যায়ে অনেক কিছুর পরিবর্তন হবে, যেমন জেলা সর্বাত্মক বিদ্যালয়গুলো জিমনাশিয়াম আর প্রথমবারের মত উপরোল্লিখিত হেরিনজেন জেলায় কারিগরি শিক্ষা প্রচলন করবে। অন্য তিনটি জেলাতেও প্রথম 'গ্রামার স্কুল' শিক্ষা প্রবর্তিত হবে। সার্বিকভাবে জনসংখ্যা বিন্যাসের পরিবর্তনের কারণে কোনো ধরনের সর্বাত্মক শিক্ষা প্রবর্তন করা ছাড়া কোনো জেলার পক্ষেই বর্তমান ব্যবস্থা ধরে রাখা সম্ভব হবে না।

একতা যা ফাঁকা বুলির চেয়ে বেশি কিছু - সামাজিক সহায়তা বাজেট

বিদ্যালয়ের নীতি প্রস্তাবের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সামাজিক সহায়তা বাজেট। এটি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যে বিশেষ চাহিদা ও পরিস্থিতি ভিন্ন থাকে তা বিবেচনায় নেয়।

যেসব অঞ্চলে শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ অভিবাসীদের মধ্য থেকে আসে সেখানে প্রতিদিনকার বিদ্যালয় কার্যক্রম গুরুতরভাবে বাধাগ্রস্ত হতে পারে। মূল কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য বিদ্যালয়ের বাজেটের বেশিরভাগ ব্যয় হয়ে যায়, যেমন বই, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ, দেখাশোনা ও দুপুরের খাবারে, যেখানে অন্য জায়গায় এ ধরনের বরাদ্দ শিক্ষণ, দিনভর দেখাশোনা, বিশেষ প্রকল্প ও যন্ত্রপাতির পেছনে ব্যয় করার মাধ্যমে মানসম্মত ব্যয় করা হয়। এর ফলে যেখানে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করা প্রয়োজন সেখানে অযৌক্তিকভাবে বিকল্প সবচেয়ে কম থাকে। অন্যদিকে সামাজিক সহায়তা বাজেট অনেক ধরনের লাল ফিতার বাইরে কাজ করবে - প্রত্যেক যোগ্য ছাত্রের জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয় একটি সহায়ক বাজেট পাবে, যা বিশেষ কঠিন সময়ে ১০ শতাংশ করে বৃদ্ধি করা হবে। এই প্রক্রিয়ায় বিদ্যালয়গুলো বিশেষ চাহিদার অর্থায়ন করবে আর পরবর্তীতে অন্যান্য বিদ্যালয়ের মতই বাজেটের সঠিক ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। এটি গতানুগতিক মাথাপিছু বাজেটের চেয়ে মৌলিকভাবে আলাদা। এর মাধ্যমে আর্থিকভাবে ধনী বিদ্যালয়ের সাথে দুর্বল বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একতা দাবি করে যার ফলে একই শহরে অর্থায়নের সম্ভাব্যতা সমান হয় যা সফল শিক্ষার ফলাফলকে সাহায্য করে।

সংলাপ

উপজেলা ও কাউন্সিল জোটের দ্বারা যৌথভাবে এই পরিকল্পনা তৈরি হওয়ার পর এটি অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অন্যান্য আগ্রহী অংশীজনের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে ও সাতটি জেলার সবগুলোতে আলোচনা করা হচ্ছে। এটি প্রযোজ্য জেলায় বাস্তবায়ন করা যাবে কিনা তা হচ্ছে এর মূল বিষয়।

২.৫.২ স্বাস্থ্যসেবা নীতি [১১]

সর্বজনীন স্বাস্থ্য বীমা বনাম ফ্ল্যাট রেট বীমা - পক্ষপাতহীন স্বাস্থ্যনীতির বিষয়

মার্টিন টিমপে ও ক্রিস্টিনা রেনশ

বিংশ শতকের অন্যতম বিশাল সামাজিক অর্জন হিসেবে স্বাস্থ্যসেবাকে গণ্য করা হয়। এই স্বাস্থ্য সেবা আয় বা সামাজিক শ্রেণির বিষয় নয়। স্বাস্থ্যসেবা একটি সুন্দর জীবনের ভিত্তি আর সবার জন্য সহজলভ্য হওয়া উচিত। এই অধিকার সামাজিক গণতন্ত্রের মূল চেতনাগুলোতে সরাসরি চিহ্নিত করা যায়।

স্বাস্থ্যসেবার অর্থায়ন জার্মানিতে নাগরিক বিতর্কের প্রধান একটি বিষয়। বিশেষকরে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিবেচনায় দুটি একেবারেই ভিন্ন নীতি রয়েছে যারা পরস্পরের বিপরীত - সিডিইউ-এর "ফ্ল্যাট রেট অবদান" বনাম এসপিডি'র "সর্বজনীন স্বাস্থ্যবীমা"।

কিভাবে এই দুটি মডেলকে সামাজিক গণতন্ত্রের মূল চেতনার সাপেক্ষে মূল্যায়ন করা যায়? এর উত্তরে আমাদের প্রথমে এ দুটি মডেল আর বিশেষভাবে ব্যক্তি স্বাস্থ্য বীমার শর্তগুলোকে কাছ থেকে দেখতে হবে।

সর্বজনীন স্বাস্থ্য বীমা

এসপিডি সংবিধিবদ্ধ স্বাস্থ্য বীমাকে সর্বজনীন স্বাস্থ্য বীমায় উন্নীত করার জন্য প্রচার করছে। এখানে বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখবে। তবে এর মূল্যায়নের ভিত্তি কোনো ব্যক্তির বেতন বা আয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না - তার অন্যান্য সব ধরনের আয়ও (যেমন পুঁজি থেকে আয়) বিবেচনা করা হবে। সর্বজনীন স্বাস্থ্য বীমার সাথে সাথে সংবিধিবদ্ধ স্বাস্থ্য বীমাও অব্যাহত থাকবে, যেখানে যাদের বীমা ইতোমধ্যে করা আছে ও নিয়োগকারীরা অবদান রাখবে। নিজস্ব আয় নেই এমন স্বামী-স্ত্রীদের বীমা অব্যাহত থাকবে এবং শিশুদের কোনো অবদান রাখতে হবে না।

ফ্ল্যাট রেট বীমা

সিডিইউ-এর বর্ণিত মডেলটি হচ্ছে 'স্বাস্থ্য প্রিমিয়াম'। এটি সবার জন্য সমান, এবং নিয়োগকারীদের অবদানের ভিত্তিতে একই মাসিক কিস্তির দ্বারা গঠিত, যা অবদানের ভিত্তিতে আয়ের ৬.৫ শতাংশে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

[১১] স্বাস্থ্যসেবার জন্য আরও দেখুন রিডার ৩: কল্যাণ রাষ্ট্র ও সামাজিক গণতন্ত্র (২০১২), অধ্যায় ৭.৪, স্বাস্থ্যসেবা।

এভাবে নিয়োগকারীদেরকে ভবিষ্যতের মূল্যস্ফীতি থেকে রক্ষা করা হয়েছে। এই ফ্ল্যাট রেটের ফলে যাদের আয়ের ৭ শতাংশের বেশি হয়ে যায় তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। যাদের শিশুদের ক্ষেত্রে অবদান সংবিধিবদ্ধ স্বাস্থ্য বীমা দ্বারা হয়ে থাকে ভবিষ্যতে তা কর থেকে অর্থায়িত করা হবে।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বীমার ভবিষ্যৎ

জার্মান স্বাস্থ্য বীমা ব্যবস্থার একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে যে কিছু ব্যক্তিকে এ ধরনের একতাভিত্তিক অবদান রাখতে হয় না। যেমন সরকারি কর্মকর্তা যারা সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ কর-অর্থায়নের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য বীমা পেয়ে থাকে তারা এর আওতামুক্ত, যেখানে আত্ম-কর্মসংস্থান রয়েছে এমন ব্যক্তিদের আয় বিবেচনা না করেই তাদেরকে আইনগতভাবে বীমার বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয়েছে। যেসব কর্মীর আয় একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে ('বীমার সীমা') তারা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বীমা নিতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে পুরো জনসংখ্যার অবদান স্বাস্থ্য সেবার একতাভিত্তিক অর্থায়নের জন্য পাওয়া যায় না। ব্যক্তিবিশেষের রাজনৈতিক চেতনা ও মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে এটি হয় একটি সমস্যা, অথবা স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার একটি ইতিবাচক চিত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা অথবা ফ্ল্যাট রেট বীমা প্রচলিত কিনা তার ওপর নির্ভর করে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সেবা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়। যেখানে সর্বজনীন স্বাস্থ্য বীমার একটি অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বীমাকে একতাভিত্তিক অর্থায়নে অন্তর্ভুক্ত করা, সেখানে ফ্ল্যাট রেট ব্যবস্থা ব্যক্তিগত সুবিধাকে স্পর্শ করবে না। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত বীমার আওতাভুক্তদের শিশুদের জন্য অবদান রাখার যে বাধ্যবাধকতা তার স্বাধীনতার অর্থায়নের জন্য কর রাজস্বকে ব্যবহার করা হবে।

একতাভিত্তিক অবদানভিত্তিক অর্থায়ন - পরিশোধ করার সামর্থ্য অনুসারে পক্ষপাতহীন বোঝা ভাগাভাগি

এটি অবশ্যম্ভাবী যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য বীমার প্রধানতম বিষয় হচ্ছে একতার উন্নয়ন। স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার অর্থায়নের জন্য সবাই একটি সর্বসাধারণের বীমা প্রকল্পে অংশগ্রহণ করবে।

সিডিইউ দাবি করে যে তার মডেলটি প্রকৃতিগতভাবেও একতাভিত্তিক। তারা এই বাস্তবতার দিকে বিশেষ নির্দেশ করতে পারে যে ফ্ল্যাট রেট ব্যবস্থায় সাধারণ কর ব্যবস্থা থেকে বেশি অবদান অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে এটি দুটি ক্ষেত্রে সমস্যাবহুল।

প্রথমত, যদি সিডিইউ ও এফডিপি উচ্চ আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য কর ছাড়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সক্ষমতা দুর্বল করে দেয়, তাহলে এটি পরিষ্কার নয় এই 'আর্থিক ক্ষতিপূরণ' কত বড় হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কর ব্যবস্থার মাধ্যমে একতাভিত্তিক ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করতে গেলে কর ব্যবস্থাও একতাভিত্তিক হিসেবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। সিডিইউ ও এফডিপি'র পরিকল্পনা এই ব্যবস্থাকে বাধা দেয়। এই জোটের রূপরেখার দর্শন হচ্ছে এই নীতি থেকে বেরিয়ে আসা যে আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতর ব্যক্তিদের দুর্বলদের চেয়ে বেশি দায়িত্ব বহন করা উচিত, যা প্রগ্রেসিভ করারোপ ব্যবস্থায় রয়েছে।

তবে যেভাবেই হোক যেটি কোনোভাবেই একতাভিত্তিক নয় তা হচ্ছে এই বাস্তবতা যে সরকারি কর্মকর্তাদের অব্যাহতি ফ্ল্যাট রেট মডেলের অধীনে অব্যাহত থাকবে, আর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বীমা (অন্ততপক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে) এর প্রতিযোগিতামূলক কাঠামো ধরে রাখবে।

তবে সর্বজনীন স্বাস্থ্য বীমার প্রচলন অর্থ এই নয় যে পছন্দের ক্ষেত্রে কম স্বাধীনতা থাকবে। এর একটি অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিগত বীমাকারীদের প্রয়োগকৃত ভিন্ন ভিন্ন হিসাবের ভিত্তির সহাবস্থান শেষ হয়ে যাবে। পরিবর্তে একটি বাধ্যবাধকতামূলক ধারার মাধ্যমে একটি একক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি 'নিরপেক্ষ প্রতিযোগিতা' তৈরি হবে।

বীমাকারীরা 'ভাল ঝুঁকির' (তরুণ ও স্বাস্থ্যবান বীমাকৃত) বদলে শর্তের মান নিয়ে প্রতিযোগিতা করবে। অন্য সবার স্বার্থের বদলে গুটিকয় মানুষের সুবিধা পাওয়ার পরিবর্তে চিকিৎসার আধুনিকায়নের সুফল সবার ভোগ করার সুযোগ থাকবে।

কোনো জনগোষ্ঠীর কাছে তাদের আর্থিক বোঝা বেড়েছে বা কমেছে বলে মনে হয় তা একটি ন্যায্যতার প্রশ্ন। এই ক্ষেত্রে দুটি মডেল নির্দিষ্টভাবেই আলাদা - সর্বজনীন স্বাস্থ্য বীমা মডেল দুই সন্তানবিশিষ্ট পরিবারের বোঝা কমিয়ে দেবে, যেখানে ফ্ল্যাট রেট ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণে তাদের বছরে ৯০০ ইউরো ক্ষতি হবে। একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি পুরো উল্টো হবে - ফ্ল্যাট রেটের অধীনে তারা বছরে ১,৩০০ ইউরোর বেশি লাভ করবে, যেখানে সর্বজনীন ব্যবস্থায় তাদের লাভ খুব বেশি হবে না।

ইতোমধ্যে যা বলা হয়েছে, একটি সুন্দর জীবনের জন্য স্বাস্থ্য একটি মৌলিক বিষয় আর এ খাতে সবার সমান প্রবেশাধিকার থাকা উচিত। উদ্দেশ্যের সাথে উপযুক্ত হওয়ার পাশাপাশি একটি স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার প্রাথমিকভাবে সমান সুযোগ (স্বাস্থ্য সেবায় অভিগম্যতা) ও প্রয়োজনভিত্তিক ন্যায্যতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী থাকা উচিত।

২.৫.৩ শ্রম বাজার নীতি [১২]

চিরস্থায়ী নিরাপত্তার অভাব? কাজ ও সামাজিক গণতান্ত্রিক চেতনার নতুন বিশ্ব

ম্যাথিয়াস নেইস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কয়েক দশক ধরে জার্মানিতে পুঁজি ও শ্রমের স্বার্থের মধ্যে একটি সফল বোঝাপড়া রক্ষা করা হয়েছে। ১৯৪৯ সাল থেকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটি অস্বাভাবিক লম্বা সময়ে রীতি ছিল মজুরিভিত্তিক শ্রম। কর্মসংস্থান মানুষকে 'সামাজিক সম্পদ'-এর একটি ইতিবাচক অধিকার দিয়েছিল, যেখানে নিশ্চিত ছিল অবসর ভাতা, অনৈতিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মানদণ্ড, কো-ডিটারমিনেশন এর অধিকার ও বাধ্যতামূলক মজুরি চুক্তি (ডোরে ২০০৫)।

এ ধরনের মজুরিভিত্তিক শ্রম, যা তথাকথিত 'আদর্শ কর্মসংস্থান সম্পর্ক' বা 'আদর্শ কর্মসংস্থান চুক্তি' নামে পরিচিত, বস্তুগত নিরাপত্তার সাথে সাথে এক ধরনের ন্যূনতম স্বীকৃতি বা সামাজিক মর্যাদা দিয়েছিল।

তবে সত্যি কথা বলতে গেলে এই শান্ত পরিস্থিতি অবশ্যই দ্বন্দ্বহীন ছিল না। কোনো বাধাবিঘ্ন ছাড়াই এই বোঝাপড়া নিয়মিতভাবেই বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে, আর সমাজের সম্পদের অসম বণ্টন শুধু অবধারিতভাবে বেড়েছে। তবে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ নিশ্চিত ছিল যে তাদের নিজেদের চেষ্টা দিয়েই ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে তাদের জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটাতে পারবে।

১৯৮০-এর দশক থেকে এই আদর্শ কর্মসংস্থানের চুক্তি ক্রমাগতভাবে তার জৌলুশ হারিয়েছে। যদিও কর্মীদের বড় অংশই এখনো কাজ করে 'আদর্শ কর্মসংস্থানের' ভিত্তিতেই, এই সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে, যেমন খণ্ডকালীন কাজ, অস্থায়ী বা এজেন্সির কাজ, নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক বা প্রায় খণ্ডকালীন কাজ ('ক্ষুদ্র কাজ')।[১৩] স্থায়ী ও পূর্ণকালীন কাজের মতই 'সামাজিক সম্পদ'ও চাপের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধ বয়সের অবসরকালীন ভাতার আংশিক ব্যক্তিমালিকানাকরণ, ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে সুরক্ষাকে দুর্বল করার প্রস্তাব এবং সমষ্টিগত চুক্তির বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নের হ্রাস বিশেষকরে পূর্ব জার্মানিতে এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা।

[১২] শ্রম বাজার নীতির জন্য আরও দেখুন রিডার ৩: কল্যাণ রাষ্ট্র ও সামাজিক গণতন্ত্র (২০১২), অধ্যায় ৭.২, কাজ।
[১৩] ১৯৯১ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে খণ্ডকালীন কর্মীদের সংখ্যা ৫০ লাখ থেকে বেড়ে ৯০ লাখের বেশি হয়ে যায়।

এ ধরনের পরিবর্তনের পেছনে কিছু কারণ উল্লেখ করা যায়, যেমন সেবা ও তথ্যপ্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব আগের সময়ের উৎপাদন মডেলের চেয়ে আরও নমনীয় ও ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দাবি করে। এখানে প্রতিযোগিতা শুধু ভিন্ন দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই নয়, বরং একই প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন দুটি ইউনিটের মধ্যেও। 'সামাজিক সম্পদ' দ্রুত হয়ে উঠছে এক ধরনের 'নমনীয়তাকরণের সহায়ক হিসেবে সঞ্চয়'। যেসব কোম্পানি কর্মসংস্থান সুরক্ষা অধিকার কমিয়ে আনতে পেরেছে তারা প্রতিযোগিতায় সুবিধা অর্জন করেছে, যদিও তা কেবলই স্বল্পস্থায়ী।

বেশিরভাগ মানুষ এ ধরনের পরিবর্তনে গভীরভাবে বিচলিত। ২০০৭ সালে ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং -এর একটি জরিপে তথ্যদাতাদের ৬৬ শতাংশ জানায় যে তারা সমাজের চলমান পরিবর্তন নিয়ে উদ্বিগ্ন (নগেবাউর ২০০৭)। এই যে ঘটনাপ্রবাহ যা একটি বড় অংশের জনসংখ্যার অনিশ্চিত অনুভূতির কারণ তার মধ্যে রয়েছে অর্থনীতি ও কর্ম-পরিবেশের পরিবর্তন, যাকে ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী পিয়ের বোর্দিউ বলেছেন 'অনিশ্চয়তা' (precarity)। এটি শুধু নির্দিষ্টকালীন চুক্তি বা পতনশীল মজুরি নয়, কিন্তু একইসাথে একজন ব্যক্তি কিভাবে অনিশ্চয়তার অভিজ্ঞতা লাভ করে ও তাকে মোকাবেলা করে, তা-ও।

এটিকে বিবেচনায় নিলে বোঝা যায় যে যারা অনিশ্চিত কর্মে জড়িত অনিশ্চয়তা শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এটি অর্থনীতির গভীরে কাজ করছে। অনেক স্থায়ী কর্মী তাদের কর্মক্ষেত্রে অস্থায়ী বা 'এজেন্সি'র কর্মীদের উপস্থিতির অভিজ্ঞতা লাভ করে যা উদ্বেগজনক। এ ধরনের বিকল্প দেখে তারা মজুরির ক্ষেত্রে ছাড় দিতেও প্রস্তুত থাকে, অন্য পরিস্থিতিতে যা তারা কখনোই করত না।

অনিশ্চিত কর্মীরা আদর্শ কর্মসংস্থানের মধ্যে যারা আছে আর যারা পুরোপুরি কর্মসংস্থানের বাইরে রয়েছে তাদের মধ্যকার কোনো এক জায়গায় নিজেদের দেখে, যা ঝুলন্ত একটি অবস্থান। তাদের ভীতি হচ্ছে যে তারা সামাজিক সিঁড়ি থেকে পিছলে নিচে পড়ে যাবে; তাদের স্বপ্ন আদর্শ একটি কর্মসংস্থানের চুক্তিতে প্রবেশ করা। তবে প্রায়ই এ ধরনের বাস্তবতা স্থায়ী অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়।

সামাজিক গণতন্ত্রের ধারণার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের ফলাফল কী? পূর্বের সামাজিক গণতন্ত্রের জন্য 'স্বাভাবিক কর্মসংস্থান'-এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কল্যাণ রাষ্ট্রের মধ্যে গভীরভাবে স্থাপিত হয়ে এটি তিনটি মূল চেতনার বিকাশের পেছনের মূল কারণ ছিল দীর্ঘদিন। এটি অনেকের জন্যই নিরাপত্তা তৈরি করে (যদিও সবার জন্য নয়), আর এভাবে ইতিবাচক স্বাধীনতার প্রত্যাশিত ফল দেওয়ার জন্য একটি প্রয়োজনীয় শর্ত গঠন করে। পুনর্বণ্টনের ক্ষেত্রে (ন্যায্যতার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে) যা কিছুই অর্জিত হয়েছিল, তার একটি পর্যায় পর্যন্ত সম্ভব হয়েছিল কর্মসংস্থান ব্যবস্থার কারণে।

শেষ পর্যন্ত 'সামাজিক সম্পদ' একতার ভিত্তিতে জীবনের সংকটের প্রভাবকে সহনীয় করার জন্য পরিচালিত হয়েছিল। সাধারণ কর্মসংস্থানের দ্বারা তৈরি সামাজিক নিরাপত্তা গণতন্ত্রের তিনটি প্রধান চেতনাকে সমাজের বড় অংশের কাছে পরিচিতি ত্বরান্বিত করেছিল। বিশেষকরে এসপিডি তার দলীয় কর্মসূচিতে পূর্ণকালীন কর্মসংস্থান ও সর্বোপরি মানসম্মত কর্মসংস্থানের সম্পর্কের বিষয়ে শক্তিশালী উদাহরণ দিয়েছে। এই দলের চেতনার মূল বিষয় ছিল সামাজিক গণতন্ত্রের রাজনৈতিক মানের ধারক হিসেবে সকল কর্মজীবীর জন্য 'স্বাভাবিক কর্মসংস্থান' সম্প্রসারণের লক্ষ্য।

তবে এই স্বাভাবিক কর্মসংস্থানের সম্পর্কের সাথে শক্তিশালী একাত্মতা হ্রাস পেয়েছে। গত দশকের শ্রম বাজার ও সামাজিক নীতির সংস্কারের আরও একটি উদ্যোগ ছিল কাজের ক্ষেত্রে চরম পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ার একইসাথে একইরকম চরমপন্থী পরিবর্তন। এ ধরনের সংস্কারের উদাহরণ হচ্ছে অস্থায়ী কাজের স্বাভাবিকীকরণ আর বেকার বীমার সংস্কার, যার জন্য কিছুটা দায়ী ছিল এসপিডি। এখনো জনগণের মধ্যে সামাজিক গণতন্ত্রের চেতনাগুলোর শক্তিশালী প্রভাব বিদ্যমান। তবে আগের মত এসব চেতনা কোনো একটি দলের প্রতিনিধির সাথে যুক্ত নয়। এর মূল কারণ হচ্ছে নমনীয়করণের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যর্থতা। সামাজিক গণতন্ত্রের নতুন মডেলের সাথে মূল নীতিগুলোর সম্পর্ক নির্ধারণে এটি কী অর্থ বহন করে?

স্বাধীনতা

এই নতুন কাজের বিশ্ব নিশ্চিতভাবেই স্বাধীনতার নতুন বার্তা নিয়ে আসে। 'ফ্রিল্যান্সার' বা স্ব-উদ্যোগী হিসেবে একটি ছোট আকারের কিন্তু অগ্রাহ্য করার মত নয় এমন কর্মীদের দল তাদের নিজস্ব কাজ গোছানোর স্বাধীনতা ভোগ করে। এসব কাজ প্রকল্পের আকারে থাকে - কোনো 'বসের' নির্দেশনার অধীনে নয়। এই দলটি এর নমনীয়তার জন্য উল্লেখযোগ্য ধরনের পুরস্কারও দাবি করতে পারে। যথেষ্ট সম্পদ সাথে নিয়ে এই দলের কর্মীরা স্বল্পস্থায়ী কর্মসংস্থানকে ভবিষ্যতের প্রশিক্ষণে রূপান্তর করতে পারে। বেশিরভাগ অনিশ্চিত কর্মীদের কাছেই এ ধরনের পরিস্থিতি কোনো আর্থিক প্রণোদনা ছাড়া বড় সংকটের পরিচায়ক। এটি ব্যাপকভাবে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের স্বাধীনতাকেই খর্ব করে।

এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে সামাজিক গণতন্ত্র এমন একটি স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয় যা ইতিবাচক, বাস্তবসম্মত ও সামাজিক। এর মধ্যে রয়েছে যৌথ (সামাজিক) নিরাপত্তার নতুন হাতিয়ার। যেকোনো স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যা নমনীয়তাকরণকে ধরে রাখতে পারে তা বেশিরভাগ কর্মী দ্বারা বাস্তবায়িত হতে পারে যদি তাদের নিজেদের মত করে অনিবার্য ঝুঁকি ও সংকট মোকাবেলা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া না হয়।

ন্যায্যতা

কোনটি নিরপেক্ষ, কে আইনগত দাবি করার মত ক্ষমতাপ্রাপ্ত, আর কিসের জন্য, তা এখনো কর্মসংস্থানের অবস্থার দ্বারা যৌথভাবে নির্ধারিত হয়। ঐতিহাসিকভাবে একজন ব্যক্তির কোনো সক্রিয় অবদান রাখার ইচ্ছা, যা তার কাজের দ্বারা প্রতিফলিত হত, তাকে সমাজে অংশগ্রহণের অধিকার দিত। এরপরও বিভিন্ন সামাজিক দলের মধ্যে এ ধরনের ন্যায্যতার ধারণা তীক্ষ্ণভাবে আকার দেওয়া হয়েছে (যেমন দুটি লিঙ্গের মধ্যে) আর দায়িত্বের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রায়ণের প্রবণতা অন্তর্ভুক্ত করেছে।

এই রীতি খুবই স্থিতিশীল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু নতুন শ্রম অর্থনীতিতে তারা অসমতার চালক হিসেবে পরিণত হয়েছে এমন কাঠামোর মধ্যে যেখানে কাজ বা অর্জনের (মেধা/ যোগ্যতা) ধারণা বিদ্যমান। কিন্তু কর্মসংস্থানে অভিগম্যতার সম্ভাবনা আরও জটিল হয়ে যাচ্ছে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র থেকে মাঝে মাঝেই বা এমনকি ক্রমাগতভাবে পড়ে যাওয়া অনিশ্চয়তার 'ক্ষেত্রে' খুবই স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী অনেকেরই নিয়মিত কাজে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশের অধিকার রয়েছে। কারও কারও মতে এক্ষেত্রে ব্যর্থতার অর্থ হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে আরও বেশি চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রায়ণ সমাজের ক্রমবর্ধমান অসমতার বিষয়ে মানুষের ধারণা অস্বচ্ছ করে দেয়। এভাবে ন্যায্যতার ধারণা সমতার প্রায় বিপরীত হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

সামাজিক গণতন্ত্রের একটি চ্যালেঞ্জ যা অবশ্যই মোকবেলা করতে হবে তা হচ্ছে ন্যায্যতা ও সমতার মধ্যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপন করা। রাজনৈতিক পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকে এমন পর্যায় পর্যন্ত বাড়ানো যেন প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছা প্রতিষ্ঠার প্রকৃত সুযোগ থাকে। শুধু এর ভিত্তিতেই আরও বেশি নিজস্ব দায়িত্ব দাবি করার কথা অর্থবহ হতে পারে।

একতা

যৌথ বীমা ব্যবস্থার পুনর্গঠনকে একটি সাধারণ সংকটের একটি উপাদান হিসেবে দেখা যায় যা একতাভিত্তিক আচরণকে প্রভাবিত করে। যৌথ বীমা ব্যবস্থা ছিল পুরানো কর্মসংস্থান ব্যবস্থার একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশ। বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব হচ্ছে স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছলদের মধ্যে যা এই দুটি ব্যবস্থার মধ্যকার শর্ত কিছু পরিমাণে হলেও ঠিক করে দেয়, যা আবার 'ভেতরের' ও 'বাইরের' বিভক্তির সাথে তুলনীয়। এই দুটি পার্থক্য পারস্পরিকভাবে আলাদা নয়, কিন্তু এটি একেবারে ভিন্ন একটি সামাজিক প্রেক্ষাপটের দিকে নিয়ে যায়।

অন্যরা যে প্রতিনিয়ত জায়গা দখলের জন্য অপেক্ষমান, কর্মক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার সাথে সম্পর্কিত এই অনুভূতি একতাভিত্তিক আচরণের পক্ষে সবচেয়ে খারাপ প্রণোদনা হতে পারে। 'যারা ভেতরে আছে' তারা 'যারা বাইরে আছে' তাদের উত্তরোত্তর হুমকি বলে মনে করতে পারে। উল্টোদিকে, যৌথ সামাজিক নিরাপত্তার যেসব উপাদান অক্ষত রয়েছে সেগুলো যারা অনিশ্চিত কর্মসংস্থানের মধ্যে রয়েছে বা কাজের বাইরে রয়েছে তাদের বাধা হিসেবে মনে করতে পারে যা তাদের বাইরেই রেখে দেয়। বর্তমান সংকট এটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে এই ধারণা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। ২০০৮ সালের শীতে শিল্প-কারখানার একটি বড় অংশের ধসে অস্থায়ী কর্মীরা প্রায় সাথে সাথে চাকরি হারায়। কর্মী বা ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ ছিল প্রায় বিচ্ছিন্ন ধরনের। তবে এই সংকটেও স্থায়ী কর্মী বাহিনী এবং একইসাথে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যদের বড় অংশের কর্মসংস্থান নিশ্চিত ছিল।

সাম্প্রতিক ঘটনার আলোকে প্রশ্ন ওঠে বর্তমানের কাজের ক্ষেত্রে একতা কিভাবে প্রযোজ্য? এছাড়াও নতুন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একতার দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় সামাজিক নিরাপত্তার কার্যকর হাতিয়ার ভবিষ্যতের সামাজিক গণতন্ত্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হতে পারে। একে অবশ্যই 'সামাজিক সম্পদের' বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে মানুষ যে ধরনের পেশা প্রত্যাশা করতে পারে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রযোজ্য হাতিয়ার তৈরি করতে হবে যেন 'ভেতরের' ও 'বাইরের' পার্থক্য কমে আসে।

নতুন শ্রম অর্থনীতিতে একদিকে সামাজিক গণতন্ত্রের চেতনা এবং শ্রমের মধ্যকার সম্পর্ক আছে বলে ধরে নেওয়া যায় না, যা আগে করা যেত। অন্যদিকে এই সম্পর্ক খুব বেশি ঘনিষ্ঠ থেকে যায়, যা স্বাধীনতা, ন্যায্যতা ও একতা এই তিনটি ধারণার বিষয়বস্তুর ওপর নতুন আলোচনার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করে।

স্বাধীনতা, ন্যায্যতা ও একতা নতুন শ্রম অর্থনীতির সাথে যেভাবে সম্পর্কিত তার পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সামাজিক গণতান্ত্রিক ধারণার রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের দ্বারা করতে হবে। এ ধরনের কোনো লক্ষণ নেই যে কর্মসংস্থান অংশগ্রহণ ও স্বীকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহক হিসেবে তার মর্যাদা শেষ পর্যন্ত হারাবে। সমাজে কাজের ধরন সামাজিক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের ওপর সিদ্ধান্তমূলক প্রভাব ফেলা অব্যাহত রাখবে। এই দশকের সংকটের অভিজ্ঞতা দেখায় যে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে সামাজিক গণতন্ত্রে অর্থনীতি ও কাজ গণতান্ত্রিক নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই পরিকল্পনা করতে হবে।

২.৫.৪ উচ্চতর শিক্ষা নীতি

"রাষ্ট্রের আগে ব্যক্তি" অথবা নাগরিকের কল্যাণ? শিক্ষার্থী অর্থায়নের দুটি পরস্পরবিরোধী মডেল

মার্টিন টিমপে ও ফ্রেডেরিক বোল

সামাজিক পরিচয় শিক্ষার সুযোগ নির্ধারণ করে

ওইসিডি'র অন্তর্ভুক্ত অন্য কোনো শিল্পোন্নত দেশে একজন ব্যক্তির শিক্ষাজীবন তার সামাজিক পরিচয় দ্বারা এত শক্তভাবে নির্ধারিত হয় না, যেমনটা হয় জার্মানিতে। যেসব পরিবারের মা-বাবার যেকোনো একজনের স্নাতক ডিগ্রি আছে তাদের ৮৩ শতাংশের ছেলেমেয়ে উচ্চতর শিক্ষা নেয়। স্নাতক নয় এমন পরিবারের মাত্র ২৩ শতাংশ সন্তান উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় (দেখুন ইসারস্টেড ২০০৭: ১১)।

এছাড়াও ওইসিডি'র গড়ের তুলনায় জার্মানিতে শিক্ষার্থীর হার অনেক কম। ২০০৯ শিক্ষাবর্ষে এটি ছিল বয়স অনুযায়ী প্রায় ৪৩ শতাংশ। এর প্রাথমিক কারণ হচ্ছে এই দলের আকার ছিল আবিটুর নেওয়ার স্বাভাবিক আকারের প্রায় দ্বিগুণ। ওইসিডি'র গড়ের কাছাকাছি পৌঁছাতে হলে বিশেষকরে অ-স্নাতক পরিবারগুলো থেকে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ ছেলেমেয়েকে উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করতে হবে, যেহেতু এ ধরনের পরিবারে সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে যা এখনো খোঁজা হয় নি। কেবল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, বরং সামাজিক ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ থেকেও এ ধরনের পরিবার থেকে উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়টি অর্থবহ।

শিক্ষার্থীর অর্থায়নের সমস্যা

সুযোগের সমতা তৈরি করা ও শিক্ষার্থীর হার বাড়ানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় শিক্ষার্থীর অর্থায়নে নিহিত। অ-স্নাতক পরিবার থেকে আগত বেশিরভাগ শিক্ষার্থী যারা যোগ্য হলেও উচ্চশিক্ষাকে বেছে নেয় নি, তারা এর কারণ হিসেবে জানায় যে তারা এর পরিবর্তে কারিগরি প্রশিক্ষণকে বেছে নিয়েছে। এর কারণ হিসেবে তারা প্রশিক্ষণ ভাতার কথা বলে, যদিও এর আর্থিক পরিমাণ কম। কারিগরি প্রশিক্ষণের বিকল্প হতে পারত উচ্চশিক্ষা, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের বাবা-মার ওপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল হতে হত (দেখুন হাইনে/কোয়াস্ট ২০০৯: ১৬)।

বিএএফওজি

তবে অনেকে বলতে পারে যে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে সহজতর করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তার আইন (ফেডারেল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাক্ট - বিএএফওজি) রয়েছে। তবে খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থী (প্রায় ১৮ শতাংশ) জার্মানির বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার জন্য বিএএফওজি সহায়তা

পায় (দেখুন ১৭, বিএএফওজি-বেরিখট ২০০৭: ৮)।[১৪] উপরন্তু বিএএফওজি সহায়তা পদ্ধতিগতভাবে প্রকৃত জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় কম হয়ে যায়, যেহেতু আইনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটি মেলানোর বিধান নেই। এছাড়া এই সহায়তার মধ্যে ঋণ হচ্ছে ৫০ শতাংশ, যা অনেক সম্ভাব্য শিক্ষার্থীকে অনাগ্রহী করে। অ-স্নাতক পরিবারে ঋণগ্রস্ত হওয়ার ইচ্ছা স্নাতক পরিবারের চেয়ে অনেক কম। এটিও জীবনযাত্রার ব্যয় ও টিউশন ফি'র ব্যয় বহন করার জন্য ঋণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যায়। পরিশেষে বিএএফওজি'র জন্য সর্বোচ্চ আয়ের সীমা এত কম নির্ধারিত করা হয়েছে যে অনেক পরিবার যারা তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয় বহন করতে পারে নি তারা কোনোভাবে বিএএফওজি সহায়তা পায় না। একে "মধ্য আয়ের ফাঁদ" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

টিউশন ফি

বর্তমানে ছয়টি ফেডারেল রাজ্যে ৫০০ ইউরো পর্যন্ত টিউশন ফি নেওয়া হয়। যখন সাংবিধানিক আদালত ২০০৫ সালে সিদ্ধান্ত দেয় যে তারা উচ্চশিক্ষার জন্য টিউশন ফি নেবে কিনা তা ফেডারেল রাজ্যের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে, তখন সিডিইউ নিয়ন্ত্রিত সাতটি রাজ্য সরকার সাধারণ টিউশন ফি'র প্রচলন করে। তবে হেসেন-এ রেড-গ্রিন-রেড (এসপিডি-অ্যালায়েন্স ৯০/ গ্রিনস-ডাই লিংকে) সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যসভায় এই ফি বাতিল করে দেয়। ব্ল্যাক-ইয়েলো-গ্রিন (সিডিইউ-এফডিপি-গ্রিন) রাজ্য সরকার সারল্যান্ডেও টিউশন ফি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে বাডেন-উটেমবার্গ, বাভারিয়া, হামবুর্গ, লোয়ার স্যাক্সনি ও নর্থ রাইন ওয়েস্টফালিয়ায় টিউশন ফি এখনো আরোপিত রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে জার্মানির প্রায় অর্ধেকের বেশি (২০ লাখ) শিক্ষার্থী এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত।

শিক্ষার্থীর অর্থায়ন এবং সামাজিক গণতন্ত্রের মূলনীতি/ চেতনা

স্বাধীনতা

সোশাল ডেমোক্র্যাটদের মতে স্বাধীনতারও বস্তুগত ভিত্তি রয়েছে। শিক্ষায় যাদের অভিগম্যতা আছে শুধু তারাই তাদের স্বাধীনতা কাজে লাগাতে পারে। যারা শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে সমর্থ নয় তাদের জন্য উচ্চশিক্ষার অধিকার খুব সামান্যই অর্থ বহন করে। কেউ যদি তার বাবা-মা'র ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল হয় তাহলে তার শিক্ষার জন্য মুক্তভাবে কোর্স বাছাই করার অধিকার খর্ব হয়, আর সে তার আগ্রহের বিষয় বেছে নেবে কিনা তা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে তাকে ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা ঠিক করতে বাধ্য করে।

একটি শক্তিশালী বিএএফওজি যা একজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদার ওপরেই শুধু নির্ভর করে তা সত্যিকার অর্থে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার বাস্তবায়নের ভাল উপায়। ছাত্র-ঋণের বিভিন্ন বিকল্প প্রস্তাব শুধু আপাত প্রতীয়মান স্বাধীনতার প্রস্তাব দেয়। আসলে তারা ঋণ ও ঋণদাতাদের প্রতি চুক্তিবদ্ধ বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে নতুন নির্ভরশীলতা তৈরি করে।

[১৪] এটি সব শিক্ষার্থীর মধ্যে সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর হার

ন্যায্যতা

টিউশন ফি ও ন্যায্যতা নিয়ে বিতর্কে একই যুক্তি বারবার শোনা যায়, যা যতবারই বলা হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে ঠিক নয়। যেমন, একদিকে নার্সদের কর সিনিয়র কনসালটেন্টদের সন্তানদের পড়াশোনার ব্যয় হিসেবে পরিশোধ করা হয়, আর অন্যদিকে সিনিয়র কনসালটেন্টরা শিক্ষার অর্থায়নে কোনো অবদান রাখে না, যদিও তারা সহজেই টিউশন ফি বহন করতে পারে। এই পরিস্থিতি গভীরভাবে অন্যায্য, এবং তাই স্বচ্ছল পরিবারগুলোর উচিত টিউশন ফি'র মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার অর্থায়নে সরাসরি অবদান রাখা।

ওপরের বর্ণিত পরিস্থিতি সত্যি সত্যি অন্যায্য হবে। বাস্তবে একটি অন্যায় আরেকটিকে ন্যায্য প্রমাণ করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সমান সুযোগের অনুপস্থিতি ও সামাজিক (কর) বোঝার অসম বণ্টন বিদ্যমান।

সিনিয়র কনসালটেন্টদের সন্তানরা টিউশন ফিসহ বা টিউশন ফি ছাড়াই তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। তবে টিউশন ফি'র ওপর কর (টোল) শুধুই উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে সামাজিক অসমতা বাড়াবে। নার্সদের সন্তানরা তাদের পড়াশোনা এখনকার মত না-ও চালিয়ে যেতে পারে। যারা অভিযোগ করে যে সিনিয়র কনসালটেন্টরা শিক্ষা ব্যবস্থার অর্থায়নে খুব সামান্য অবদান রাখে বা নার্সরা অনেক বেশি অবদান রাখে, তাদের আসলে কর ব্যবস্থার ওপর মনোযোগ দেওয়া উচিত। ধারাবাহিক থাকার জন্য তাদের প্রচারণা চালানো উচিত যে উচ্চ আয়ের জন্য উচ্চ করহার থাকতে হবে আর কম ও মধ্য আয়ের জন্য তুলনামূলক কম করভার থাকা উচিত।

সোশাল ডেমোক্র্যাটরা বিশ্বাস করে ন্যায্যতা হচ্ছে সমান স্বাধীনতা। টিউশন ফি'র টোল করা হলে শিক্ষায় সমান স্বাধীনতা খুব সামান্য হলেও বাধাগ্রস্ত হবে। একই সময়ে যেভাবে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে তা খুবই অমীমাংসিত। বরং পরিশোধ করার সামর্থ্যের ভিত্তিতে কর ব্যবস্থার মাধ্যমে জনকল্যাণে অর্থায়নে নিরপেক্ষ বণ্টনের ব্যবস্থা করা উচিত।

একতা

পরিশেষে সামাজিক ক্ষেত্রে টিউশন ফি'র প্রভাব আরেকবার বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমাদের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো গণতান্ত্রিক ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য কি এটি যুক্তিযুক্ত নয় যে তারা গণতান্ত্রিকভাবে ও একতার সাথে সহযোগিতা করা শিখবে? পরিবর্তে টিউশন ফি ও অন্যান্য বিষয় উচ্চশিক্ষা নীতির ক্ষেত্রে বাজারের প্রাধান্য, ক্রেতা ও প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কের দিকে মনোযোগ নিয়ে যায়।

টিউশন ফি'র আরেকটি অর্থ হচ্ছে স্নাতক ও অ-স্নাতকদের আয় আরও বেশি আলাদা হবে। ধনী ও গরিবের ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পাওয়া সমাজের জন্য ভাল কিনা তা পাঠকের নিজের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হল।

৩. সমাজের বিভিন্ন মডেলের মধ্যে তুলনা

এই অধ্যায়ে:

- বাজার পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে;
- উদারনৈতিক, রক্ষণশীল ও সোশাল ডেমোক্র্যাটিক মডেল বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে ও তুলনা করা হয়েছে;
- শ্রম আন্দোলনের বিভিন্ন ধারণার বিবর্তন ও ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ধারণা আলোচনা করা হয়েছে;
- মানবতার সামাজিক গণতান্ত্রিক ধারণা অন্যান্য মতবাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

প্রচ্ছদে কী আছে?

ডার স্পাইজেল-এর ২০০৭ এর ২২ অক্টোবর সংখ্যায় একটি উস্কানিমূলক প্রচ্ছদ ছাপানো হয়।

ডার স্পাইজেল, ইস্যু ৪৩, সূত্র: www.spigel-online.de (22.10.2007)

এসপিডি'র প্রধান কয়েকজনের মুখ ক্যারিকেচার করে দেখানো হয়েছে যে তারা একটি জাহাজডুবির পর লাইফবোটে লাফ দিয়েছে। ক্যাপ্টেন গেরহার্ড শ্রোয়েডার ডুবন্ত জাহাজেই রয়েছে, যেখানে গ্রেগর জিসি আর অস্কার লাফনটেইন তাদের নিজেদের লাইফবোট অধিকারে নিয়েছে। 'যদি আমরা পাশাপাশি সাঁতার কাটি'[১৫] শীর্ষক শিরোনামে 'সাঁতার' শব্দটির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যেখানে এর অর্থ হচ্ছে 'না জানা'। এটি 'আমরা সবাই সমুদ্রে' অর্থে সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা করা যায়, যেখানে গন্তব্য কোথায় তা জানা নেই। আরও খারাপ অর্থে এই কার্টুনে যা বলা হচ্ছে একটি নাটকীয় জাহাজডুবি যেখানে মানুষের দিক-নির্দেশনা অন্য সবকিছুর সাথে ভেসে যাচ্ছে।

প্রচ্ছদ যা দেখায় না- ব্যাখ্যার ওপর মন্তব্য

ডার স্পাইজেল-এর প্রচ্ছদ দেখে আপনার কী মনে হয়? রাজনৈতিক দলের (এক্ষেত্রে এসপিডি) ওপর জনগণের ধারণা নিয়ে এটি কী বলে? এই কার্টুন জনগণের ভীতি আর রাজনৈতিক ধরণার কথা বলে যে বর্তমানের রাজনীতিতে দিক-নির্দেশনার মৌলিক ঘাটতি রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এটি অবশ্যম্ভাবী যে সবকিছু ভেঙ্গে পড়বে। পুরো দৃশ্যের মতই সাধারণ একটি অভিযোগ রয়েছে কারণ প্রত্যেকেরই তার নিজের 'সামাজিক রাজনৈতিক কম্পাস' রয়েছে। গণতান্ত্রিক দলে, কোন দলে তা বিষয় নয়, এটি শুধু অননুমোদিতই নয়, বরং অবশ্যই প্রয়োজনীয় যে জনগণ তাদের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক করে আর তারপর গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নেয়।

[১৫] এটি শ্রমিকদের একটি গানের কথাও বলে যার শিরোনাম হচ্ছে 'ওয়ান উইর শ্রেইটেন সেইট অন সেইট' ('Wann wir schreiten seit' an seit')|

অন্যদিক থেকে দেখলে এসপিডি যে ডুবে যাচ্ছে বলে দেখানো হয়েছে তার কোনো অর্থ নেই। রাতারাতি রাজনৈতিক পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয়, বরং নেতৃত্বের পরিবর্তন বা নির্বাচনে পরাজয়ের পর প্রয়োজন, কিন্তু তা জাহাজডুবি হতে পারে না।

অবস্থানের ক্ষেত্রে বিতর্ক প্রয়োজনীয়

'চেইন অব কমান্ড'-ও দলের গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতির সাথে সাংঘর্ষিক। গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতির মূল চেতনা হচ্ছে দলের দিক-নির্দেশনা নিয়ে বিতর্ক করা, যখন প্রয়োজন হয় এবং তা একজনের নিজস্ব 'সামাজিক রাজনৈতিক কম্পাসের' সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা। অন্যদিকে ডার স্পাইজেল-এর প্রচ্ছদ রাজনীতির একটি একনায়কতান্ত্রিক চিত্র তুলে ধরে যা গণতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটি একেবারেই 'সামাজিক রাজনৈতিক কম্পাসের' বিষয় নয় যা এই কার্টুনে উঠে আসে নি, যা ছাড়া কোনো রাজনৈতিক পথ নির্দেশনা প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

'চালনা' (navigate) অর্থ কী তা এখানে বিবেচনা করা যায়।

সামাজিক-রাজনৈতিক কম্পাস

একটি 'সামাজিক-রাজনৈতিক কম্পাস' ধরে নেয় যে একজনের সম্ভাব্য রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনার কিছু ধারণা রয়েছে যার ভিত্তিতে তার নিজস্ব অবস্থান বর্ণনা করতে পারে আর 'তার আপেক্ষিক অবস্থান' দেখতে পারে।

আপেক্ষিক অবস্থান কী আর চালনার জন্য কী প্রয়োজন?

প্রতিদিনকার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মহাসমুদ্রে রূপক অর্থে চালনার কথা বলা হয়েছে। এমনকি যদিও মৌলিক বিষয় জড়িত না থাকে, একজনের ভেতরকার দৃঢ়বিশ্বাস এক্ষেত্রে কাজ করে।

এর সুবিধা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব কম্পাস রয়েছে, যদিও এটি ব্যাখ্যা করা সহজ বিষয় নয়। এ কারণে এটি খুব সহজে বলা যাবে না যে সবাইকে কম্পাস ধরিয়ে দেওয়া হবে আর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মুক্ত করে দেওয়া হবে। প্রত্যেকে কিভাবে তার কম্পাস ব্যবহার করে নিজেদের চালনা করবে তা তাদের ওপরই নির্ভর করবে। গণতান্ত্রিক দল ও প্রতিষ্ঠানে এটি প্রকৃতপক্ষে দর-কষাকষির বিষয়।

চালনার জন্য কী প্রয়োজন?

চালনার জন্য দুটি আবশ্যকীয় বিষয় রয়েছে। প্রথমত, একজন ব্যক্তিকে তার নিজস্ব ধারণা সম্পর্কে জানতে হবে। অন্য ভাষায়, তাকে বিশ্লেষণ করতে হবে সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে আর বর্তমানে সমাজ তাকে কোন পরিস্থিতিতে দেখছে। দ্বিতীয়ত, ঐ ব্যক্তি কোন 'রাজনৈতিক পথের' অনুসারী তা ঠিক করতে হবে।

এই শুরুর অবস্থা ও লক্ষ্য (বাস্তবতা ও ইচ্ছা) উভয়কেই সামাজিক-রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে প্রকাশ করা যায়। উদারনৈতিক, রক্ষণশীল, সমাজতান্ত্রিক ও সোশাল ডেমোক্র্যাটদের যুক্তি শুরুর অবস্থা ও লক্ষ্য এমনভাবে ব্যাখ্যা করে যে তাদের পছন্দনীয় নির্দেশিত পথে নিজেকে চালনা করা সম্ভব।

কেউ যদি সামাজিক গণতন্ত্রকে সমাজের একটি মডেল হিসেবে আলোচনা করতে চায় বা সম্ভাব্য অবস্থান হিসেবে বেছে নিতে চায় যে নির্দেশনায় সমাজ চলতে পারে, তাকে অবশ্যই সমাজের অন্যান্য মডেলের প্রেক্ষিতে সামাজিক গণতন্ত্রকে যাচাই করতে হবে।

৩.১ বাজার পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র

দুটি মতবাদ: বাজার পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র

বিভিন্ন মডেল পর্যালোচনা করার আগে আমাদের দুটি ধারণার বিষয়ে জানতে হবে যে দুটি ধারণা বর্তমানের সমাজকে আবার অনেকক্ষেত্রে নির্ধারণ করে। ধারণা দুটি হচ্ছে বাজার পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র।

বাজার পুঁজিবাদ একটি ব্যবস্থা যেখানে:

- বাজারে বিভিন্ন পণ্য মুক্তভাবে হাতবদল হয়;
- একটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পদের অধিকারের ওপর ভিত্তি করে পণ্য উৎপাদিত হয়;
- একদিকে রয়েছে শ্রম আর অন্যদিকে পুঁজি;
- কোনো নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান নেই, তবে সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে এমন কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা বাজারকে একটি কাঠামো দেয়।

গণতন্ত্র এমন একটি ঐতিহাসিক অর্জন হিসেবে বিবেচিত যা:

- রাষ্ট্রে সমাজের সবার জন্য সমান স্বাধীনতা বাস্তবায়নে ইচ্ছুক;
- গণতান্ত্রিক উপায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন নিয়ে আসে;
- সবাইকে অংশগ্রহণের সমান সুযোগ দেওয়ার জন্য একটি সুসংগঠিত সমাজ (রাষ্ট্র) চায়।

গণতন্ত্র ও বাজার পুঁজিবাদের মধ্যে বিরোধ

ওপরের সংক্ষিপ্ততম সংজ্ঞা থেকেও দেখা যায় যে কোনো সমাজ বাজার পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র উভয়ের ওপর ভিত্তি করে গঠিত হতে গেলেও অবধারিতভাবে কিছু বিরোধ দেখা দেবে, যেহেতু খাঁটি বাজার পুঁজিবাদের প্রভাব ও সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক সমাজের প্রভাবের মধ্যে কোনো না কোনো বিরোধ থাকেই।

বাজার পুঁজিবাদ গণতন্ত্রকে বাধা দেবে যদি:

- উৎপাদনের মাধ্যমের ওপর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অধিকার (কারও কারও দ্বারা) সম্পদের অসম বণ্টনের দিকে নিয়ে যায় যা সমাজে 'সমান স্বাধীনতা' ও অংশগ্রহণের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়;
- সমাজে ক্ষমতার ভারসাম্য নিরূপণ করা হয় কর্মদাতাদের পক্ষে কিন্তু কর্মীদের বিপক্ষে, যা নিজস্ব ইচ্ছার ভিত্তিতে জীবন ধারণের ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ দেয় না;
- কারও কারও লাভ করার উদ্দেশ্যের কারণে বাজার পুঁজিবাদ সবার জন্য কল্যাণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যা শুধু গণতান্ত্রিক নীতি দ্বারা নিশ্চিত হতে পারে;
- রাষ্ট্রের একমাত্র কাজ হচ্ছে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

গণতন্ত্র খাঁটি বাজার পুঁজিবাদকে বাধা দেয় যদি:

- গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে উদ্যোগের স্বাধীনতা খর্ব করা হয় বা সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়;
- গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যক্তি উন্নয়ন ও স্বাধীনতা ব্যাহত করে, যেমন জনসাধারণের পক্ষে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পদ দখল করা। অন্য ভাষায়, ব্যক্তির ব্যক্তিগত ক্ষেত্র খর্ব হওয়া।

গণতন্ত্র ও বাজার পুঁজিবাদকে নিচের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায়:

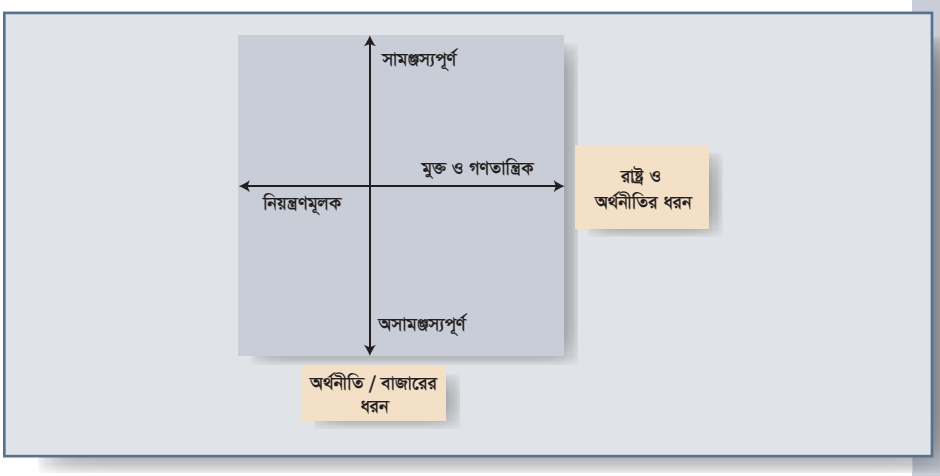

চিত্র ৪: সমাজের বিভিন্ন মডেলের শ্রেণিবিভাগের জন্য অবস্থানের ব্যবস্থা

অর্থনীতি বা বাজারের ধরনের জন্য 'সমন্বিত/ অসমন্বিত' রেখা নেওয়া যায়: একটি অসমন্বিত বাজারকে তার নিজস্ব কাঠামোর ওপর ছেড়ে দেওয়া, অন্যদিকে একটি নিয়ন্ত্রিত বাজার বা অর্থনীতি।

অন্য এক্সিসে দ্বন্দ্ব হচ্ছে একদিকে নিয়ন্ত্রণমূলক রাষ্ট্র (অথরিটারিয়ান) ও অন্যদিকে নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার ওপর নির্ভরশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে। বাজার পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র দুটি মৌলিক ধারণা যা বর্তমানে সমাজের অবস্থান বর্ণনা করতে পারে। রাজনৈতিক তত্ত্ব তাদের লক্ষ্য নির্ধারণের সময় তারা এই অবস্থান থেকে তাদের অবস্থান ঠিক করে এবং এর সূত্রে তারা কোন দিকে যেতে চায় তা ঠিক করে।

কিভাবে সমাজের বিভিন্ন মডেলের শ্রেণি বিভাজন করা যায়?

এখন যে প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হবে তা হল কিভাবে সমাজের বিভিন্ন মডেল বা ধারণা এই অবস্থানের প্রেক্ষিতে শ্রেণি বিভাজন করা যায়:

- উদারনৈতিক অবস্থান
- রক্ষণশীল অবস্থান
- সমাজতান্ত্রিক অবস্থান
- সামাজিক গণতান্ত্রিক অবস্থান

আলোচনা ও ফলো-আপ অনুশীলনের জন্য:

ওপরের তালিকা থেকে সমাজের বিভিন্ন মডেল বিন্যাস করুন। আপনার বিন্যাসের পেছনে যুক্তি দিন, তবে এর বিপরীত যুক্তিগুলোও দিন। পরবর্তী অংশ পড়ার আগে এই অবস্থানের ব্যবস্থায় আপনার নিজস্ব 'অবস্থান' নির্ধারণ করুন।

হয়ত আপনার নিজস্ব শ্রেণি বিভাজন নিয়ে সামনে যাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার মনে দ্বিধা কাজ করেছে। অথবা আপনার কোনো দ্বিধা ছিলই না?

আপনার কোনো দ্বিধা থাকলেও তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই, যেহেতু অনিয়শ্চয়তার যেকোনো কারণ থাকতে পারে। আমরা দ্রুতই দেখব কিভাবে একটি কাঠামোগত সমস্যা থাকতে পারে।

আমরা দেখব কিভাবে একটি কাঠামোগত সমস্যা এই শ্রেণি বিভাজনে জড়িত থাকতে পারে। হয়তো পরবর্তী বিষয়টি সাহায্য করবে - প্রথমত, এসব মডেল যেভাবে দাবি করে তার সাথে সংগতি রেখে এই অবস্থানের ব্যবস্থা পূরণ করার চেষ্টা করুন। দ্বিতীয়ত, আপনার রাজনীতির ধারণার সাথে সংগতি রেখে বিবেচনা করুন কিভাবে এসব মডেল আরও বাস্তবসম্মতভাবে বিন্যস্ত করা যায়।

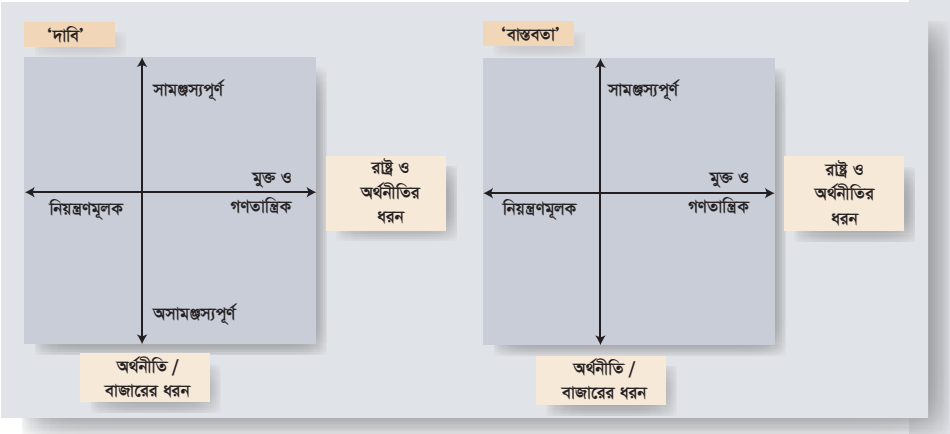

চিত্র ৫: দাবি ও বাস্তবসম্মত অবস্থান

যখন সমাজের মডেলের দাবি ও বাস্তবতার মধ্যে অমিল থাকে, তার কারণ কী?

এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি চলে আসে - যদি সমাজের একটি মডেলের 'দাবি'র সাথে 'বাস্তবতা'র মিল না থাকে তাহলে তার কারণ কী? (বিতর্কের খাতিরে ধরে নিতে হবে যে আমরা ভুল নই)।

সমাজের মডেলগুলোর শ্রেণিবিন্যাসের দুটি বাস্তবতা মাথায় রেখে নিচের ব্যাখ্যাটি বিবেচনা করুন যদি কোনো কাজে আসে।

দাবি ও বাস্তবতার অমিলের ক্ষেত্রে উদ্ভূত প্রশ্নের উত্তর হতে পারে শুধু যদি একদিকে কেউ সংশ্লিষ্ট মডেলকে তত্ত্বের খাতিরে দেখে থাকে, আর অন্যদিকে কেউ এসব মডেলকে বাস্তবভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে দেখে। যেমন, নির্দিষ্ট কোনো মডেলের ভিত্তিতে কোনো রাষ্ট্র তাদের অবস্থান কতটুকু নির্ধারণ করেছে তা যাচাই করা। যদি দাবি ও বাস্তবতার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকে তাহলে কিছুটা হলেও যুক্তির ভুল ব্যাখ্যার জন্য, যেমন ক্ষমতায় থাকার জন্য কালক্ষেপণ করা। এটি সাধারণ জনগণের স্বার্থের জন্য করা হচ্ছে বলে প্রচারের চেষ্টা করা হলেও আসলে তা মাত্র গুটিকয়েকের স্বার্থের জন্য করা হয়, যদি কাউকে বোকা বানানো না হয়ে থাকে। তাহলে এক্ষেত্রে প্রধান প্রশ্নটি অবধারিতভাবে উঠবে যে "কে সুবিধা পায়?" বা "কার লাভ হয়?" এ ধরনের বিতর্কে কার লাভ হয়?

অন্যদিকে বিশ্লেষণ হিসেবে ইউটোপিয়বাদ?

অন্যদিকে এই পার্থক্য হতে পারে তাত্ত্বিক। এক্ষেত্রে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আর বাস্তবভিত্তিক অবস্থা বর্তমান সামাজিক অবস্থায় উপযোগী করা যায় না।

অন্যকথায় আমরা সমাজের এমন একটি মডেল নিয়ে কথা বলছি যা বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভাবনা নিকট ভবিষ্যতে খুবই ক্ষীণ। কাজেই বর্তমানের প্রেক্ষাপটে একে ইউটোপিয়ান হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এর অর্থ এই নয় যে এই দাবিকে সমালোচনা করতে হবে, বরং যা নিয়ে সমালোচনা করা যায় তা হল এই ইউটোপিয়বাদের অজুহাতে যদি বর্তমান মানুষের যা করা উচিত তা করতে বাধা দেয়। এই প্রেক্ষিতে বলতে হয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক ধারণাকে বাস্তবে অর্জনযোগ্য হতে হবে।

অন্যকথায় আমরা সমাজের এমন একটি মডেল নিয়ে কথা বলছি যা বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা নিকট ভবিষ্যতে খুবই ক্ষীণ। কাজেই বর্তমানের প্রেক্ষাপটে একে ইউটোপিয়ান হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এর অর্থ এই নয় যে এই দাবিকে সমালোচনা করতে হবে, বরং যা নিয়ে সমালোচনা করা যায় তা হল এই ইউটোপিয়বাদের অজুহাতে যদি বর্তমান মানুষের যা করা উচিত তা করতে বাধা দেয়। এই প্রেক্ষিতে বলতে হয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক ধারণাকে বাস্তবে অর্জনযোগ্য হতে হবে।

সামাজিক উদ্যোগ ছাড়া ইউটোপিয়বাদ প্রকৃত অর্থে হচ্ছে বিশুদ্ধ উপভোগ, যারা শুধু উপযুক্তভাবে ভাল অবস্থানে আছে তারা এর ব্যয়ভার বহনে সমর্থ। এমন কোনো ইউটোপিয়বাদ আছে কিনা যা রাজনীতি ও সমাজকে পরিবর্তন করতে চায় না তার উত্তর সুনির্দিষ্টভাবে দেওয়া কঠিন। এটি পরিষ্কার হয়ে যায় শুধু তখনই যখন স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক কৌশলগুলো পরীক্ষার মুখোমুখি হয়।

কেন তত্ত্ব ও বাস্তবতা মাঝে মাঝে আলাদা হয়ে যায় তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এখনকার জন্য যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক প্রবণতা ও মতবাদগুলোর সারাংশ পরবর্তী অংশে পড়ার পর সমাজ সম্পর্কে ধারণাগুলোর কোনটি রাখা যাবে সেটা ঠিক করাই উত্তম।

পরবর্তী অংশে সংক্ষেপে উদারনৈতিকতাবাদ, রক্ষণশীলতা, সমাজতন্ত্র ও সামাজিক গণতন্ত্রের দ্বারা প্রচারকৃত সমাজের বিভিন্ন ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে ব্যক্তিপ্রবণতার মৌলিক যুক্তিগুলো উপস্থাপন করা উচিত, যদিও এত সংক্ষেপে সমাজের এসব মডেল ব্যাখ্যা করার বিপদ রয়েছে। এ উপস্থাপনার শেষে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে 'বাস্তব অবস্থা' সম্পর্কে কিছু মন্তব্য আছে।

যেহেতু এটি কিছুটা সরলীকৃত, প্রতিটি মডেলের ওপর ফলোআপ সাহিত্যের তালিকা প্রত্যেক উপস্থাপনার শেষে দেওয়া হয়েছে।

৩.২ উদারনৈতিক অবস্থান

উদারনৈতিক অবস্থান বাজার ও গণতন্ত্রের মধ্যকার সম্পর্কের প্রেক্ষিতে মুক্ত বাজারের ওপর আর উদ্যোগের স্বাধীনতার ওপর জোর দেয়। গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে মোটামুটিভাবে 'কাঠামো ঠিক রাখা' পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে যেন মুক্ত বাজার অব্যাহত থাকার নিশ্চয়তা থাকে। উদারনৈতিক অবস্থানের নিম্নোক্ত মৌলিক শর্ত রয়েছে:

- বস্তুগত ও অবস্তুগত পণ্যের সরবরাহ যে সমাজের চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হয় তা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে বাজার নিশ্চিত করে।
- সমতা ও একতার ওপর স্বাধীনতার এবং সমাজের ওপর ব্যক্তির একচ্ছত্র অগ্রাধিকার রয়েছে।
- বাজারের মাধ্যমে স্বাধীনতার সরাসরি বাস্তবায়ন হয়। (উল্লেখযোগ্য) বাজারের স্বাধীনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ/ বাধা এক্ষেত্রে সাধারণভাবে স্বাধীনতার ওপর বাধার সমতুল্য আর কাজেই বর্জনীয়।
- রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে বাজারের জন্য নিশ্চিত কাঠামো তৈরি করা আর মানুষের জীবনের আকস্মিক ঘটনার জন্য ন্যূনতম বন্দোবস্ত রাখা, যা নিজেদের কোনো কারণ বা কার্যক্রম ছাড়াই তাদের ওপর পড়তে পারে। তবে এসব বন্দোবস্ত কোনো মৌলিক অধিকার হিসেবে রাখা হয় না। এই ক্ষুদ্র রাজনৈতিক পরিসর গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজের আইনগত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর জন্য রাষ্ট্র খুব সামান্যই দায়ী থাকে।
- মানবতা মানুষের স্বাধীনতার ওপর নির্ভরশীল, যার প্রেক্ষিতে মানুষ তাদের অর্জন ও জীবনকে 'ব্যবহার্যের পরাকাষ্ঠা' হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করে থাকে। বাজারের স্বাধীনতা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার সহায়তা পেয়ে থাকে; রাষ্ট্রকে শুধু এটি নিশ্চিত করতে হয় যে সমাজ যেন মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ব্যাহত না করে। রাষ্ট্রের উচিত মানুষের স্বাধীনতা রক্ষা করা, তবে এর উচিত নয় তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা।
- উদারনৈতিক ধারণায় এমন একটি কেন্দ্রিয় ব্যাংক রয়েছে যা মুদ্রার স্থিতিশীলতার জন্য কাজ করে, যেটি এর মূল লক্ষ্য (monetarism)।

ঐতিহাসিকভাবে উদারনৈতিকতাবাদের জন্ম বুর্জোয়া সমাজের উত্থানের সময়। এর অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ছিলেন জন লক (১৬৩২ - ১৭০৪) (দেখুন অধ্যায় ২.১)।

রাষ্ট্রের গঠনের ক্ষেত্রে চিরায়ত উদারনৈতিকতাবাদের (কিন্তু অর্থনীতির গঠনের ক্ষেত্রে নয়!) বর্তমানে সামাজিক গণতান্ত্রিক যৌক্তিকতার পেছনে প্রধান প্রভাব রয়েছে (দেখুন অধ্যায় ৩.৪)।

চিরায়ত
উদারনৈতিকতাবাদ

ফ্রিয়েডরিখ ভন হায়েক: অন্যতম বিখ্যাত নব্য উদারনীতিক

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে কয়েকজন নব্য উদারনীতিক[১৬] উল্লেখযোগ্যভাবে লক-এর ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানকে চরমপন্থায় নিয়ে যায়।

ফ্রিয়েডরিখ অগাস্ট ভন হায়েক (১৮৯৯ - ১৯৯২) ছিলেন একজন অস্ট্রিয় অর্থনীতিবিদ আর বিংশ শতকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদারনীতিক চিন্তাবিদ। তিনি মুক্তবাজারের একজন অন্যতম প্রধান প্রবক্তা, ও যেকোনো ধরনের রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ছিলেন। এ কারণে তিনি সমাজতন্ত্রের একজন চরমতম সমালোচক ছিলেন।

নব্য উদারনীতির ধারণা কী তা না জেনেই বর্তমান সমাজের যাবতীয় নেতিবাচক বিষয়কে 'নিও লিবারেল' বলার একটি প্রবণতা দেখা যায়। এ ধরনের অযৌক্তিক বিশ্লেষণমূলক তর্ক এড়ানোর জন্য এখানে 'নব্য উদারনীতিক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, ফ্রিয়েডরিখ অগাস্ট ভন হায়েক[১৭] তুলে ধরেন যে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র একটি অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বাস্তবায়িত হতে পারে যা অবাধ ব্যক্তিগত সম্পদ ও প্রতিযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। সমাজের উদ্ভব একটি 'স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবস্থা' হিসেবে যেখানে বাজারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ব্যক্তিরা মুক্তভাবে একে অন্যের সাথে যুক্তভাবে ও প্রতিযোগিতার মধ্যে মিথস্ক্রিয়া করে। রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে শুধু একে অন্যের সাথে ব্যক্তি কিভাবে ব্যবহার করবে তার তদারকি করার জন্য সাধারণ নিয়ম তৈরি করে দেওয়া (দেখুন কনার্ট ২০০২: ২৮৭)। সমস্যা হচ্ছে বাস্তবে শুধু কিছু মানুষের জন্য স্বাধীনতা আর গণতন্ত্র রয়েছে যা হায়েকের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবস্থার তুলনায় উল্লেখযোগ্য নয়। এই শর্তে আরও অনুল্লেখযোগ্য যে লাগামহীন পুঁজিবাদে একজন ব্যক্তির অর্থনৈতিক মুক্তির পরিণাম হতে পারে আরেকজন ব্যক্তির অর্থনৈতিক চাহিদা আর স্বাধীনতার ঘাটতি। এক্ষেত্রে কনার্ট খুব ভাল ও সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করেছেন যে হায়েক-এর যুক্তির আর বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র নেই।

আরেকজন নব্য উদারনীতিক: উইলহেলম রোপকে

নব্য উদারনীতিক বিতর্কে তত্ত্ব ও বাস্তবতার পার্থক্য উইলহেলম রোপকে'র ধারণা থেকেও স্পষ্ট হয়। রোপকে'র মতানুযায়ী উদারনৈতিকতাবাদ হচ্ছে সমাজের সমাজতান্ত্রিক ধর্মের স্বেচ্ছাচারী ধরনের একমাত্র বিকল্প। তার মতে যারা 'একত্রবাদ (collectivism) চায় না' তারা অবশ্যই 'বাজার অর্থনীতি চায়' ... তবে বাজার অর্থনীতি মানে মুক্ত বাজার, মুক্ত সাংবাদিকতা ও মূল্যের স্থিতিস্থাপকতা। অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে চাহিদার প্রাধান্যের প্রতি উৎপাদকের অভিযোজন ক্ষমতা ও আনুগত্য।

১৬ বিংশ শতকের প্রথমার্ধে চিরায়ত উদারনৈতিকতাবাদের ওপর যারা নতুন তত্ত্ব আরোপ করে তাদের 'নব্য উদারনীতিক' বলা হয়, এবং ১৯৮০-এর দশকের পর থেকে তারা আরও পরিবর্তিত হয়। ইদানিং 'নব্য উদারনীতিক' শব্দটি অবমূল্যায়নসূচক হিসেবে বামপন্থীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

১৭ এই পর্যায়ে উল্লেখ করা আবশ্যক যে ভন হায়েক-এর যুক্তি অন্যান্য নব্য উদারনীতিকদের মতের সাথে মূল কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা (যেমন সমাজের গঠন ও ইতিহাসের ধারণা)। এ কারণে ভন হায়েক একজন বিশেষভাবে প্রভাব সৃষ্টিকারী কিন্তু কোনোভাবেই বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব নন, এমনকি নব্য উদারনীতিকদের মধ্যেও।

নেতিবাচক অর্থে এর মানে একচেটিয়া ব্যবসা আর কেন্দ্রীভূতকরণের ঠিক বিপরীত এবং স্বার্থান্বেষী দলগুলোর অরাজকতা যা সারাদেশে মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ছে। বাজার অর্থনীতির অর্থ হচ্ছে নীতিভ্রষ্ট অংশীদারিত্বের নীতির পরিবর্তে বাছাই করার ধারণা। এটি একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী নীতি যা একটি অত্যন্ত কৃত্রিম ও অত্যন্ত প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ গঠনের জন্য আমাদের অধিকারে আছে। তবে একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হলে একে অবশ্যই ভেজালমুক্ত (unadulterated) হতে হবে ও একচেটিয়া ব্যবসা দ্বারা কলুষিত না হয় তা দেখতে হবে (রোপকে ১৯৪৬: ৭৪)।

ইতোমধ্যে একটি অসংগতি চিহ্নিত করা যায় যা অনেক উদারনৈতিক অবস্থানে দেখা যায় - একদিকে একটি মোটামুটি স্ব-নিয়ন্ত্রিত বাজার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করা হয় যা রাজনৈতিক তদারকি থেকে মুক্ত থাকবে, আবার অন্যদিকে একচেটিয়া ব্যবসাকে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয় আর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একে নিয়ন্ত্রণ করার চাহিদা প্রকাশিত হয় যেন এর দ্বারা প্রতিযোগিতা নষ্ট না হয়। এটি 'মুক্ত বাজার' ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক। এভাবে বাজার অবশ্যম্ভাবীভাবে একটি দ্বন্দ্বের দিকে যায় যা এটি নিজে নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এটি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন।

এছাড়া নব্য উদারনৈতিক ধারণা মনে করে যে বাজারের স্বাধীনতা ব্যক্তির স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট। এই ধারণা বাজার পুঁজিবাদের দ্বারা সামাজিক বর্জনের প্রেক্ষিতে টেকসই হতে পারে না।

১৯৬০ এর দশক থেকে এখন পর্যন্ত নব্য উদারনীতিক গবেষণার নেটওয়ার্ক, রাজনৈতিক পরামর্শক, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও লবিয়িস্টদের মধ্যে একটি দৃঢ় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৮০'র দশকের 'নব্য উদারনৈতিক ভাবধারা' উদ্ভবের পেছনে এটির অবদান খুব কম নয়, যেমন হয়েছে থ্যাচার ও রিগ্যানের সময়।[১৮] একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবেই পুঁজির অধিপতিদের কাছ থেকে আর যাদের জীবনযাত্রা নিশ্চিত (চিরায়তভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও ব্যবসায়ী অভিজাতরা) তাদের কাছ থেকে নব্য উদারনৈতিক মতবাদ সমর্থন পায়। কাজেই দুটি অর্থে নব্য উদারনৈতিকতাবাদ সমাজের একটি অভিজাতভিত্তিক মডেল - এক, এর উদ্ভব স্বচ্ছলদের মধ্যে হয়েছে, আর দুই, এটি তাদের স্বার্থ উপস্থাপন করে।

আরো জানতে পড়ুন-

নিউ লিবারেলস অ্যান্ড দেয়ার ক্রিটিকস: ফ্রেডরিক অগাস্ট ভন হায়েক (১৯৪৬), দ্য রোড টু সার্ফডম।

উইলহেম রোপকে (১৯৪২), দ্য সোশ্যাল ক্রাইসিস অব দেয়ার টাইম

উইলহেম রোপকে (১৯৪৬), সিভিটাস হুমানা (দ্য মরাল ফাউন্ডেশনস অব সিভিল সোসাইটি হিসেবেও প্রকাশিত)

হ্যান্সজর্জ কনার্ট (২০০২), 'জুর আইডিওলজি ডেস নিওলিবারালিসমাস - আম বেসপায়েল ডার লেরে এফ. এ. ভন হায়েকস', ইন. কনার্ট, পৃষ্ঠা ২৭৫-৯৬

ডেভিড হার্ভে (২০০৭), এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব নিওলিবারালিজম।

[১৮] এই নব্য উদারনীতিক নেটওয়ার্কের উদ্ভব নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন প্লেহউই/ ওয়ালপেন (২০০১)।

৩.৩ রক্ষণশীল অবস্থান

রক্ষণশীলতা: যা ইতোমধ্যে রয়েছে তার প্রতি সমর্থন

রক্ষণশীল অবস্থান বোঝা সবচেয়ে কঠিন। এর পেছনে ঐতিহাসিক ও পদ্ধতিগত কারণ রয়েছে।

ঐতিহাসিকভাবে রক্ষণশীল অবস্থান (আক্ষরিক অর্থে) প্রধানত যা হয়ে আসছে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি মনোযোগী। এর ফলে ঐতিহাসিকভাবে রক্ষণশীলতার একটি সতর্ক ও সর্বজনীন মতামত প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। সংক্ষেপে বলা যায় যে রক্ষণশীলরা সবসময়ই আছে, কিন্তু রক্ষণশীলতার একটি স্থায়ী, সর্বজনীন ধারণা নেই।

ফরাসি বিপ্লব ও ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে পুনরুদ্ধারের (Restoration) সময় রক্ষণশীলরা জন্মসূত্রের করপোরেট সুবিধা ও আভিজাত্যের স্বার্থের কথা বলত। জার্মান সাম্রাজ্যের উত্থানের সময় তারা প্রথমে ক্ষুদ্র জার্মান রাষ্ট্র দাবি করে, পরবর্তীতে সাম্রাজ্যের দাবি করে, যেখানে ওয়েইমার রিপাবলিকের সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের কথা বলে, আর গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। ১৯৮০'র দশকে রক্ষণশীলরা নব্য উদারনীতিকদের চিরায়ত চেতনা নিয়ে ফিরে আসে আর ১৯৭০-এর দশকের সংস্কার পরিবর্তনের কথা বলে। কাজেই রক্ষণশীলদের কোনো স্থায়ী অবস্থান চিহ্নিত করা যায় না।

তা সত্ত্বেও প্রধানত বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে রক্ষণশীল চিন্তা-ভাবনার কিছু আবশ্যক ভিত্তির তালিকা তৈরি করা সম্ভব।

- দেখা যায় রক্ষণশীলরা নিয়ম হিসেবে মূল নীতিগুলো তাদের পরিবার, ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও যোগ্যতা বা অর্জন থেকে তাদের অবস্থান ঠিক করে। ঐতিহ্যকে স্থানের গৌরব দেওয়া হয়।
- নিয়ম হিসেবে রাষ্ট্র গঠিত হয় চেতনার 'উচ্চতর অবস্থা' থেকে, যা জাতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়। একটি সাধারণ ধারা হিসেবে এই 'উচ্চতর অবস্থা' চিন্তার স্তরভিত্তিক ধরন ও সমাজের আভিজাত্যের প্রতি ইতিবাচক মনোভাবের যৌক্তিকতা সরবরাহ করে। এক্ষেত্রে সামাজিক অসমতা যৌক্তিক প্রমাণ করা হয়।
- জার্মানিসহ আরও অনেক দেশে রক্ষণশীল মতবাদ মানবতার খ্রিস্টীয় ভাবধারায় চালিত। ক্যাথলিক সামাজিক মতবাদ (দান, সাহায্য নীতি) থেকে উদ্ভূত ধারণা এখানে মৌলিক চেতনা হিসেবে পরিগণিত হয়।
- সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রক্ষণশীলদের মধ্যে 'নব্য বুর্জোয়া চেতনা' বহুল ব্যবহৃত হতে দেখা যায় (দেখুন বুখটেইন/ হাইন/ জোর্ক ২০০৭: ২০১)।

- রক্ষণশীল মতবাদ এমন একজন নাগরিকের বর্ণনা[১৯] দেয় যার জীবন পরিবার, ঔচিত্য, আনুগত্য ও সৌজন্যবোধের মত চেতনার দ্বারা চালিত, এবং তিনি নাগরিক সমাজ ও পেশাগত জীবনে একজন স্বায়ত্তশাসিত ব্যক্তি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। উডো ডি ফ্যাবিও বলেন: 'বর্তমানে বুর্জোয়া হওয়ার অর্থ হচ্ছে দায়িত্ব ও ইচ্ছা, ভালবাসা ও দ্বন্দ্ব, অভাব ও স্বচ্ছলতার মধ্যকার সম্পর্ককে মেনে নেওয়া; স্বাধীনতাকে সবার ওপরে একজন ব্যক্তির কঠোর পরিশ্রমের ফসল হিসেবে প্রতিশ্রুতি ও সাফল্যের স্বাধীনতা হিসেবে বোঝা, আর এর ভিত্তিতে একাগ্রতা ও পরিশ্রমকে আবশ্যকীয় হিসেবে আরোপ না করে আনন্দ পাওয়া। বুর্জোয়া অর্থ হচ্ছে একজনের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা/ আদর্শ ব্যতিরেকে গোষ্ঠী ও সবার ভীতি, অরক্ষিত ও দরিদ্রসহ সবাইকে নজরে রাখা, এবং স্বাধীনতা ও সমতার সাথে সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়ানো (ডি ফ্যাবিও ২০০৫: ১৩৮ছ)। 'নব্য বুর্জোয়া চেতনা' ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ধারণাও প্রতিফলিত করে যা প্রধানত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ-কেন্দ্রিক নৈতিকতার প্রতি আকর্ষক। এটি পরিষ্কারভাবেই মানবতার সমাজতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ধারণা, এবং একটি উদারনৈতিক ধারণা থেকেও পৃথক।

- ১৯৮০'র দশক থেকে এবং কোহল সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী 'আধ্যাত্মিক-নৈতিক ধারা'য় একদিকে মানবতার খ্রিস্টীয়-রক্ষণশীল ধারণা ও অন্যদিকে অর্থনৈতিক উদারনৈতিকতার মিশ্রন দেখা যায়। এর বিপরীতে অ্যাঞ্জেলা মার্কেলের সরকার আরও বেশি সামাজিক গণতান্ত্রিক উপাদান ও চিন্তার ধারা যুক্ত করেছে, যদিও তা সংস্কার করা ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বয়ে গেছে। একটি পর্যায় পর্যন্ত এটি সিডিইউ'তে 'আধুনিকবাদী' (modernizer) ও রক্ষণশীলদের সম্ভাব্য দ্বন্দ্বকে ত্বরান্বিত করেছে।

বিশেষ করে রক্ষণশীলতার জন্য এটি জোর দেওয়া প্রয়োজন যে একটি দলের স্বচ্ছ শ্রেণিবিভাজন ও ঐতিহাসিক আদর্শগত ধ্রুবক প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। রক্ষণশীলদের লক্ষিত গোষ্ঠী নির্ণয় করা বরং আরও সহজ - প্রাথমিকভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে স্বচ্ছল ও ব্যবসায়ী অভিজাত, এবং একইসাথে ধর্মীয় বলয় - প্রধানত ক্যাথলিক।

আরো জানতে পড়ুন-
কনজারভেটিজম: উডো ডি ফাবিও (২০০৫), ডাই কুলতুর ডার ফ্রেইহেট (দ্য কালচার অব ফ্রিডম), মিউনিক।

এডগার জাং (১৯৩২), ডিউটসল্যান্ড উন্ড ডাই কনজারভেটিভ রেভ্যুলিউশন, মিউনিক।

মারটিন গ্রেইফেনহাগেন (১৯৭১), ডাস ডিলেমা ডেস কনজারভেটিভিসমাস ইন ডিউটসল্যান্ড, মিউনিক।

[১৯] জার্মান 'বুর্জার' শব্দটি 'বুর্জোয়া'র কাছাকাছি একটি অর্থ বহন করে।

৩.৪ সামাজিক গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র

এই মডেলে ঐতিহাসিক বিবর্তন অন্তর্ভুক্ত

একটি রূপকল্প হিসেবে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র ও একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে সামাজিক গণতন্ত্রের দীর্ঘ (ধারণার ইতিহাস) ঐতিহ্য রয়েছে যা শ্রমিকদের আন্দোলনের উদ্ভবের সাথে সম্পর্কিত। রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক ধারণার বিপরীতে এই রাজনৈতিক মডেলটি খুবই পরিবর্তনযোগ্য বলে প্রমাণিত। এটি কোনো বিষয়ের প্রতি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী দেয় যা এর নিজস্ব ঐতিহাসিকতার প্রতি সবসময়ই সচেতন। কাজেই এই সামাজিক প্রবণতার ধারণার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করা উচিত।

৩.৪.১ শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রদূত

'সমাজতন্ত্র' একটি ধারণা হিসেবে কবে প্রভাবশালী হয়ে উঠল?

'কবে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ধারণার উদ্ভব?' - এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। হারম্যান ডাংকারের মতে, 'সমাজতন্ত্রের ইতিহাস মানবতার ইতিহাসের সাথেই শুরু' (ডাংকার ১৯৩১: ৯)। অন্যান্যরা সমাজতন্ত্রের ধারণাকে শুরুর দিককার খ্রিস্টীয় ধর্মের সাথে যুক্ত করে। আর বাকিরা এখনো ফ্রান্স বা ইংল্যান্ডে আদি সমাজতান্ত্রিকদের কথা বলে। এভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে চলার সময় সবসময়ই উদ্ভবের নতুন ক্ষেত্র খুঁজে পায়। তর্কাতীতভাবেই প্রত্যেকের ধারণার পেছনেই কিছু না কিছু ভিত্তি আছে। তবে এই প্রশ্ন কিছুটা ভুল পথে চালিত করতে পারে যে কবে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব, কারণ এর পরিবর্তে কবে কোনো একটি ধারণা সুনির্দিষ্টভাবে প্রভাব তৈরি করতে শুরু করে তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হচ্ছে, সমাজতন্ত্রের ধারণা প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে শ্রমিক আন্দোলনের সাথে সাথে - বিশেষকরে জার্মানিতে ঊনবিংশ শতকে শিল্পায়নের সাথে সাথে।

এখানে সমাজতান্ত্রিক ধারণার ওপর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই, তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও রাতারাতি পরিবর্তনের ওপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা দেওয়া হল।

১৮৪৮ থেকে ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত: রাজনৈতিক প্রবণতার উদ্ভব

১৮৪৮ সালে জার্মানিতে শুধু 'বুর্জোয়া বিপ্লবই' হয় নি, বরং কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলস-এর যৌথভাবে লিখিত 'ম্যানিফেস্ট অব দি কমিউনিস্ট পার্টি'ও প্রকাশিত হয়।

কার্ল মার্ক্স (১৮১৮ - ১৮৮৩) ছিলেন একজন অসাধারণ সামাজিক অর্থনীতিবিদ ও ঊনবিংশ শতকের একজন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক। সর্বোপরি পুঁজিবাদের ওপর তাঁর অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এখনো সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আর তাঁর সমালোচকদের সরলীকৃত উপস্থাপনাই নয়, বরং তাঁর অনেক অনুসারীর চেয়েও বেশি গুরুত্ব বহন করে।

প্রথমবারের মত এমন একটি ভাষায় শ্রমিকদের আন্দোলনের জন্য একটি কর্মসূচি তৈরি হল যা বেশিরভাগ মানুষ বুঝতে পারে।

পরবর্তী কাজের মাধ্যমে প্রধানত কার্ল মার্ক্সের দ্বারা এই রাজনৈতিক কর্মসূচির তাত্ত্বিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী করা হয়। এই সময়ের একটি তাত্ত্বিক মডেল হিসেবে সমাজতন্ত্রের মৌলিক শর্তগুলো বের করা যায়।

- মার্ক্স শুরু করেন এই ধারণা দিয়ে যে (বাজার) পুঁজিবাদ কয়েকজনের স্বাধীনতার বিপরীতে অসমতা ও স্বাধীনতার ঘাটতির দিকে নিয়ে যায়। একদিকে রয়েছে পুঁজির মালিক আর অন্যদিকে রয়েছে তারা যাদের কোনো পুঁজি নেই। আর তাই মজুরির জন্য তাদের শ্রম বিক্রি করতে হয়। বাজার পুঁজিবাদ এই সত্যের ওপর তৈরি যে মজুরিভিত্তিক শ্রম তার উৎপাদনের প্রেক্ষিতে প্রকৃত মূল্য পায় না। এভাবে পুঁজির মালিকরা আরও বেশি পুঁজি সঞ্চয় করতে পারে। এখানে পুঁজির মালিকরা প্রকৃত ব্যক্তি, বড় কোম্পানি নাকি বড় বিনিয়োগকারী তা অপ্রাসঙ্গিক।

- পুঁজির অধিপতিদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা এবং আরও পুঁজি সঞ্চয়ের ক্রমাগত চাপ শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে যার ফলে দারিদ্র্যের সাথে সাথে উৎপাদনের অতিসক্ষমতা তৈরি হয়। এই প্রতিযোগিতার লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদনে পুনঃবিনিয়োগ এবং অন্যদের তুলনায় বেশি সুবিধাজনক শর্তে উৎপাদনের সক্ষমতা ধরে রাখা। এর ফলে উৎপাদিত পণ্য একসময় আর বিক্রি করা যায় না, পুঁজি আর বিনিয়োগ করা যায় না, বা অতি-উৎপাদনে বাজারের অভাবে শেষ হয়ে যায়। বড় দাগে এই কারণে মার্ক্স মনে করেন যে অর্থনৈতিক সংকট (বাজার) পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি অবশ্যম্ভাবী ও প্রয়োজনীয় অংশ।

- অসমতা ও স্বাধীনতার ঘাটতি যা (বাজার) পুঁজিবাদের একটি ধারাবাহিক পরিণতি হিসেবে বিবেচিত তা সবার জন্য সমান স্বাধীনতার দাবিকে বিশেষভাবে অস্বীকার করে।

- কাজেই দাবি বাস্তবায়িত হতে পারে, শুধু যদি উৎপাদনের মাধ্যমের মালিকানার রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় এবং পুঁজির ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তিতে নেওয়া হয়। তবে ব্যক্তিগত সম্পদ জাতীয়করণের অন্তর্ভুক্ত হবে না (যদিও সাধারণভাবে এর বিপরীতটাই মনে করা হয়)।

- মানবতার ওপর মার্ক্সের ধারণা একটি অসংগতির ওপর ভিত্তি করে নির্মিত - যেসব মানুষ নীতিগতভাবে মুক্ত, সমান ও একতাভিত্তিক, একটি অসম ও মুক্ত নয় এমন ব্যবস্থায় বসবাস করে যা উপযোগিতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে। মানবতার এ ধরনের চিন্তাধারা একটি শক্তিশালী আদর্শিক শর্ত ধারণ করে।
- কাজেই মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর তত্ত্ব অন্যান্য তত্ত্ব ও মতবাদের সাথে সাথে শ্রমিকদের আন্দোলনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র তৈরি করে।
- তথাপি, এই রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রভাব খুবই সীমিত ছিল, কারণ অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের বিশ্লেষণে বেশ কয়েকটি কেন্দ্রীয় নিয়ামক বিবেচনা করেন নি বা করতে চান নি, বিশেষকরে সমাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের বিষয়টি।

লাসাল-এর মতবাদ

তবে এসব বিষয়ই ছিল ফার্ডিনান্ড লাসাল-এর প্রধান আলোচ্য বিষয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই প্রাথমিক ধারণা যে প্রত্যেক রাষ্ট্র ও আইনি কাঠামো মানুষের স্বাধীনতার প্রশ্নে শুরু হবে। লাসাল-এর মতে এর ফলাফল হচ্ছে যে মৌলিক আইনে অবশ্যই সার্বিকভাবে মানুষের ঠিক ও ভুলের চেতনার প্রতি মতামত প্রকাশিত হতে হবে।

এর ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান একটি মুক্ত জনগোষ্ঠীর সংগঠন হিসেবে ভাবতে হবে। প্রাশিয়ান রাজ্য ও জার্মান সাম্রাজ্য, যা কয়েক বছর পরে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং যার বৈশিষ্ট্য ছিল একটি রাজতান্ত্রিক-স্তরায়িত কাঠামো, তার কথা বিবেচনায় নিয়ে কারও কারও কাছে একে একটি উদ্দীপক ধারণা মনে হতে পারে।

ফার্ডিনান্ড লাসাল (১৮২৫ - ১৮৬৪) ১৮৬৩ সালে লাইপজিগ-এ জেনারেল জার্মান শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর বই দি সিস্টেম অব অ্যাকোয়ার্ড রাইটস-এ তিনি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন।

'এটি হচ্ছে রাষ্ট্র যার কাজ হচ্ছে মানুষের উন্নয়ন যতক্ষণ না তা অর্জিত হচ্ছে ততক্ষণ স্বাধীনতার উন্নয়ন চালিয়ে নিয়ে যাওয়া ... কাজেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য শুধু ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সম্পদ রক্ষা করাই নয়, যা দ্বারা বুর্জোয়া ধারণা অনুযায়ী সে রাষ্ট্রের সদস্য হয়েছে, বরং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে এটি যে এই একতার মাধ্যমে সে ব্যক্তিকে এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য জায়গামত স্থাপন করবে যেখানে ব্যক্তি হিসেবে সে পৌঁছাতে পারত না; তাদেরকে শিক্ষার ক্ষমতা ও স্বাধীনতার একটি পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছানো যা ব্যক্তি হিসেবে তাদের পক্ষে অর্জন করা যেত না।'

(লাসাল, দি ওয়ার্কিং ক্লাস প্রোগ্রাম, ১৮৭২ [জার্মান সংস্করণ] ১৯৮৭: ২২২ছ)

এভাবে লাসাল সামাজিক গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের বিতর্কে দুটি কেন্দ্রীয় বিষয়ের অবতারণা করেন - একদিকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও এর সামাজিক পূর্বশর্ত, এবং অন্যদিকে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য সবচেয়ে ভাল কৌশল কী হতে পারে।

অগাস্ট বেবেল ও উইলহেলম লিয়েবনেখট

লাসাল-এর রাষ্ট্রের ধারণার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমালোচক হচ্ছেন অগাস্ট বেবেল ও উইলহেলম লিয়েবনেখট। তাদের মূল সমালোচনা ছিল যে লাসাল-এর কর্মসূচিতে যেসব ঘাটতি ছিল, যেমন প্রেসের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, জমায়েতের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রের রাতারাতি পরিবর্তন, এসব ছাড়া শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা রাষ্ট্রের দ্বারা আরোপ করা যায় না।

একত্রীকরণ দল সম্মেলন গোথা, ১৮৭৫

১৮৭৫ সালে জেনারেল জার্মান ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন ও সোশাল ডেমোক্র্যাটিক ওয়ার্কার্স পার্টি গোথায় অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে একীভূত হয়, যেখানে সোশালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি অব জার্মানি গঠিত হয়। এভাবে জার্মান সাম্রাজ্যে এবং বিসমাক-এর প্রতি- সমাজতান্ত্রিক আইনের বিরুদ্ধেও সামাজিক গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এভাবে এই সময়ে দ্বন্দ্বের মূল বিষয়গুলো ধরে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে তা শ্রমিকের আন্দোলনের বিভক্তির দিকে নিয়ে যায়।

উইলহেলম লিয়েবনেখট (১৮২৬ - ১৯০০) ও অগাস্ট বেবেল (১৮৪০ - ১৯১৩) ১৮৬৯ সালে সোশাল ডেমোক্র্যাটিক ওয়ার্কার্স পার্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এছাড়াও তাঁরা (উত্তর জার্মান) রাইখস্ট্যাগ-এ প্রথম সোশাল ডেমোক্র্যাটিক প্রতিনিধি ছিলেন (১৮৬৭ - ১৮৭০)। ১৮৯০ থেকে লিয়েবনেখট ছিলেন ভরওয়ার্টস-এর প্রধান সম্পাদক (এডিটর-ইন-চিফ)।

৩.৪.২ শ্রমিকের আন্দোলনে বিভক্তি

১৮৯০-এর দশক থেকে একটি তাত্ত্বিক প্রশ্নে সামাজিক গণতন্ত্রে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় - যদি পুঁজিবাদের এমন কোনো সংকট হয় যেখানে শ্রমিকের আন্দোলন শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিবাদের ওপর জয়ী হয় আর সমাজতন্ত্র অর্জন করে? আর এটি সামাজিক গণতন্ত্রের কৌশলের ক্ষেত্রে কী অর্থ বহন করবে?

একটি বিতর্কিত তাত্ত্বিক বিষয় ও তিনটি প্রধান শিবির

এই প্রশ্নে তিনটি প্রধান শিবিরকে চিহ্নিত করা যায় (বিস্তারিত দেখুন, ইউখনার/ গ্রেবিং ও অন্যান্য ২০০৫: ১৬৮; গ্রেবিং ২০০৭: ৬৬-৯৪)।

কার্ল কাউটস্কি ও অগাস্ট বেবেল -এর অনুসারী দল

কার্ল কাউটস্কি ও অগাস্ট বেবেল-এর অনুসারী একটি দল আশা করত যে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সুসংগঠিত কর্মজীবী শ্রেণি সমাজতন্ত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু তারা এই উপসংহারে পৌঁছায় যে সাম্রাজ্যের চরমপন্থী রাজনীতি আর এর সাম্রাজ্যবাদী অবস্থান যা দেশকে যুদ্ধের কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছিল তা সংসদের বাইরের গণ ধর্মঘটের মত কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মত কোনো বাধা তৈরি করতে পারে। শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি গায়ের জোরে সমাজতন্ত্রের দিকে রূপান্তর ঘটাতে পারে।

কার্ল কাউটস্কি (১৮৫৪ - ১৯৩৮) ছিলেন এসপিডি'র তাত্ত্বিক পত্রিকা ডাই নিউয়ে জেইট-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। কাউটস্কি এসপিডি'তে সমাজের মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি এডওয়ার্ড বার্নস্টেইনের সাথে এরফুর্ট কর্মসূচির প্রধান লেখক ছিলেন।

এডুয়ার্ড বার্নস্টাইন -এর মত সংশোধনবাদী

এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ধারণার পাশাপাশি তথাকথিত সংশোধনবাদের উদ্ভব ঘটে যার ওপর এডুয়ার্ড বার্নস্টাইন-এর প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। এটি পরিসংখ্যানের তথ্যের ভিত্তিতে মার্ক্সীয় মতবাদের একটি সুচিন্তিত সংশোধনের প্রয়াস নেয়।

এর ফলে এই ধারণার উদ্ভব হয় যে সমাজ ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সংস্কার সম্ভব। উপরন্তু, পুঁজিবাদের নিয়তি ভেঙ্গে পড়ার নয়, বরং এর ভেতরকার সমস্যা বাড়ার বদলে কমে যাবে। ট্রেড ইউনিয়ন ও সমিতি শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সমাজে সংস্কার আনা সম্ভব যার লক্ষ্য সমাজতন্ত্রে উন্নীত হওয়া। ট্রেড ইউনিয়নপন্থী অ্যাডলফ ভন এলম নিচের উপায়ে সংশোধনবাদী কর্মসূচির মূল চেতনার সারমর্ম করেন:

'বিবর্তনের মাধ্যমে বিপ্লব - নিরবচ্ছিন্ন গণতন্ত্রায়ণ ও সমাজের বিভিন্ন অঙ্গের সামাজিকীকরণের মাধ্যমে পুঁজিপতিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে পুনর্গঠন: সংক্ষেপে দলে এই হচ্ছে সংশোধনবাদীদের দৃষ্টিকোণ।' (ইউখনার/ গ্রেবিং ও অন্যান্য উল্লিখিত ২০০৫: ১৭১)

রোজা লুক্সেমবুর্গ (১৮৭১ - ১৯১৯) ছিলেন পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়ার সোশাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সহ-প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৯৯ সালে তিনি বার্লিনে যান। তিনি এসপিডি'র একজন শীর্ষস্থানীয় তাত্ত্বিক ছিলেন। তাঁর অন্যতম তত্ত্ব সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্ব। ১৯১৮ সালে তিনি কেপিডি'র সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আর ১৯১৯ সালে ফ্রেইকর্পস সৈন্যদের দ্বারা নিহত হন।

বার্নস্টাইনের বিপরীতে রোজা লুক্সেমবুর্গ দাবি করেন যে পুঁজির অধিপতিদের চিরস্থায়ী প্রতিযোগিতার কারণে অভ্যন্তরীণ কার্যকরতার ফলে পুঁজিবাদ মনস্তাপে পড়বে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন ক্রমাগতভাবে বর্ধিতকরণ ও অপুঁজিবাদী ক্ষেত্রে ভূমির দখল। রোজা বিপ্লব ও সংস্কারের পার্থক্যকেও অস্বীকার করেন।

'প্রতিদিনকার বাস্তব যুদ্ধে সামাজিক সংস্কারের জন্য, বর্তমানের পরিস্থিতির কাঠামোর মধ্যে শ্রমজীবী মানুষের আর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সামাজিক গণতন্ত্রকে একমাত্র পন্থা হিসেবে নির্দেশ করে যা শ্রমজীবী শ্রেণির সংগ্রামে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর নেতৃত্ব দেওয়া: রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও মজুরি ব্যবস্থার বিলুপ্তি। সামাজিক গণতন্ত্রের জন্য সামাজিক সংস্কার ও সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য একটি সম্পর্ক রয়েছে, যেখানে সামাজিক সংস্কারের জন্য যুদ্ধ হচ্ছে মাধ্যম, কিন্তু চূড়ান্ত সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে লক্ষ্য।' (লুক্সেমবুর্গ ১৮৯৯: ৩৬৯)

রোজা লুক্সেমবুর্গ সংসদীয় উদ্যোগের বিরুদ্ধে ছিলেন না, কিন্তু সমাজতন্ত্র অর্জন করার ক্ষেত্রে একে অপর্যাপ্ত মনে করতেন। এক্ষেত্রে বরং তিনি সংসদের বাইরে শ্রমিকের আন্দোলনের ওপর আস্থা রাখতেন।

শ্রমিক আন্দোলনে বিভক্তি

এই তিন ধরনের বিভক্তির মুখে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এসপিডি সম্রাটের কাছ থেকে বাইরের চাপ সামলে নিতে পারত। তবে এসপিডি'র সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা যুদ্ধ অনুমোদন এবং ইউএসপিডি ও এসপিডি'র বিচ্ছেদের ফলাফল, এবং একইসাথে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কিভাবে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন করা যেতে পারে সেই প্রশ্নের উদ্ভবের প্রেক্ষিতে শ্রমিক আন্দোলনে বিভক্তি আসে।

১৯১৯ সালে ওয়েইমার রিপাবলিকের গঠন

১৯১৯ সালে এসপিডি ওয়েইমার রিপাবলিকের প্রথম সরকার গঠন করে। এটি ছিল রক্ষণশীল, জাতীয়তাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতিরোধের বিরুদ্ধে এবং সমতাবাদীদের বিরুদ্ধেও। বামপন্থীদের প্রথমবারের মত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ঠিকঠাক করার ঐতিহাসিক সুযোগ সমাজতান্ত্রিক বিতর্কের ভাঙ্গা অংশকে আবার ওপরে নিয়ে আসে।

১৯১৯ সালে রাষ্ট্রের ভিত্তির দুটি বিকল্প

যখন সমতাবাদী ও কোনো কোনো সমাজতন্ত্রী শ্রমিক ও সৈন্যদের পরিষদের ওপর একটি রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে কথা বলছিল তখন সোশাল ডেমোক্র্যাটরা একটি প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বড় ভূমিকা পালন করে আর ১৯২০ এর দশকে একটি অবয়বে নিয়ে যায়। ফ্রিটজ নাফতালি সংক্ষেপে এটি বর্ণনা করেছেন:

> *'যে সময়ে পুঁজিবাদ সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল, অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন ছাড়া অসংগঠিত পুঁজিবাদের অন্য কোনো বিকল্প থাকতে পারে বলে মনে হচ্ছিল না ... তখন ধীরে ধীরে দেখা গেল যে পুঁজিবাদের কাঠামো নিজেই পরিবর্তনযোগ্য, আর এই পুঁজিবাদ, ভাঙ্গার আগে, বাঁকানোও যেতে পারে।'*
>
> (নাফতালি ১৯২৯; ইউখনার/ গ্রেবিং থেকে উদ্ধৃত ২০০৫: ৩০৫)

ইতিহাসের ভিন্ন দর্শন

সংক্ষেপে দ্বন্দ্বের মূল বিষয়টি হচ্ছে বিপ্লব ও সংস্কারের পার্থক্যে। একদিকে ('বিপ্লব') এই মতামত ছিল এর আগের সম্পদের সম্পর্ক এবং একটি নতুন সমাজ অর্জনের জন্য রাষ্ট্রের সংবিধান উল্টে দিতে হবে, যেখানে সংস্কারবাদীদের একটি অবস্থান ছিল যে রাষ্ট্রের সংবিধানসহ সমসাময়িক সমাজকে ক্রমাগত সংস্কারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে উন্নত করা উচিত।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন মডেলে বিভিন্ন মতবাদের প্রতিফলন দেখা যায়:

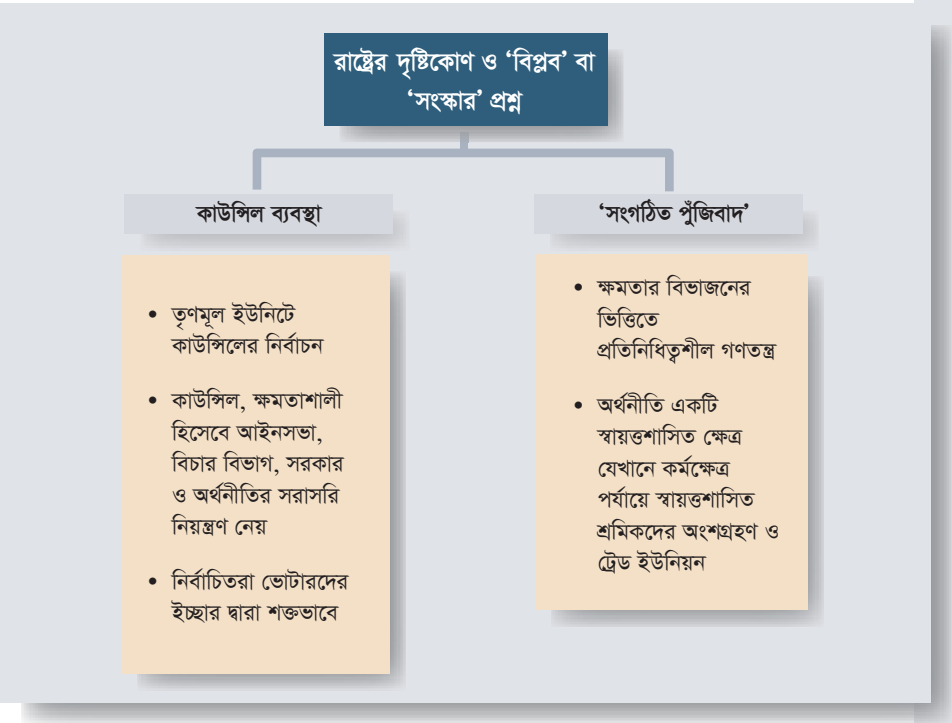

চিত্র ৬: কাউন্সিল ব্যবস্থা ও 'সংগঠিত পুঁজিবাদ'

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ধারণা

এসপিডি'র উপস্থাপিত 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের' ধারণা সংসদীয় গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিভাজনের পক্ষে প্রচারণা শুরু করে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের স্বার্থ ও সাধারণ কল্যাণের জন্য গণতন্ত্রায়ণ অর্জন করতে হবে। প্রেক্ষাপটে 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র' অর্থ ছিল একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি (শক্তিশালী শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব - ট্রেড ইউনিয়ন, কর্ম ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে অংশগ্রহণ) এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে জটিল ও সহায়ক মিথষ্ক্রিয়া।

গোডেসবার্গ কর্মসূচি ১৯৫৯: 'যতদূর সম্ভব প্রতিযোগিতা - যতদূর প্রয়োজন পরিকল্পনা!'

১৯৫৯ সালে জার্মানিতে এসপিডি'র গোডেসবার্গ কর্মসূচি 'মুক্ত বাজারের' জন্য মৌলিক সোশাল ডেমোক্র্যাটিক সূত্র নিয়ে আসল - 'যতদূর সম্ভব প্রতিযোগিতা - যতদূর প্রয়োজন পরিকল্পনা!' (ডাউই/ ক্লোজবাখ ২০০৪: ৩৩২)। এখানে যে অবস্থানটি নেওয়া হয়েছিল তা 'নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার' চেয়ে 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের' ওপর বেশি জোর দেয়। কিন্তু একইসাথে এটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অধীনে একটি মোটামুটি নিয়ন্ত্রিত বাজার পুঁজিবাদ মেনে নেয়। একইসাথে সোশাল ডেমোক্র্যাটরা একটি পরিকল্পিত অর্থনীতির ধারণা পরিত্যাগ করে যেহেতু তা সোভিয়েত ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছিল।

৩.৪.৩ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র বনাম রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র

মার্ক্সিজম থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পরিচালিত এসপিডি ও রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক ধারণার পার্থক্য আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। ১৯৫৯ সালের গোডেসবার্গ কর্মসূচির মাধ্যমে এসপিডি একটি বৈশ্বিক ধারণা হিসেবে (যদিও এর সব বিশ্লেষণ থেকে নয়) মার্ক্সিজম থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর এভাবে একটি 'স্বাভাবিক প্রয়োজন' হিসেবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ধারণা থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরিবর্তে সমাজতন্ত্রকে বর্ণনা করা হয় একটি 'স্থায়ী কাজ' হিসেবে, যা বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় ও দার্শনিক উদ্দেশ্য দিয়ে ন্যায্য প্রমাণ করা যায়। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞার কেন্দ্রে ছিল তিনটি চেতনা: 'স্বাধীনতা, ন্যায্যতা ও একতা'। এই তিনটি কেন্দ্রীয় চেতনা থেকে সোশাল ডেমোক্র্যাটরা মৌলিক চাহিদা বের করে নিয়ে আসে, যেমন স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ওপর পরিষ্কার বিশ্বাসের ঘোষণা:

> *'স্বাধীনতা ছাড়া কোনো সমাজতন্ত্র থাকতে পারে না। সমাজতন্ত্র অর্জন হতে পারে শুধু গণতন্ত্রের মাধ্যমে। গণতন্ত্র পুরোপুরি বাস্তবায়িত হতে পারে শুধু সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে।'* (সোশালিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নীতির ঘোষণা, ফ্রাংফুর্ট আম মেইন, ১৯৫১, উদ্ধৃত ডাউই/ ক্লোজবাখ ২০০৪: ২৬৯)

স্বাধীনতার এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র সুনির্দিষ্টভাবেই টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্র, এবং বিশেষ করে পূর্ব ব্লকের তথাকথিত 'জনগণের গণতন্ত্র' থেকে নিজেকে আলাদা করে ফেলে।

৩.৪.৪ বর্তমানের এসপিডি - নতুন সংকট/ চ্যালেঞ্জ, নতুন উত্তর

রূপকল্প হিসেবে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র- কর্মের নীতি হিসেবে সামাজিক গণতন্ত্র

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী রাষ্ট্র ও সমাজের কার্যক্রম নিয়ে কৌশলগত বিতর্কের সূত্রপাত করে। 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র' এখনো এসপিডি'র একটি বিশেষ রূপকল্প, যার বাস্তবায়নে এটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা এমন একটি সমাজের কথা বলছি যেখানে স্বাধীনতা, সমতা ও একতা আসলেই বিরাজমান। হামবুর্গ কর্মসূচি অনুযায়ী এসপিডি'র কার্যক্রমের নীতি হচ্ছে 'সামাজিক গণতন্ত্র'। এটি দলকে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র অর্জনের কাছে নিয়ে আসে যা সম্ভব হতে পারে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মূল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে।

'আমাদের ইতিহাস গঠিত হয়েছে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র দ্বারা, মুক্ত ও সমান মানুষের সমাজ যেখানে আমাদের মূল চেতনাগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন অর্থনীতি, রাষ্ট্র ও সমাজের বিন্যাস যেখানে মৌলিক নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সবার জন্যই নিশ্চিত, আর যেখানে সবাই শোষণ, নিপীড়ন ও সহিংসতা থেকে মুক্ত, আর কাজেই সামাজিক ও মানবিক নিরাপত্তার মধ্যে জীবন যাপন করতে পারে ... গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র আমাদের একতার মধ্যে একটি মুক্ত ও ন্যায্য সমাজের রূপকল্প দেয়। এর বাস্তবায়ন আমাদের জন্য স্থায়ী একটি কাজ। আমাদের কর্মকাণ্ডের নীতি হচ্ছে 'সামাজিক গণতন্ত্র'। (হামবুর্গ কর্মসূচি ২০০৭: ১৬ছ)

বিস্তৃত বাজার-বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে সামাজিক গণতন্ত্র এখন যে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে তার মধ্যে রয়েছে আর্থিক বাজার ও শ্রম বাজারে রাতারাতি পরিবর্তনের প্রভাবের প্রতিক্রিয়া জানানো আর কিভাবে বাজার পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের ভারসাম্য ভাবা যায় তা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। অন্য কথায়, এই পরিস্থিতিতে কিভাবে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র অর্জন করা যায় সেটি হচ্ছে প্রশ্ন। তবে এসপিডি'র হামবুর্গ কর্মসূচি এটি পরিষ্কার করে দেয় যে কেবলমাত্র নতুন প্রশ্নই নয়, বরং প্রথম উত্তরগুলোও উত্থাপিত হয়েছে (আরও দেখুন অধ্যায় ৬)।

হামবুর্গ কর্মসূচিতে রাজনৈতিক প্রাধান্যের মধ্য দিয়ে সমন্বিত অর্থনীতি ও প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের পরিসমাপ্তির কথাও বলা হয়েছে, তবে তা ইউরোপীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে ভবিষ্যতের একটি চাহিদা হিসেবে:

'বিশ্বায়ন ও জাতীয় সীমান্তের বেড়াজাল পার হওয়ার যুগে বাজার রাজনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের মতবাদ হচ্ছে: যতদূর সম্ভব প্রতিযোগিতা আর রাষ্ট্রের দিক থেকে যতটুকু নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।' (হামবুর্গ কর্মসূচি ২০০৭: ৪৩)

সামাজিক গণতন্ত্র, উদারনৈতিকতাবাদ ও রক্ষণশীলতাবাদের একটি নিবিড় পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে এরা হচ্ছে প্রকৃত বিকল্প। আর রাজনৈতিক দলীয় কর্মসূচি বর্তমানে প্রায়ই আলাদা করা যায় না বলে যে দাবি করা হয় তা আদতে সত্য নয়।

৩.৪.৫ বিপথে গমণ: 'ডাই লিংকে' আর এর অসংগতি

'ডাই লিংকে'

১৯৯০ সালের ঘটনাচক্র আরেকটি বামপন্থী দলের উদ্ভব ঘটায়। পিডিএস (Party of Democratic Socialism), যা ছিল পূর্ব জার্মানির প্রথম, তা ছিল এসইডি'র (East Germany's Socialist Party) থেকে উদ্ভূত একটি প্রতিষ্ঠান। পরবর্তীতে এই দলটি ডব্লিউএএসজি'র (Labour and Social Justice Alternative) সাথে মিলিত হয়ে একটি দল গঠন করে যা 'ডাই লিংকে' বা 'বাম' নামে পরিচিত, যা কয়েকটি পশ্চিম জার্মান প্রদেশে শক্তিশালী অবস্থানে আছে।

প্রকৃতপক্ষে 'ডাই লিংকে' কী বিষয়ে তা নির্দেশ করা খুবই কঠিন - এটি এখনো অস্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। যেমন, ২০০৭ সালে দলটি একগুচ্ছ 'মূল কর্মসূচিভিত্তিক বিষয়ে' সম্মত হয়, কিন্তু প্রচলিত অর্থে কোনো দলীয় কর্মসূচিতে সম্মত হয় নি। এর 'মূল কর্মসূচির বিষয়ে' ডাই লিংকে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রতি এর সমর্থন ঘোষণা করে।

'আমাদের মূল চেতনা হচ্ছে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সমতা, ন্যায্যতা, আন্তর্জাতিকতা ও একতা। এগুলো শান্তি, পরিবেশের সুরক্ষা ও দাসত্বের বন্ধন মোচনের সাথে অবিচ্ছেদ্য। বামদের রাজনৈতিক লক্ষ্যের উন্নয়নে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ধারণা মূল দিক-নির্দেশক। ডাই লিংকে এর মূল চেতনার লক্ষ্য ও পথের মধ্যকার সম্পর্কের মধ্য থেকে এর রাজনৈতিক কর্মপন্থা বের করে নেয়। স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায্যতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র একে অপরের পরিপূরক। ব্যক্তিস্বাধীনতা ছাড়া সমতার পরিণতি অসামর্থ্য আর অরাজকতা। সমতা ছাড়া স্বাধীনতা হচ্ছে শুধু ধনীদের জন্য স্বাধীনতা। যারা তাদের সতীর্থ মানুষদের নিপীড়ন করে তারাও স্বাধীন নয়। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য (যা একটি পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ থেকে বের হতে চায়) হচ্ছে একটি সমাজ যেখানে অন্যের স্বাধীনতা কোনো সীমা নয় বরং তার স্বাধীনতার একটি শর্ত।'

('মূল কর্মসূচিভিত্তিক বিষয়', ডাই লিংকে ২০০৭: ২)

ডাই লিংকে ও এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এই মূল বিষয়গুলো ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় যোগ করা যেতে পারে:

- ডাই লিংকে একটি বহু-উপাদান-নির্ভর রাজনৈতিক আন্দোলন যা পূর্বতন এসডিই ক্যাডার, হতাশ প্রাক্তন সোশাল ডেমোক্র্যাট, নতুন সামাজিক আন্দোলনের কিছু অংশ,

ট্রেড ইউনিয়নবাদী, বিরোধী, বিরোধী ভোটার, প্রগতিশীল স্থানীয় রাজনীতিক, বামপন্থী ও অন্যান্যদের একত্রিত করে। এসব গোষ্ঠী সমাজের ওপর ভিন্ন ভিন্ন ধারণা দলে নিয়ে আসে যার ফলে একটি স্থির ধারণাসূচক মডেল বা অবস্থান (এখনো) আলাদা করা যায় না।

- ডাই লিংকে'কে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বর্ণনা করা হয় একটি প্রতিবাদী দল হিসেবে। এটি একেবারেই একটি অনির্দিষ্ট বর্ণনা, যেহেতু দুটি ভিন্ন মত এখানে সংক্ষিপ্তভাবে বোঝা যায়। প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে ডাই লিংকে'র ভোটার কারা? এটি পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির ক্ষেত্রে এখনো ব্যাপকভাবে ভিন্ন। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে এটি কী ধরনের রাজনৈতিক কৌশলের জন্য কী ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম হাতে নিতে চায়? এখানেও ফেডারেল প্রদেশ ও ফেডারেল সরকারের ক্ষেত্রে ফলাফল ভিন্ন।
- এই দলের সাথে যাদের সম্পর্ক রয়েছে তাদের যেসব একাডেমিক প্রকাশনা হয়েছে, সেখানে ডাই লিংকে'কে শুধু চরম ভিন্ন মতাবলম্বী হিসেবেই নয়, বরং উল্লেখযোগ্যভাবে অধারাবাহিক হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, একদিকে দলটি নিজেদের প্রগতিশীল, আধুনিক ও মধ্যম মানের দাবি করে, অন্যদিকে এটি রক্ষণশীল ভাবধারা ও প্রায় চরমভাবাপন্ন বৈশিষ্ট্যের ধারক (ডেকার ও অন্যান্য ২০০৭: ৩২৭)। একদিকে এর চরম উদ্দেশ্যের ঘোষণা, আর অন্যদিকে বিভিন্ন প্রাদেশিক সংসদে প্রগতিশীল নীতির মধ্যে রয়েছে সবচেয়ে বড় অসংগতি, যা মাঝে মাঝে তার উদ্দেশ্যের বিপরীত।

ডাই লিংকের অস্তিত্বের সাপেক্ষে প্রশ্ন এটি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, বা আদৌ প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা। সব ধরনের কার্যক্রমেই এর রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক উঠবেই।

৩.৪.৬ মানবতার সামাজিক গণতান্ত্রিক ধারণা

'মানবতার সামাজিক গণতান্ত্রিক ধারণা'র ওপর বিভিন্ন উৎসের মিলন

মানবতার একটি নির্দিষ্ট সামাজিক গণতান্ত্রিক ধারণা কিছুটা ধোঁয়াটে। বরং এটি বিভিন্ন উৎস থেকে ধার নেয় আর সেজন্য এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহু ধারণার মিলন। এখানে বিভিন্ন ধারণার পুনরাবৃত্তি রয়েছে, যেমন শ্রমিক আন্দোলনের ধারা, উদারনৈতিক তত্ত্ব ও খ্রিস্টীয় ও জুডাইজম মতবাদ, মানবতাবাদী ও মার্ক্সীয় প্রভাব। এটি ব্যক্তির স্বাধীনতার কথা বলে (উদারনীতিকদের মতে), কিন্তু আবার মার্ক্সবাদীদের মত মৌলিক অধিকার খর্ব হওয়ার পেছনে সামাজিক বাধার কথাও বলে।

মেয়ার ও ব্রেয়ার তাদের বই দ্য ফিউচার অব সোশাল ডেমোক্র্যাসি'তে মানবতার উদারনীতিক ('নব্য উদারনীতিক') ধারণার সাথে সামাজিক গণতন্ত্রের ধারণার পার্থক্য করার প্রয়াস করেছেন। এক্ষেত্রে আমরা 'মানবতার সমাজতান্ত্রিক' ধারণার ওপর একটি কলামও যুক্ত করেছি।

	উদারনৈতিক গণতন্ত্র	সামাজিক গণতন্ত্র	সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র
নৃবিজ্ঞান	সামাজিক নৃবিজ্ঞান	বস্তুবাদী নৃবিজ্ঞান	আদর্শিক, ইউটোপিয়ান নৃবিজ্ঞান
স্বাধীনতার ধারণা	নেতিবাচক	ইতিবাচক	ইতিবাচক
আচরণগত তাড়না	নিজ স্বার্থ	নিজস্ব ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ	নিজ স্বার্থ হিসেবে গোষ্ঠীগত স্বার্থ
মানবতার ধারণা	যৌক্তিকভাবে হিসাবকারী অহমিকাবাদী/ স্বার্থপর	পুনর্মিলন ধারার প্রতি ঝোঁক	সামরিকায়ন ও ভবিষ্যৎ 'নতুন মানুষ' ধারার প্রতি ঝোঁক

উৎস: মেয়ার/ ব্রেয়ার ২০০৫: ৩৩ - শেষ কলাম টি. গোম্বার্ট দ্বারা তৈরি।

যদিও এই সারণি বিষয়গুলোকে সরলভাবে উপস্থাপন করেছে, এটি বিভিন্ন প্রবণতার প্রতি নির্দেশ করে:

- নিয়মতান্ত্রিকভাবেই উদারনৈতিক তত্ত্ব বলে যে শুধু 'নিজ স্বার্থ'ই মানুষকে চালিত করে। এই নিজ স্বার্থ বাস্তবায়িত হবে যদি এটি অন্যদের থেকে সুরক্ষা পায় (এবং রাষ্ট্র) যার উদ্দেশ্য সবার জন্য 'স্বাধীনতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের' জন্য পরিসর তৈরি করা।
- সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের একটি ঐতিহ্য হচ্ছে এমন একটি সমাজের অর্জন যা 'নতুন মানুষের' মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে (অ্যাডলার ১৯২৬ ও হাইনরিখ ২০০২: ৩০৮-১৪)। এই মত অনুসারে ঐতিহাসিকভাবে মানুষ পুঁজিবাদী সমাজ ও সামাজিক অসমতার দ্বারা এমনভাবে কলুষিত হয়ে গেছে যে তাদের গোষ্ঠীগত স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থ হিসেবে ভাবতে পারা এবং একে অন্যকে ঐক্যের সাথে সহায়তা করা হারিয়ে গেছে। এই অসংগতি দূর করার দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষা ও (যৌথ) লালন-পালনের যেন সমাজের জীবনের পরিস্থিতি ও মুক্ত ও একতাবদ্ধ মানুষের ব্যবধান ঘোচানো যায়।
- মেয়ার ও ব্রেয়ার যেভাবে বলেন, মানবতার একটি সামাজিক গণতান্ত্রিক ধারণা নিজ স্বার্থ ও সাধারণ কল্যাণ বিবেচনায় নিয়ে একটি ভারসাম্য আনার চেষ্টা করে। অন্য কথায় এই ধারণা হচ্ছে 'ন্যায্য স্বার্থে'র মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা।

আরো জানতে পড়ুন-

ওয়ালটার ইউকনার, হেলগা গ্রেবিং এথ আল (২০০৫), গেসশিকটে ডার সোজিয়ালেন ইডিন ইন ডিউটসল্যান্ড, সোজিয়ালিসমাস-ক্যাথলিশে সোজিয়াললেরে-প্রোটেসট্যানটিশ সোজিয়ালেটিক, ইয়ান হ্যান্ডবুশ, সেকেন্ড এডিশন, উইজবাডেন, পৃষ্ঠা ১৩-৫৯৩।

থমাস মেয়ার অ্যান্ড নিকোল ব্রিয়ার (২০০৫), ডাই জুকুনফট ডার সোজিয়ালেন ডেমোক্রাটি, বন।

ডাইটার ডোঈ অ্যান্ড কার্ট ক্লটজবাক (সংকলিত) (২০০৪), প্রোগ্রামাটিশে ডকুমেনটে ডার ডিউটশচেন সোজিয়ালডেমোক্রাটি, চতুর্থ সংস্করণ ও হালনাগাদকৃত, বন।

৪. থমাস মেয়ার-এর সামাজিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব

এই অধ্যায়ে

- থমাস মেয়ার-এর সামাজিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে;
- বাজার পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের মধ্যকার কিছুটা দ্বান্দ্বিক ও কিছুটা পরস্পর-সহায়ক সম্পর্ক যাচাই করা হয়েছে;
- উদারনৈতিক (liberals), আপেক্ষিক উদারনৈতিক (libertarians) ও সামাজিক গণতন্ত্রবাদীদের (social democrats) মধ্যকার পার্থক্য আলোচিত হয়েছে;
- মূল নীতি, মৌলিক অধিকার ও ব্যবস্থা সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে;
- নেতিবাচক ও ইতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার পার্থক্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব আলোচনা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে মূল নীতি ও সমাজের বিভিন্ন মডেল/ কাঠামোর আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সামাজিক গণতন্ত্র একাধিক প্রথাগত ধারণা থেকে উদ্ভূত। এই ধারণা অন্যান্য মডেলের চেয়ে বেশ কিছুটা আলাদা এই অর্থে যে, এটি শুধু স্বাধীনতা, সমতা ও একতার মত মৌলিক চেতনার দিকে নির্দেশ করে না, যেভাবে একটি ন্যায্য সমাজ অর্জনের জন্য উদারনৈতিকতাবাদ, রক্ষণশীলতা ও সমাজতন্ত্র করে থাকে।

এই বইয়ের ভূমিকার শুরুতে সামাজিক গণতন্ত্রের তত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, "সামাজিক গণতন্ত্র" সাবধানতার সাথে সংজ্ঞায়িত করতে হবে যদি এটি নিয়ে কেউ বিতর্ক করতে চায়।

এই প্রেক্ষাপটে সামাজিক গণতন্ত্রের চারটি দিক উল্লেখ করা হয়েছিল, যার তিনটি এখানে সংক্ষেপে আবার দেখা হচ্ছে

- 'সামাজিক গণতন্ত্র - নাম দিয়েই কি বোঝা যাচ্ছে না?' গণতন্ত্রের ধারণার মধ্যেই নিহিত আছে যে সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে সাম্যের ভিত্তিতে এটি বিবেচনা করবে - এটি কি নিজেই ব্যাখ্যা দিচ্ছে না?
- 'সামাজিক গণতন্ত্র - সামাজিক বাজার মডেলের মাধ্যমে কি ইতোমধ্যে এটি জার্মানিতে বিদ্যমান নয়?'
- 'সামাজিক গণতন্ত্র - ইতোমধ্যে এসপিডি এটির দাবিদার আর কাজেই এটি শুধু সোশাল ডেমোক্র্যাটদেরই মাথাব্যাথা; এটি তাদের তত্ত্ব।'

বাস্তবভিত্তিক রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে তিনটি প্রশ্নই যথার্থ। সামাজিক গণতন্ত্রকে রাজনৈতিকভাবে বিবেচনা করতে হলে এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথম প্রশ্ন 'সামাজিক গণতন্ত্র - এটি কি স্ব-ব্যাখ্যাত নয়?' - এর উত্তর ইতোমধ্যে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সামাজিক গণতন্ত্রের একটি সঠিক বিবরণ দিতে হবে কারণ এই ধারণা এমন একগুচ্ছ সম্পর্কের সূত্রপাত করতে পারে যা শুধু একটি গোষ্ঠী হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। অবশ্যই এই ধারণাটির একটি আদর্শিক কেন্দ্র রয়েছে - অন্য কথায় যেসব সাধারণ নিয়ম ও আদর্শ সামাজিক গণতন্ত্র বাস্তবায়নে বিবেচনা করতে হয়। মূল নীতিগুলোর ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে, দার্শনিক বিতর্ক এদের শ্রেণি বিভাজনে অবদান রাখতে পারে, কিন্তু তা কোনো আদর্শিক অবস্থান প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়, যেহেতু একাধিক ও বিতর্কিত সংজ্ঞা এর সাথে জড়িত। কাজেই সামাজিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনার শুরুতে সুনির্দিষ্ট আদর্শিক ভিত্তি প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন 'সামাজিক গণতন্ত্র - ইতোমধ্যে এটি জার্মানিতে বিদ্যমান নয়?' - এর উত্তর বিভিন্ন দেশের কেস স্টাডির পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে (অধ্যায় ৫ দ্রষ্টব্য)। ইতোমধ্যে যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে তার ভিত্তিতে বর্তমানের সমাজ ও অর্থনীতির মডেলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সূত্রে বলা যায় সামাজিক গণতন্ত্র একবারেই অর্জন করার কোনো প্রশ্নই আসে না। উপরন্তু, সমাজের বিভিন্ন মডেল রয়েছে যেগুলোর দিকে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল নিজ নিজ স্বার্থ অনুযায়ী জনগণকে চালিত করতে চায়। কাজেই কোনো একটিকে 'জার্মান মডেল' বা 'সামাজিক বাজার অর্থনীতি' বলা যাবে না, কারণ যেকোনো একটি মডেল অন্যান্য সামাজিক রাজনৈতিক ক্রীড়নকদের বাইরে রেখে দেয়।

তৃতীয় প্রশ্ন 'সামাজিক গণতন্ত্র - ইতোমধ্যে এসপিডি এটির দাবিদার আর কাজেই এটি শুধু সোশাল ডেমোক্র্যাটদেরই মাথাব্যাথা; এটি তাদের তত্ত্ব'-এর কোনো ভিত্তিই নেই।

একটি দল ও রাজনৈতিক প্রবণতা হিসেবে 'সামাজিক গণতন্ত্রের' উল্লেখ করা খুবই স্বাভাবিক, তবে তা সম্পূর্ণ হওয়ার থেকেও অনেক দূরে।

'সমসাময়িক ব্যবহার অনুযায়ী 'সামাজিক গণতন্ত্র' একইসাথে গণতন্ত্রের তত্ত্বের একটি মৌলিক ধারণা এবং একটি রাজনৈতিক কর্মসূচির বৈশিষ্ট্যসূচক নাম। যদিও এই দুটি ব্যবহার বিভিন্নভাবেই পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত, যারা ভিন্ন ধরনের যথার্থতার দাবিসহ দুটি ভিন্ন কর্মসূচির নির্দেশ করে। সামাজিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব, এর আদর্শিক ভিত্তি, বা এর ব্যাখ্যাদানকারী ভূমিকা, বা এমনকি এর প্রয়োগের বিভিন্ন উপায় নিয়ে তুলনামূলক আলোচনায় কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ক্রীড়নকের সাথে সম্পর্কিত নয়, যদিও এর প্রয়োগের প্রতিটি পদক্ষেপেই রাজনৈতিক ক্রীড়নকদের সহায়তার প্রয়োজন যা তারা এখান থেকে উদ্ভূত বাস্তব কর্মসূচি থেকে নিয়ে থাকে। অন্যদিকে বিভিন্ন ঘরানার রাজনৈতিক ক্রীড়নক সামাজিক গণতন্ত্রের ধারণাকে একটি কর্মসূচি হিসেবে ব্যবহার করে যদি তারা মনে করে এটি তাদের স্বার্থ উদ্ধার করবে। এটি আদৌ সামাজিক তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা বা এর সাথে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তার ওপর নির্ভরশীল নয়।' (মেয়ার, ২০০৫: ১২)

কাজেই একটি তাত্ত্বিক মডেল হিসেবে সামাজিক গণতন্ত্র আর রাজনৈতিক দল বা প্রবণতা হিসেবে সামাজিক গণতন্ত্র বিভিন্ন পর্যায়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়। কিন্তু তারা এক নয় বা একই নয়। একটি তাত্ত্বিক মডেল হিসেবে সামাজিক গণতন্ত্রকে অবশ্যই আদর্শ ও মূল্যবোধকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরীক্ষা করতে হবে, মৌলিক অধিকারের ওপর তার প্রয়োগ এবং বিভিন্ন দেশে এদের বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে এবং ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো এসব ধারণা গ্রহণ করবে কিনা তা অন্য প্রশ্ন।

পরবর্তী অংশে সামাজিক গণতন্ত্রকে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ধারণা হিসেবে বিবেচনা না করে বরং একটি ধারণাগত মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হবে যা ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশক থেকে নানা বিতর্কের মাধ্যমে বিবর্তিত হয়েছে।

শুরুর দিকে আমরা থমাস মেয়ার উপস্থাপিত সামাজিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব, যেখানে সামাজিক গণতন্ত্রের বিভিন্ন বিতর্কের মাধ্যমে যে কাঠামো তৈরি হয়েছে তার বিভিন্ন অবস্থান যুক্ত হয়েছে।

৪.১ শুরুর বিষয়

শুরুর প্রশ্ন: গণতন্ত্র ও বাজার পুঁজিবাদের সম্পর্ক কী?

মেয়ার-এর সামাজিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব শুরুর জন্য যে প্রশ্নটি যা ইতোমধ্যে উত্থাপিত হয়েছে তা হচ্ছে গণতন্ত্র ও বাজার পুঁজিবাদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে। গণতন্ত্র ও বাজার পুঁজিবাদ উভয়কে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নেওয়া হয়, যেগুলো একদিক থেকে ভাবলে পরস্পরবিরোধী হিসেবে গড়ে উঠেছে।

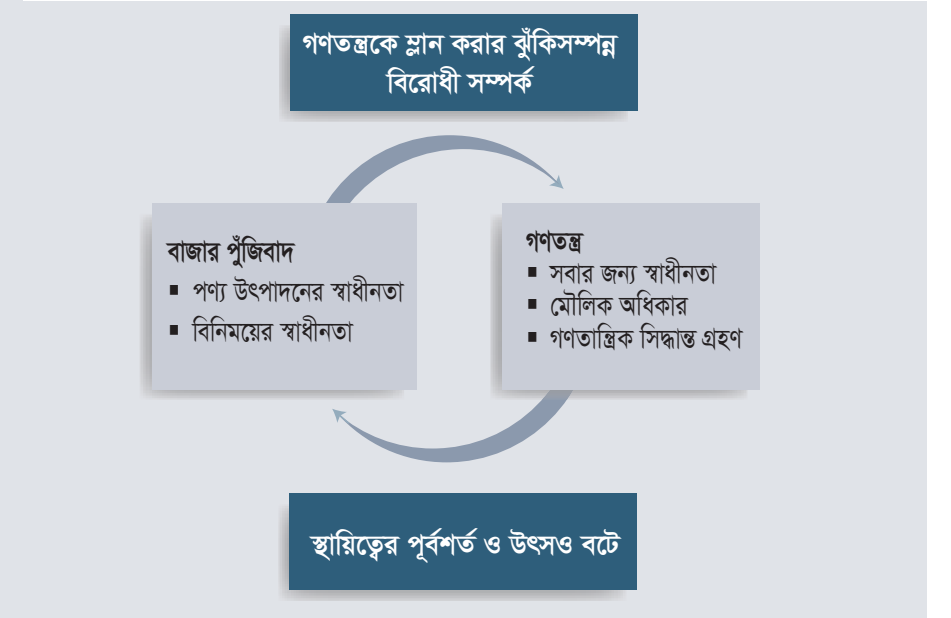

চিত্র ৭: বাজার পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক

অনিশ্চয়তার উদ্ভবের শর্ত ও কারণ? বাজার পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক কী?

মেয়ার দাবি করেন যে পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র একদিকে একে অপরের পরিপূরক। এভাবে গণতন্ত্রের উদ্ভব ও স্থায়িত্বের একটি শর্ত হচ্ছে বাজার পুঁজিবাদ। অন্যদিকে, তিনি এদের মধ্যে একটি 'কৌতুহলোদ্দীপক দ্বন্দ্বের' ওপর জোর দেন কারণ সবার অংশগ্রহণের জন্য যে প্রয়োজনীয় শর্ত রয়েছে তার সাথে অনিয়ন্ত্রিত বাজার সংগতিপূর্ণ নয়।

মেয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের সম্পর্ককে দুটি তত্ত্বের প্রেক্ষিতে বর্ণনা করেন। একদিকে তিনি ইতিহাসের ভিত্তিতে গণতন্ত্রের শর্ত বিশ্লেষণ করেন, আর অন্যদিকে বর্তমান সমাজে গণতন্ত্র ও বাজার অর্থনীতির মিথস্ক্রিয়া বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে অনুসন্ধান করেন। এই দুটি তত্ত্ব প্রথমত স্বয়ংসিদ্ধ নয় - অনেকখানি তাত্ত্বিক কিন্তু রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিতও। মেয়ার কেন এই দুটি তত্ত্বের দিকে ঝুঁকলেন?

৪.১.১ ঐতিহাসিক যুক্তি

প্রথমত আমরা একটি ঐতিহাসিক বিতর্ক নিয়ে কাজ করছি। মেয়ারের যুক্তি হচ্ছে, ঐতিহাসিকভাবেই প্রধানত মুক্ত বাজারের সাথে সাথে বা সরাসরি সম্পর্কিত হয়ে গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। ইউরোপে এটি ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে আর অন্যান্য দেশে ঘটেছে 'বুর্জোয়া সমাজের' রূপ ধরে।

'বুর্জোয়া সমাজ বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি মডেল। স্বৈরতন্ত্র, জন্ম ইতিহাসের সুবিধা ও ধর্মীয় সমর্থন থেকে মুক্ত হয়ে এর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল সবার জন্য আইনগতভাবে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার নীতির বাস্তবায়ন করা। এটি যুক্তিসংগতভাবে মানুষের বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দিয়েছিল। এটি আইনি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনীতিকে সংগঠিত করেছিল। যৌক্তিকভাবে মানুষের জীবনে সুযোগের নিশ্চয়তা দিয়েছিল। একইসাথে আইনের শাসনের ভিত্তিতে উদারনৈতিক রাষ্ট্রের চেতনায় এটি রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেছিল, আর জনগণের মতামতের মাধ্যমে নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান 'রাজনৈতিকভাবে সাবালক নাগরিকদের' ইচ্ছার সাথে সংগতি রেখে এর শাসন জারি রেখেছিল। (কোকা ১৯৯৫: ২৩)

মুক্তবাজার, শিল্পপতি বুর্জোয়া, নাগরিক অধিকারের ধারণা, এবং স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রের দ্বারা অনুমোদন পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে - ঐতিহাসিকভাবে এগুলোর সবই অবিচ্ছেদ্য।

৪.১.২ গণতন্ত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে যৌক্তিকতা

গণতন্ত্রের স্থায়িত্বের ওপর গবেষণার ভিত্তিতে যৌক্তিকতা

মেয়ারের তত্ত্ব অনেক বাস্তবভিত্তিক গবেষণা যেগুলো গণতন্ত্রের স্থায়িত্বের কাঠামোর ওপর করা হয়েছে, তার দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।

পরিবর্তনের (transformation) গবেষণার বাস্তবভিত্তিক ফলাফল থেকে দেখা যায়, উদীয়মান গণতন্ত্রের ওপর মুক্তবাজার অর্থনীতির অবশ্যই ইতিবাচক স্থায়ী প্রভাব রয়েছে। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর ওপর এসব গবেষণা করা হয়েছে। তবে এর উল্টোদিকেও বাস্তবভিত্তিক প্রমাণ রয়েছে, যেখানে অর্থনৈতিক ক্ষমতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে আর কিছু একচেটিয়া ব্যবসায়ী ও গোষ্ঠীর সুবিধার জন্য গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়। এ ধরনের পরিস্থিতি অর্থহীন ও খুব বেশি হলে আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের পথ নির্দেশ করে।

এটি সামাজিক গণতন্ত্রের যেকোনো তত্ত্বের প্রয়োজন যে শুধু একটি রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক সংগঠন দেখার জন্যই নয়, বরং গণতান্ত্রিক কাঠামো আর মৌলিক অধিকার আসলেই সবার দ্বারা বর্ধিত হতে পারে কিনা তা বাস্তব উদাহরণ দিয়ে পরীক্ষা করার জন্যও - তা নির্দেশ করে।

সার্বিকভাবে মেয়ার বলেন যে, মুক্তবাজার অর্থনীতি গণতন্ত্রকে সহায়তা করতে পারে। (ডাল ২০০০: ১৪০; মেয়ার ২০০৫: ৫৮১)

গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে কৌতুহলোদ্দীপক দ্বন্দ্ব

নিশ্চিতভাবেই মেয়ার গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যকার সম্পর্ককে 'সহজ' বা জটিল নয় বলে বিবেচনা করেন নি। যে অসংগতি আমরা ইতোমধ্যে মোকাবেলা করেছি তা এই সম্পর্ককেই প্রশ্নের মুখে ফেলে। কাজেই বর্তমানের বিতর্ককে পরিষ্কারভাবেই এর ঐতিহাসিক উৎস থেকে আলাদা করতে হবে।

যেখানে বাজার পুঁজিবাদ সমাজের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িত

- বাজার পুঁজিবাদ (অর্থনৈতিক) অসমতার দিকে নিয়ে যায়;
- বস্তুগত সম্পদের অসম বণ্টন সমাজ ও গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের জন্য সুযোগের অসম বণ্টনের দিকে নিয়ে যায়;
- বাজার পুঁজিবাদ ক্রমাগতভাবে বৈশ্বিক পর্যায়ে কাজ করছে, যেখানে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ এখনো জাতীয় পর্যায়ে বিরাজমান। এভাবে একক রাষ্ট্রগুলোতে বাজার পুঁজিবাদ গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ব্যাহত করছে।

বাজার পুঁজিবাদ কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) বল ধারণ করে যা অসমতা ও অনিশ্চয়তা বাড়ায়, যার সম্ভাব্য ফলাফল হচ্ছে গণতান্ত্রিক বৈধতার ভিত্তি ও স্থিতিশীলতার ব্যাহত হওয়া।

এটি নিয়ে কোনো প্রশ্নই নেই যে বাজারের স্বাধীনতা আর সমাজের সব ব্যক্তির স্বাধীনতা পরস্পরের বিরোধী।

মেয়ারের মতে বাজার পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে।

এই চিত্তাকর্ষক দ্বন্দ্ব সহজভাবে শেষ করা যায় না বা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু শুধু নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এটিই হচ্ছে মেয়ারের ঐতিহাসিক ও প্রায়োগিক গবেষণার সারাংশ।

উদারনৈতিকতাবাদ ও সামাজিক গণতন্ত্রের বিভিন্ন ধারণাপ্রসূত মডেলের সূত্র ধরে বলা যায় যে শুধু স্বাধীনতার চাহিদা অস্বীকার করা (যা ঐতিহাসিকভাবেই উদারনৈতিক ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত) একজন ব্যক্তিকে নব্য উদারনৈতিকতার বিরুদ্ধে নিন্দার অনুমতি দেওয়ার মতই মারাত্মক হতে পারে। কাজেই উদারনৈতিকতাবাদ ও সামাজিক গণতন্ত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও সাবধানী দৃষ্টি দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই সূত্রে মেয়ার তাঁর তত্ত্বে উদারনৈতিক তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত দুটি 'আদর্শিক ধরনের' পার্থক্য তুলে ধরেন: আপেক্ষিক উদারনীতি ও সামাজিক গণতন্ত্র।

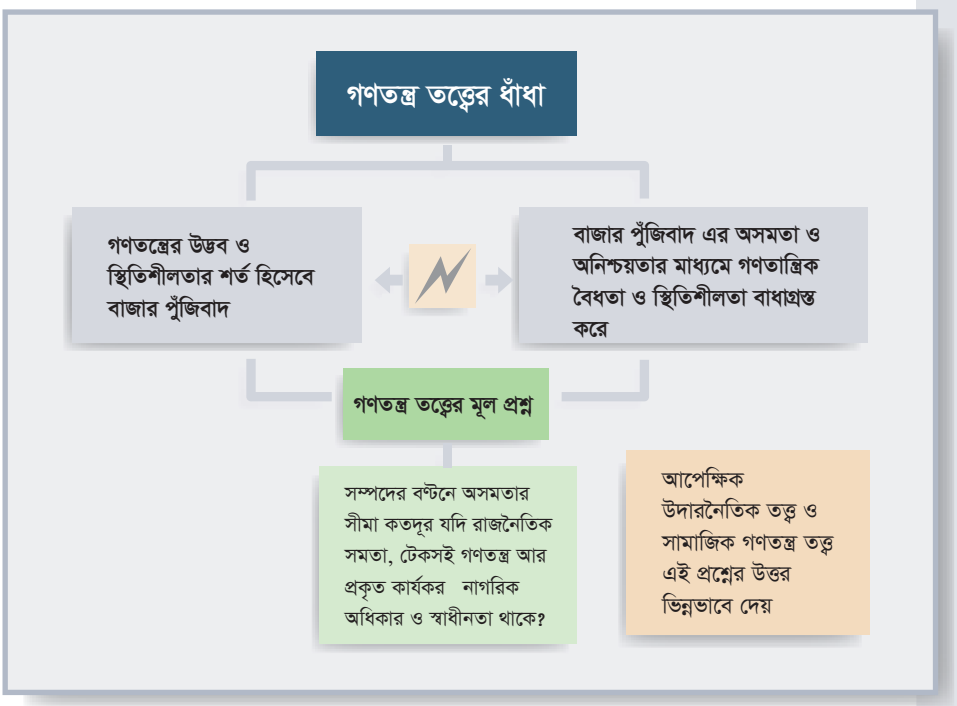

চিত্র ৮: গণতন্ত্র তত্ত্বের ধাঁধা

৪.২ আপেক্ষিক উদারনৈতিকতাবাদ বনাম সামাজিক গণতন্ত্র

সামাজিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব আদর্শিকভাবে, তত্ত্বীয়ভাবে ও অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে আপেক্ষিক উদারনৈতিকতাবাদের চেয়ে ভিন্ন। উভয় মতবাদই উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ধারণা থেকে উৎসারিত যা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের আলোকায়নের সময় থেকে বিকশিত হয়েছে।

অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা 'আপেক্ষিক উদারনৈতিকতাবাদ' ও 'উদারনৈতিক গণতন্ত্রের' ধারণা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। কাজেই এদের সুনির্দিষ্ট ও সাধারণ সংজ্ঞা এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

এ বিষয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আপেক্ষিক উদারনৈতিকতাবাদ ও সামাজিক গণতন্ত্র উভয়ই হচ্ছে আদর্শিক ধারণা - শুদ্ধ অবস্থায় যাদের কোথাও পাওয়া যায় না। বরং আপেক্ষিক উদারনৈতিকতাবাদ ও সামাজিক গণতন্ত্র এমন দুটি মেরুতে সংজ্ঞায়িত করা হয় যার মধ্যে থেকেই বিভিন্ন সমাজকে তাদের গঠনের ওপর নির্ভর করে শ্রেণি বিভাজন করা যায়।

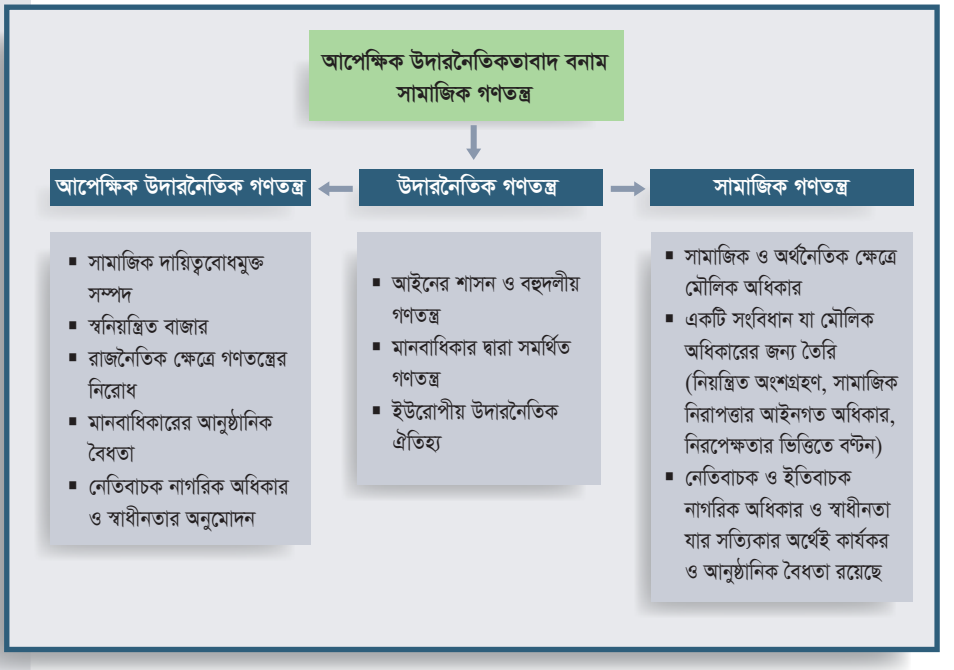

চিত্র ৯: উদারনৈতিক, আপেক্ষিক উদারনৈতিক এবং সামাজিক গণতন্ত্রের তুলনা

- উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মূল ইউরোপীয় উদারনৈতিকতার ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত (অধ্যায় ২.১ দ্রষ্টব্য);
- আর আইনের শাসনের অধীনে বহুদলীয় গণতন্ত্রের সাথে জড়িত;
- যা মানবাধিকারের ওপর ভিত্তি করে গঠিত।

উদারনৈতিক গণতন্ত্র

আপেক্ষিক উদারনৈতিক গণতন্ত্র[২০], একটি আদর্শিক ধারণাগত মডেল হিসেবে এতে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে:

আপেক্ষিক উদারনৈতিক গণতন্ত্র

- সামাজিক দায়িত্ববোধমুক্ত সম্পদ;
- একটি স্বনিয়ন্ত্রিত বাজার;
- রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের নিরোধ;
- মানবাধিকারের আনুষ্ঠানিক বৈধতা;
- নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার অনুমোদন।

এর বিপরীতে, সামাজিক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

সামাজিক গণতন্ত্র

- সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার;
- একটি সংবিধান যা মৌলিক অধিকারের জন্য তৈরি (নিয়ন্ত্রিত অংশগ্রহণ, সামাজিক নিরাপত্তার আইনগত অধিকার, নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে বণ্টন);
- নেতিবাচক ও ইতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা যার সত্যিকার অর্থেই কার্যকর ও আনুষ্ঠানিক বৈধতা রয়েছে।

কারা সংশ্লিষ্ট ক্রীড়নক?

কাজেই মেয়ার আদর্শিক ধরনের আপেক্ষিক উদারনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্রের মধ্যে তাত্ত্বিক পার্থক্য তুলে ধরেন যা সত্যিকার অর্থে ব্যক্তিগত প্রবণতা ও দলের রাজনৈতিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে উদাহরণ হিসেবে দেওয়া যেতে পারে। তবে ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দলগুলো যে পুরোপুরি এসব ধারণা প্রয়োগ করে তা বলা যাবে না।

গণতন্ত্র ও বাজার পুঁজিবাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব কোনো স্থায়ী ব্যবস্থার কারণে নয়, বরং বিভিন্ন সামাজিক ক্রীড়নকের মধ্যে দর-কষাকষির মাধ্যমে উদ্ভব হয়। যেকোনো দেশে সময়ে সময়ে গণতন্ত্র ও বাজার পুঁজিবাদের মধ্যকার সম্পর্ক ভিন্ন হয়ে যেতে পারে যা ঐ দেশের বাজার পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের মধ্যে নতুন সম্পর্কের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

উদাহরণ: জার্মান মৌলিক আইনের ওপর দর-কষাকষি

বাজার পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের মধ্যকার দ্বন্দ্বপূর্ণ ও কোনোভাবেই সরল সম্পর্ক নয় এমন একটি উদাহরণ দেওয়া যায় জার্মান মৌলিক আইন ও জাতিসংঘের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক দলিলের সাথে সম্পর্কের তুলনার ভিত্তিতে (অধ্যায় ৪.৩ দ্রষ্টব্য)।

[২০] দেখা যায়, 'আপেক্ষিক উদারনৈতিকতাবাদ' নব্য উদারনৈতিকতাবাদের সাথে অনেকখানি মিলে যায়। এই নতুন ধারণা প্রচলনের পেছনে মেয়ারের মূল যুক্তি ছিল যে ঐতিহাসিক উদারনৈতিকতাবাদের মূল ধারণা নতুন উদারনৈতিক রিডাকশনিজমের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা। এই যুক্তিতে উদারনৈতিকতাবাদের সাথে সামাজিক গণতন্ত্রের যোগাযোগের সম্ভাবনা রয়েছে।

নাজি শাসনের প্রেক্ষাপটে ১৯৪৯ সালের 'বেসিক ল' (মূল আইন) পরিষ্কারভাবে মৌলিক সুরক্ষাদানকারী নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। উদীয়মান ফেডারেল রিপাবলিকে একদিকে 'বুর্জোয়া' বা ঐতিহ্যগতভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, আর অন্যদিকে রাজনৈতিক বামপন্থীদের মধ্যকার ক্ষমতার ভারসাম্যর অর্থ ছিল বেসিক ল-তে বিধৃত নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা কম নির্ধারিত থাকা (underdetermined)। ফলস্বরূপ বেসিক ল সংক্রান্ত বিতর্কে বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যাসহ মতামত গড়ে ওঠে। কেউ কেউ মনে করে মৌলিক অধিকার যেগুলো প্রথমদিককার অনুচ্ছেদগুলোতে বিধৃত রয়েছে সেগুলোই মূল অধিকার, আর অন্যদিকে অন্যরা মনে করে মূল বিষয় ছিল (ব্যক্তিগত) সম্পদের প্রশ্ন আর এখনো তা-ই আছে (হাভেরকাটে ১৯৯২; আরও দেখুন, বেসিক ল ও জাতিসংঘের চুক্তির মৌলিক অধিকারের তুলনা, অধ্যায় ৪.৩)।

জাতিসংঘের চুক্তির সাথে তুলনা

এর বিপরীতে ১৯৬০-এর দশকের জাতিসংঘের চুক্তিগুলোর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতের সাথে সাথে ঐ সময়ের সামাজিক বিকাশে আরও ব্যাপক ইতিবাচক ও নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব দেখা যায়।

ইতোমধ্যে উল্লিখিত বিভিন্ন তত্ত্ব বাজার ও গণতন্ত্রের সম্পর্কের বিবরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়।

সর্বোপরি কিভাবে গণতন্ত্র ও বাজার একে অপরের সাথে সম্পর্কিত ও তাদের সম্পর্কে ব্যাখ্যার প্রশ্নে তথাকথিত আপেক্ষিক উদারনৈতিকতাবাদ ও সামাজিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব বিভক্ত হয়ে যায়।

উভয় তাত্ত্বিক প্রবণতার মূল হচ্ছে একটি জায়গায় - উদারনৈতিকতাবাদ - যা সপ্তদশ শতক থেকে বিকশিত হয়ে এসেছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: কিভাবে সমাজে স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হয়?

তবে এই বিষয়ের সবচেয়ে মৌলিক সমস্যা হচ্ছে 'কিভাবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সমাজে বাস্তবায়িত হয়'। এই প্রশ্নের বিভিন্ন তাত্ত্বিক উত্তর রয়েছে। এসব উত্তর পর্যালোচনা করতে গেলে 'নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা'র ধারণা আরও নির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

এছাড়া একদিকে আপেক্ষিক উদারনৈতিকতাবাদ ও অন্যদিকে সামাজিক গণতন্ত্রে নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা বিবেচনা করার আগে আরেকটি ধারণা পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন - কেন 'নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা' নিয়ে আলোচনা আর কেন শুধু 'স্বাধীনতা' ও 'মূল চেতনা' নিয়ে নয়?

৪.৩ অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা: মূল চেতনা, মৌলিক অধিকার ও মাধ্যম ত্রয়ী

মূল চেতনা, মৌলিক অধিকার ও মাধ্যম ত্রয়ী

আমরা দেখছি যে, রাজনৈতিক তত্ত্ব ও দর্শন স্বাধীনতা, সমতা ও একতার ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ উপস্থাপন করে। এর ফলে আমরা এক ধরনের 'ভিত্তিমূলক বহু-মতবাদ'-এর মুখোমুখি হই যা বিভিন্ন রাজনৈতিক ধারণাভিত্তিক মডেল ও প্রবণতাকে শুদ্ধ থাকতে দেয় না।

এ ধরনের বহু-মতবাদ কোনো একক ও সম্পূর্ণ তত্ত্বের দিকে পৌঁছাতে সমস্যার তৈরি করে। যদি এ ধরনের কোনো তত্ত্ব কোনো নির্দিষ্ট মতবাদের সাথে সম্পর্কিত হয় তবে তা সর্বজনীনতা দাবি করার শক্তি হারায়, আর অন্যান্য দার্শনিক, নৈতিক বা ধর্মীয় রীতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার সম্ভাবনা জাগায়।

বিতর্কের সম্ভাব্য সবচেয়ে ব্যাপক ভিত্তি কী?

এ কারণে থমাস মেয়ারের মতে, সামাজিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব বিতর্কের জন্য সম্ভাব্য সবচেয়ে ব্যাপক ভিত্তি বেছে নিয়েছে। এ উদ্দেশ্যে এমন এক পর্যায়ের যুক্তি থাকতে হবে যা সাংস্কৃতিকভাবে নির্দিষ্ট নয়, কিন্তু যার মাধ্যমে একটি সাধারণ ও গণতান্ত্রিকভাবে বৈধ কাঠামোর প্রেক্ষিতে বর্ণনা করা যাবে।

তিনটি স্তর

ফলে বিতর্কের ভিত্তি হিসেবে মূল চেতনাগুলো কাজ করবে না। এসব চেতনা বিতর্কের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিত, কিন্তু তারা পরিবর্তনশীল ও সাংস্কৃতিকভাবে নির্দিষ্ট। কাজেই সামাজিক গণতন্ত্রের জন্য ভিত্তির একটি বর্ণনার প্রচেষ্টা অবশ্যই অন্য একটি পর্যায়ে হতে হবে। এক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে তিনটি পর্যায় বা স্তর আলাদা করা যায়।

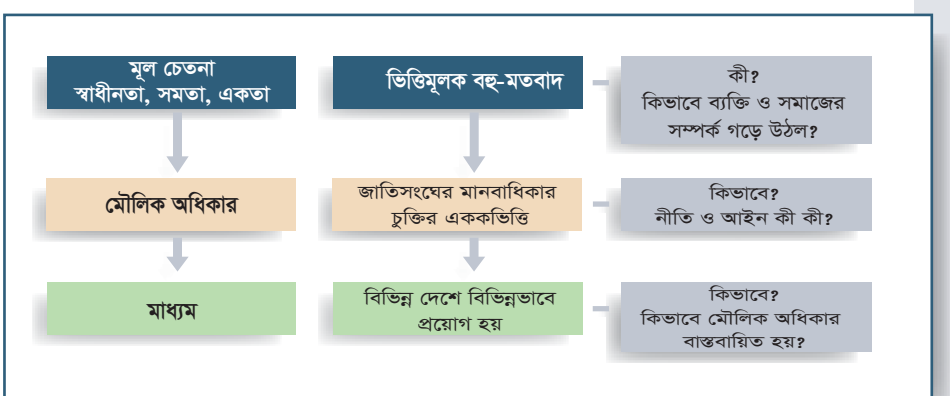

চিত্র ১০: মূল চেতনা, মৌলিক অধিকার ও মাধ্যমের উৎস

মূল চেতনা

স্বাধীনতা, সমতা ও একতার মূল চেতনার পর্যায়ে এটি পরিষ্কার যে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক কী আর কিভাবে এই সমাজে জীবনকে সংগঠিত করতে হবে। সমাজ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণার উৎস হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী - এসব ধারণা তাদের নিজেদের স্বার্থে এসব মূলনীতিগুলোকে সংজ্ঞায়িত করে।

মৌলিক অধিকার

মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে এসব মূল চেতনা সামাজিকভাবে বাধ্যতামূলক, গণতান্ত্রিক-ভাবে বৈধ আদর্শে রূপান্তরিত হয় বা স্থানবদল হয়।

মূলনীতির মত না হয়ে এসব মৌলিক অধিকার কোনো ভিত্তিমূলক বহুমতের মুখাপেক্ষী নয়, বরং তাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে সমাজে সহাবস্থান নিয়ন্ত্রণ করে।

মাধ্যম

মাধ্যম পর্যায়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো এমনভাবে সংজ্ঞায়িত হয় যার মাধ্যমে রাষ্ট্র মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার চাহিদা পূরণের জন্য তার অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্রিয় হওয়ার দাবি পূরণ করে। এসব মাধ্যম বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়, যা বিভিন্ন দেশের উদাহরণে প্রকটভাবে দৃশ্যমান।

কাজেই কেউ যদি সামাজিক গণতন্ত্রের তত্ত্বের জন্য বিতর্কের সবচেয়ে ব্যাপক সম্ভাব্য ক্ষেত্র নিশ্চিত করতে চায়, সেক্ষেত্রে আলোচনা শুরুর জন্য মৌলিক অধিকারের পর্যায়কে বেছে নিতে হবে। মেয়ার বিতর্কের ভিত্তি হিসেবে জাতিসংঘের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি বেছে নিয়েছেন। এর পক্ষে বেশ কিছু যুক্তি রয়েছে:

- জাতিসংঘের চুক্তিগুলো মৌলিক অধিকারের বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে সমরূপ ও আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক বহু-সাংস্কৃতিক ও বহুজাতিক উৎস। জাতিসংঘের চুক্তিগুলো ১৪০টিরও বেশি দেশে অনুমোদনপ্রাপ্ত আর আইন হিসেবে পরিণত হয়েছে।
- জাতিসংঘের চুক্তিগুলো আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সামাজিক উন্নয়ন আর মৌলিক অধিকার প্রসারণের লক্ষ্যে গৃহীত। অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্রগুলো এসব অধিকারের বাস্তবভিত্তিক বাস্তবায়নের জন্য ক্রমাগতভাবে উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- জাতিসংঘের চুক্তিগুলো চূড়ান্তভাবে ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট অধিকার ধারণ করে যা প্রত্যেক ব্যক্তি দাবি করতে পারে।

জার্মান বেসিক ল এর মৌলিক অধিকার ও জাতিসংঘের চুক্তিগুলোর মধ্যে তুলনা করার মাধ্যমে সর্বশেষ যুক্তি দেওয়া যেতে পারে।

নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্র	বেসিক ল	জাতিসংঘের চুক্তিসমূহ
ব্যক্তির অধিকার	"মানুষের মর্যাদা অলঙ্ঘ্যণীয়। একে সম্মান করা ও সুরক্ষা দেওয়া রাষ্ট্রের প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।" (অনুচ্ছেদ ১)	"প্রতিটি মানুষের জীবনের স্বাভাবিক অধিকার রয়েছে। এই অধিকার আইন দ্বারা সুরক্ষিত হবে। কেউ তার জীবন থেকে একচ্ছত্র সিদ্ধান্তের দ্বারা বঞ্চিত হবে না।" (অনুচ্ছেদ-৬, প্যারা-১; ইন্টারন্যাশনাল কোভেন্যান্ট অন সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিকাল রাইটস) "প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা ও সুরক্ষার অধিকার রয়েছে।" (অনুচ্ছেদ ৯, প্যারা ১; ইন্টারন্যাশনাল কোভেন্যান্ট অন সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিকাল রাইটস, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৬)
কাজের অধিকার	"(১) প্রত্যেক জার্মান ব্যক্তির পেশা, কাজের ক্ষেত্র ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র মুক্তভাবে বেছে নেওয়ার অধিকার থাকবে। কোনো পেশার চর্চা কোনো আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও অনুসরণে হতে পারে। (২) সমাজের সেবার দায়িত্ব ছাড়া এমন কোনো কাঠামো সাধারণভাবে ও সমানভাবে সবার জন্য প্রযোজ্য কোনো ব্যক্তি কোনো বিশেষ ধরনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হতে পারবে না।" (অনুচ্ছেদ ১২)	"(১) বর্তমান চুক্তির অংশীদার রাষ্ট্রসমূহ কাজের অধিকার স্বীকার করে, যার মধ্যে কোনো ব্যক্তি তার জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়া ও গ্রহণ করার অধিকার এবং এই অধিকার রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। (২) এই অধিকার পরিপূর্ণভাবে অর্জনের জন্য বর্তমান চুক্তির অংশীদার রাষ্ট্রসমূহ স্থিতিশীল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও সম্পূর্ণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান অর্জনের জন্য ব্যক্তিদের মৌলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সুরক্ষা দেওয়ার পরিবেশের অধীনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দিক-নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নীতি ও কৌশল অন্তর্ভুক্ত করবে।" (অনুচ্ছেদ ৬; ইন্টারন্যাশনাল কোভেন্যান্ট অন ইকোনমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৬)

নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্র	বেসিক ল	জাতিসংঘের চুক্তিসমূহ
সম্পদ/ জীবনযাত্রার মান	"(১) সম্পদ ও উত্তরাধিকারের অধিকার নিশ্চিত করা হবে। আইনের দ্বারা তাদের পরিমাণ ও সীমা সংজ্ঞায়িত করা হবে। (২) সম্পত্তির ফলাফল বাধ্যবাধকতা। এর ব্যবহারও জনগণের কল্যাণে হবে।" (অনুচ্ছেদ ১৪)	"বর্তমান চুক্তির অংশীদার রাষ্ট্রসমূহ পর্যাপ্ত খাবার, কাপড় ও বাসস্থানসহ জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নতির জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি ও তার পরিবারের জন্য জীবন ধারণের যথাযথ মানের অধিকার স্বীকার করে। অংশীদার রাষ্ট্রসমূহ এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য স্বাধীন সম্পত্তির ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব স্বীকার-পূর্বক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।" (অনুচ্ছেদ ১১; ইন্টারন্যাশনাল কোভেন্যান্ট অন ইকোনমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৬)
শিক্ষা	"(১) প্রত্যেক ব্যক্তির তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব মুক্তভাবে উন্নয়নের অধিকার থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্য কারও অধিকার ক্ষুণ্ন করে বা সাংবিধানিক ব্যবস্থা বা নৈতিক আইনের ব্যত্যয় ঘটে।" (অনুচ্ছেদ ২) "(১) পুরো বিদ্যালয় ব্যবস্থা রাষ্ট্রের তদারকির অধীনে থাকবে। (২) তাদের সন্তানরা ধর্মীয় বিধি-বিধান গ্রহণ করবে কিনা সে বিষয়ে বাবা-মা বা অভিভাবকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকবে।" (অনুচ্ছেদ ৭)	"(১) বর্তমান চুক্তির অংশীদার রাষ্ট্রসমূহ প্রত্যেকের শিক্ষার অধিকার স্বীকার করে। তারা একমত হয় যে, শিক্ষার প্রয়োগ হবে মানব ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও এর সম্মানের জন্য, আর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার জন্য শ্রদ্ধাকে শক্তিশালী করবে। তারা আরও একমত হয় যে, সব ব্যক্তিকে একটি মুক্ত সমাজে কার্যকর অংশগ্রহণ করতে, সব জাতি ও সব জাতিগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতা, সহনশীলতা ও বন্ধুত্ব উৎসাহিত করতে, আর শান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের কার্যক্রমকে সক্ষম করবে শিক্ষা। (২) বর্তমান চুক্তিতে অংশীদার সব রাষ্ট্র স্বীকার করে যে, এই অধিকার পূর্ণভাবে অর্জন করার জন্য: (ক) প্রাথমিক শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক ও বিনামূল্যে থাকবে; (খ) প্রত্যেক যুক্তিযুক্ত উপায়ে ও বিশেষকরে বিনামূল্যে শিক্ষার মাধ্যমে সামর্থ্যের ভিত্তিতে সবার জন্য উচ্চশিক্ষা সমানভাবে প্রবেশযোগ্য করা হবে।" (অনুচ্ছেদ ১৩; ইন্টারন্যাশনাল কোভেন্যান্ট অন ইকোনমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৬)

জাতিসংঘের দুটি চুক্তি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে কিভাবে মৌলিক অধিকারগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করা হবে তার একটি সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত পর্যালোচনা করে। ইন্টারন্যাশনাল কোভেন্যান্ট অন ইকোনমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিকাল রাইটস-এ বলা হয়েছে:

> *"১. বর্তমান চুক্তির অংশীদার প্রতিটি রাষ্ট্র এককভাবে ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিশেষকরে কারিগরি ও আর্থিক, সর্বোচ্চ প্রাপ্য সম্পদের সমস্ত উপযুক্ত মাধ্যমে, বিশেষকরে আইনগত ব্যবস্থা প্রণয়নসহ এই চুক্তিতে স্বীকৃত অধিকারগুলোর পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেবে।"*
> (অনুচ্ছেদ ২, প্যারা ১)

জাতিসংঘের চুক্তির উন্নয়ন প্রেক্ষিত

কাজেই জাতিসংঘের চুক্তিগুলোতে একটি উন্নয়নের প্রেক্ষিত বলা হয়েছে, অর্থাৎ 'সব উপযুক্ত মাধ্যমে' মৌলিক রাজনৈতিক অধিকারের ভিত্তিতে ক্রমাগতভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বাস্তবায়নে কাজ করার জন্য সবগুলো রাষ্ট্রের ওপর বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এটি একটি সক্রিয় রাষ্ট্রের মডেল বর্ণনা করে। যদি কোনো রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করে আর শুধু মৌলিক অধিকার অনুমোদনই করে না বরং ইতিবাচক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করে, তবে তা একটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারণার সাথে অসংগতিপূর্ণ।

প্রয়োগের মাধ্যম অনুপস্থিত থাকার কারণে জাতিসংঘের চুক্তিগুলো বিশ্বব্যাপী লক্ষিত হয়

তবে এক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে সামনে এগোতে হবে, কারণ অনেক দেশেই মৌলিক অধিকারের বাস্তবায়ন বিশৃঙ্খল অবস্থায় রয়েছে। আইনি অধিকার ও তাদের প্রয়োগের মধ্যে বিস্তর ফারাক দেখা যায়। এই অর্থে জাতিসংঘের চুক্তিগুলোর প্রকৃতপক্ষে কতটুকু মূল্য রয়েছে তা নিয়ে সমালোচনার অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। এখানে এসব চুক্তির বাস্তবায়নের জন্য চাপ দেওয়ার মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানেরও ঘাটতি রয়েছে।

তা সত্ত্বেও এটি বলতে হবে যে বেসিক ল-এর তুলনায় জাতিসংঘের চুক্তিগুলো মৌলিক অধিকারগুলো আরও ঠিকঠাকভাবে বর্ণনা করে, যা সামাজিক গণতন্ত্রকে এর দাবিগুলোর জন্য ভিত্তি দিতে পারে।

এটি সত্য যে অনুচ্ছেদ ২০-এ বেসিক ল ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানিকে একটি গণতান্ত্রিক ও 'সোশ্যাল ফেডারেল' রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করে। তবে জাতিসংঘের চুক্তিগুলোর দৃষ্টিতে যেসব কার্যক্রম নেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা এখানে খুবই সীমিত।

কিভাবে একটি সক্রিয় রাষ্ট্র নিজেকে উপস্থাপন করবে সেক্ষেত্রে যে বিতর্ক রয়েছে তা মৌলিক অধিকারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দিলেই পরিষ্কার হয়। এটি আরও প্রমাণিত হয় যে একটি ধারাবাহিক আপেক্ষিক উদারনৈতিকতাবাদ অবশ্যই নিজেকে অস্বীকার করবে বা নিজের বিরুদ্ধে যাবে।

৪.৪ ইতিবাচক ও নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা

ইতিবাচক ও নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা: সংজ্ঞা

নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার প্রেক্ষিতে উদারনৈতিক গণতন্ত্র নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে। এগুলো সমাজের সবার জন্য প্রযোজ্য। ইসাইয়াহ বার্লিন অনুসারে এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা যায় - নেতিবাচক (আনুষ্ঠানিক ও সুরক্ষাবাদী) ও ইতিবাচক (সামাজিকভাবে সমর্থনকারী) নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা।

এই নেতিবাচক ও ইতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার সাথে আপেক্ষিক গুরুত্ব জড়িয়ে থাকার প্রেক্ষিতে আপেক্ষিক উদারনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্রের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

মেয়ার-এর সামাজিক গণতন্ত্রের তত্ত্বে একটি প্রধান আলোচনার ক্ষেত্র রয়েছে যা নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার বিতর্কে আরও স্বচ্ছতা নিয়ে আসতে পারে। ইতোমধ্যে যা বলা হয়েছে, প্রকৃতই এগুলো বাস্তবে রয়েছে কিনা কোনো দেশে তার বিবেচনা না করে (অবশ্যই এরা খাঁটি অবস্থায় থাকে না) আদর্শ ধরনগুলোর ওপর দার্শনিক আলোচনা শুরু করা উচিত।

ইসাইয়াহ বার্লিন ১৯৫৮ সালে তাঁর স্বাধীনতার দুটি ধারণায় দুই ধরনের নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার পার্থক্য দেখান:

- নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা (যেমন শারীরিক ক্ষতি থেকে স্বাধীনতার অধিকার) যা রাষ্ট্র ও সমাজের নিয়ন্ত্রণ থেকে সুরক্ষা দেয়।
- ইতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা (যেমন শিক্ষার অধিকার) যা সমাজে ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাধীনতা উৎসাহিত করে ও সহায়তা করার উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়।

এই দার্শনিক বিতর্কের প্রেক্ষিতে আপেক্ষিক উদারনৈতিক গণতন্ত্র সামাজিক গণতন্ত্রের চেয়ে নিম্নলিখিতভাবে পৃথক:

আপেক্ষিক উদারনৈতিক তত্ত্ব

আপেক্ষিক উদারনৈতিক তত্ত্ব

ইতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার অনুমোদন নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে সংক্ষেপ করে আর ধ্বংস করে। নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার নিরঙ্কুশ অগ্রাধিকার রয়েছে: এটি (সংক্ষেপে) বার্লিনের তত্ত্ব, যা অনেক নব্য উদারনীতিকদের দ্বারাও প্রতিনিধিত্ব হয়।

সামাজিক গণতন্ত্রে তত্ত্বের বিষয়

সামাজিক গণতন্ত্রে তত্ত্বের বিষয়

নেতিবাচক ও ইতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে অবশ্যই সমান মর্যাদার ভাবতে হবে যদি এগুলোকে যথার্থ করতে হয় আর সবার জন্য বাস্তবায়ন করতে হয়। আপেক্ষিক

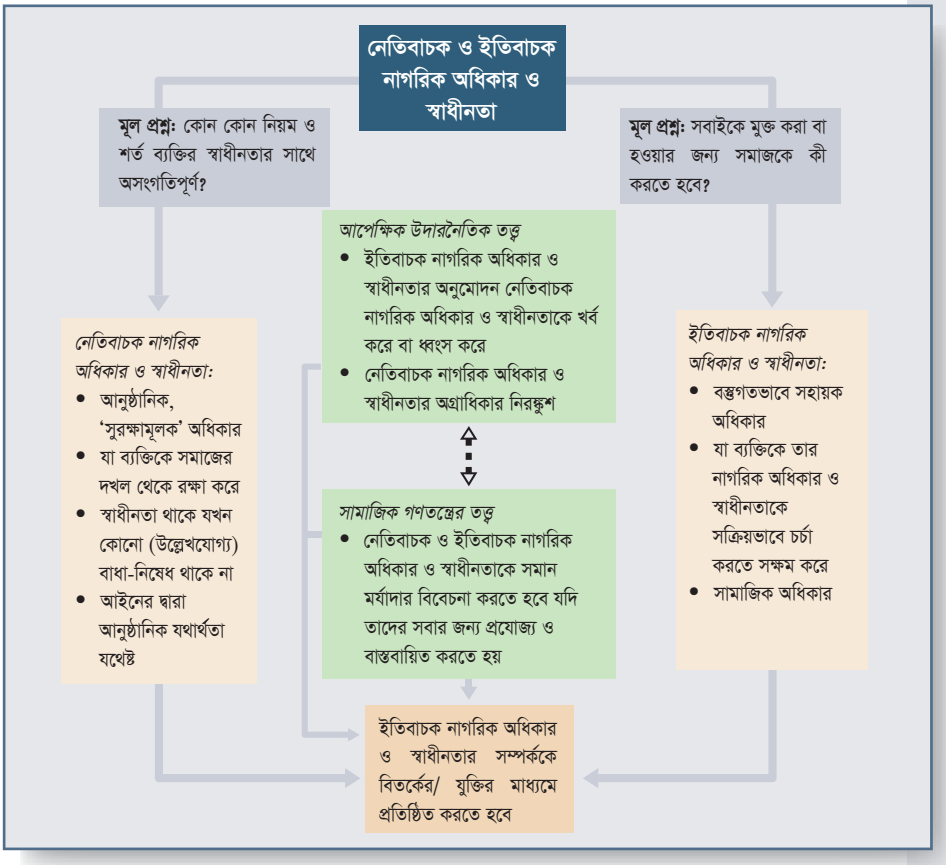

চিত্র ১১: নেতিবাচক ও ইতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা

উদারনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্রের এই পার্থক্য কিভাবে নেতিবাচক ও ইতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত তার দিকে নিবিড় দৃষ্টি দিতে বলে।

মেয়ার যৌক্তিক কারণেই আপেক্ষিক উদারনৈতিক বিতর্ককে বাতিল করেন।

আপেক্ষিক উদারনৈতিক যুক্তিতর্ক নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে ইতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার ওপর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য দেয়, যেখানে সামাজিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব সমতার ভিত্তিতে এই দুটির মধ্যে যৌক্তিক ও গতিশীল সম্পর্কের ওপর জোর দেয়।

সামাজিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব এখানে আপেক্ষিক উদারনৈতিকতার তত্ত্বকে বাতিল করে আর প্রমাণ করে যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্ক আছে।

আপেক্ষিক উদারনৈতিকতা: নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার নিরঙ্কুশ অগ্রাধিকার

ক্ষেত্র

মেয়ার-এর যুক্তিতর্ক চারটি ধাপের ওপর নির্ভরশীল। তিনি শুরু করেন এই প্রেক্ষাপটে যে নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা যথার্থ আর আপেক্ষিক উদার নৈতিকতাবাদের যুক্তিতে সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য। যতদূর পর্যন্ত আপেক্ষিক উদারনৈতিকতাবাদ প্রযোজ্য তার প্রেক্ষিতে এটি প্রয়োজনীয় যে নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা আর তাদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য থাকতে হবে।

কখন আপেক্ষিক উদারনৈতিক তত্ত্ব অগ্রাহ্য বা বাতিল হয়?

আপেক্ষিক উদারনৈতিক তত্ত্ব বাতিল হয় এমন পরিস্থিতিতে যেখানে একজন ব্যক্তি তার নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা চর্চা করতে পারে না কারণ ইতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা অনুমোদিত থাকে না।

বাতিলের উদাহরণ

এ ধরনের পরিস্থিতি সহজেই কল্পনা করা যায়: যেসব ব্যক্তির শিক্ষা ক্ষেত্রে কোনো আনুষ্ঠানিকভাবে যথার্থ ও কার্যকর ইতিবাচক অধিকার বা স্বাধীনতা নেই, যাদের কোনো কাঠামো নেই যা তাদের সমাজ জীবনে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে, আর নিজেদের সামর্থ্যে যারা শিক্ষা কিনতে পারে না, তারা তাদের নেতিবাচক অধিকার বা স্বাধীনতা তাদের মত প্রকাশের জন্য চর্চা করতে পারবে না। যে কাগজে ছাপানো হয়েছে এসব নেতিবাচক অধিকার বা স্বাধীনতা তার যোগ্যও হবে না।

উপসংহার: ইতিবাচক ও নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার মিথস্ক্রিয়া

যদি নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে শুধু আনুষ্ঠানিক যথার্থতার বাইরে কিছু পেতে হয় আর সবার জন্য কার্যকর হতে হয়, তাহলে ইতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে অবশ্যই অনুমোদন দিতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে ধনীকে সামাজিক পুনর্বণ্টন মেনে নিতে হবে। এটি নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার (সম্পত্তির) একটি সাধারণ ব্যত্যয় প্রতিনিধিত্ব করে।

যৌক্তিক উপসংহার অনুসারে নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার চরম উদাহরণ থাকতে পারে না। নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা যথার্থ ও কার্যকর হতে পারে না যদি তা ইতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার দ্বারা সমর্থিত না হয়।

কাজেই নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা সবার জন্য কার্যকর হবে শুধু যদি ইতিবাচক বা 'সহায়ক' নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। শুধু আনুষ্ঠানিক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা বেশি কিছু করতে পারে না যখন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সবার দ্বারা জোর দেওয়া না হয়।

সম্পদের সামাজিক পুনর্বণ্টন, যা সাধারণত রাষ্ট্র সংগঠিত করে, তা ছাড়া নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা সবার জন্য বাস্তবায়িত হতে পারে না। মেয়ার-এর উপসংহার হচ্ছে যে, রাষ্ট্রের দ্বারা ইতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা ও নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার মধ্যে দর-কষাকষি ও বাস্তবায়ন হতে হবে।

৪.৫ রাষ্ট্রের কর্তব্য

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কাজ করার বাধ্যবাধকতা

ইতিবাচক ও নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রের দিক থেকে উদ্যোগ নেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। একটি আপেক্ষিক উদারনৈতিক রাষ্ট্রে মৌলিক অধিকারগুলো সামান্যই স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়, এবং যাদের বাস্তবায়ন বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে এর বিপরীতে রাষ্ট্রের ওপরে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সত্যিকার অর্থে কার্যকর মৌলিক অধিকার দাবি করা হয়। এভাবে রাষ্ট্রকে একটি সক্রিয় ভূমিকা দেওয়া হয় ও কাজ করার জন্য নিম্নলিখিত বাধ্যবাধকতাগুলো থাকে:

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাধ্যবাধকতা

- এমন অবকাঠামো আর সেবা দেওয়া (তথাকথিত 'সাধারণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সেবা') যা সহজে পাওয়া যায়, সুরক্ষা দেয় আর সুযোগ উন্মুক্ত করে;
- সামাজিক পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে সুযোগ তৈরি করা যা সমাজ ও গণতন্ত্রে সক্রিয়ভাবে ও স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করার ব্যাপক অনুমোদন দেয়;
- বাজার অর্থনীতিকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করা যেন গণতান্ত্রিক কাঠামো ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা পায় আর মুক্তভাবে উপস্থাপিত হয়।

পথ নির্ভরশীল মাধ্যম

রাষ্ট্র কর্তৃক তার নাগরিকদের এসব দাবি পূরণের জন্য ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। এটি খুব সাধারণ একটি উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায়:

জার্মানিতে সামাজিক নিরাপত্তার একটি কাঠামো রয়েছে যা ১৯৮০'র দশক থেকে বিকশিত হয়েছে। এই সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো মানুষের একটি সুন্দর জীবন-যাপনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। একইসাথে এটি শ্রমিকদের একতার কারণে দৃঢ় হয় আর উদীয়মান রাষ্ট্রের প্রতি সংঘটক হিসেবে সরকারের আনুগত্য নিশ্চিত করে।

অন্যান্য দেশে, যেমন স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় করভিত্তিক সামাজিক ব্যবস্থা রয়েছে। এখানেও সর্বসাধারণের স্বার্থে সেবা দেওয়া হয় আর রাষ্ট্রের ওপর ব্যক্তির দাবি পূরণ করা হয়। তা সত্ত্বেও, এ দুটো ব্যবস্থার তুলনা কতদূর ইতিবাচক ও নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হয়েছে তার সূক্ষ্ম তফাৎ তুলে ধরে। নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে উদ্ভূত কাজ করার বাধ্যবাধকতা কম বা বেশি হলেও উভয় ধরনের সংগঠন দ্বারাই পূরণ হয়।

নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার বাস্তবায়ন শুধু বিশেষ মাধ্যমের বিষয়ই নয়, যদিও তাদের পর্যালোচনা অবশ্যই করা উচিত। সামাজিক গণতন্ত্র একটি সার্বিক ধারণাভিত্তিক মডেল যা মানবাধিকারের আনুষ্ঠানিক অনুমোদনেই থেমে যায় না। এটি বাস্তবতাবর্জিত কোনো দার্শনিক কাঠামোও নয়। বরং একটি উন্মুক্ত মডেল হিসেবে এটিকে কোনো রাজনৈতিক উদ্যোগের জন্য জনগণকে এমনভাবে বিশ্বাস করতে হয় যেন বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম দ্বারা যত ব্যাপকভাবে সম্ভব নিরেট নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা বাস্তবায়ন করা যায়। এটি স্বাধীনতা, সমতা, ন্যায্যতা ও একতার মত মৌলিক নীতির বাস্তবায়ন সম্ভব করে।

সামাজিক গণতন্ত্র কোন তাত্ত্বিক বাহুল্য নয়, কিন্তু একটি সাধারণ চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবভিত্তিক কাজ।

৫. বিভিন্ন রাষ্ট্রের মডেল

এই অধ্যায়ে

- সামাজিক গণতন্ত্রের উপস্থিতির ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, জাপান ও সুইডেনের নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- সামাজিক গণতন্ত্র তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে উদারনৈতিক রাষ্ট্রের সাথে স্বল্প-সম্পৃক্ত, মধ্যম সম্পৃক্ত এবং অধিক সম্পৃক্ত সামাজিক গণতন্ত্রের তুলনা করা হয়েছে।

রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার রক্ষার কর্তব্য পালন করতে পারে।

কী করতে হবে আর কী করা হয় তার ভিন্ন ভিন্ন ধরন

এই প্রেক্ষাপটে সামাজিক গণতন্ত্রকে আগে থেকেই বিদ্যমান কোনো ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না: কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে এর রূপ ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেহেতু সামাজিক গণতন্ত্র কেবলমাত্র নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক গ্রহণযোগ্যতাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সেহেতু প্রতিটি দেশের অনুসৃত পদ্ধতির উন্নয়নের নিদর্শনগুলো সামাজিক গণতন্ত্রের প্রতি নির্দেশ করে কিনা, অর্থাৎ উক্ত দেশটি ইতোমধ্যে সামাজিক গণতন্ত্র কায়েম করেছে অথবা করতে সচেষ্ট কিনা, সেই বিষয়টিও অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

এই বিবেচনায় থমাস মেয়ার ও তাঁর সহকর্মীরা বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের তুলনা করেছেন। তাঁদের এই পদ্ধতি গণতন্ত্রের বিভিন্ন তত্ত্ব, যেগুলো এ ধরনের পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যের তুলনা করে না সেগুলোর থেকে ভিন্ন।

এখানে পাঁচটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দেওয়া হল, যেগুলো সামাজিক গণতন্ত্রের বাস্তবায়নের বিভিন্ন মাত্রা প্রকাশ করে।

পাঁচটি উদাহরণ

- যুক্তরাষ্ট্র- মৌলিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে একটি প্রায় আপেক্ষিক উদারনৈতিক দেশ বলা যায়, এবং এখানে সামাজিক গণতন্ত্রের সামান্য কয়েকটি উপাদান প্রকাশ করে;
- যুক্তরাজ্য- একটি স্বল্প-সম্পৃক্ত সামাজিক গণতন্ত্র;
- জার্মানি- একটি মধ্য-সম্পৃক্ত সামাজিক গণতন্ত্র;
- জাপান- যদিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে তুলনা করা যায় না, তবুও একটি মধ্যম-সম্পৃক্ত সামাজিক গণতন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা যায়;
- সুইডেন- একটি উচ্চ-সম্পৃক্ত সামাজিক গণতন্ত্র।

প্রয়োজন অনুযায়ী এখানে পর্যবেক্ষণকৃত দেশগুলোর তথ্য সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। যাদের বিভিন্ন দেশের তুলনার বিস্তারিত তথ্যের প্রয়োজন তারা মেয়ার-এর তত্ত্বের (মেয়ার ২০০৬) দ্বিতীয় ভলিউম পড়ে দেখতে পারে।

৫.১ যুক্তরাষ্ট্র

জুলিয়া ব্লাসিয়াস

স্বাধীনতা ও সামাজিক অসমতা

বহু মানুষের কাছে যুক্তরাষ্ট্র একটি সম্ভাবনা ও স্বাধীনতার দেশ। একইসাথে এটিও জানা কথা যে সামাজিক অসমতা সেখানে ইউরোপের চেয়েও বেশি। কিন্তু এর অর্থ কী এবং কিভাবে এমনটি হল? যে বিষয়টি নিশ্চিত তা হল যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি দেশ যার জনগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অন্যান্য সব বিষয় থেকে বেশি গুরুত্ব দেয়। যার ফলে ঐতিহ্যগতভাবেই এর সমাজ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সংশয় পোষণ করে। যুক্তরাষ্ট্রে শুরু থেকেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতির একসাথে সহায়ক হয়ে গড়ে ওঠার ইতিহাস এর পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করে। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি রাজনৈতিক ক্রীড়নক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, মৌলিক অধিকারকে কিভাবে দেখা হবে, এবং কল্যাণ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে।

যুক্তরাষ্ট্র আধুনিক গণতন্ত্রের প্রথম দিকের একটি দেশ যা তার সমাজে একটি শক্তিশালী রিপাবলিকান মনোভাব গড়ে উঠতে সহায়তা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ১৭৮৯ সালের সংবিধানেই সর্বজনীন ভোটাধিকারের উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে ইউরোপে গণতন্ত্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজতন্ত্রকে অপসারণ করে এসেছে। যার ফলে ইউরোপীয় দেশগুলোতে বহু আগে থেকে গড়ে ওঠা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র কাঠামো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও বিদ্যমান রয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বলতে গেলে রাষ্ট্র ও গণতন্ত্রের উদ্ভব একই সাথে ঘটে স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে। এই সব বিষয় এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণার কাঠামো তৈরি করে আসছে। সমাজ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং একটি অসক্রিয় (Passive) রাষ্ট্র প্রত্যাশা করে। ফলে সামাজিক অসমতাকে মানুষের সহাবস্থানের একটি স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

সর্বোচ্চ সক্রিয় দিক-নির্দেশনা হিসেবে স্বাধীনতা

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংস্কৃতি উদারনীতি দ্বারা অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রভাবিত, যা ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর বিশেষ জোর দেয়। ইউরোপে যেমনটি হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে উদারনীতি সেরকম অন্য কোনো নীতি, যেমন রক্ষণশীলতা বা সমাজতন্ত্র দ্বারা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় নি। যার ফলে প্রকৃত কোনো বিকল্প না থাকায় উদারনীতি প্রধান নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমন কি আজও যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ ভাল দিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে ঐতিহ্যগতভাবেই সরকারের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করার সুযোগ ছিল খুব সামান্য, কিন্তু সর্বোপরি এর ঝোঁকও ছিল অত্যন্ত কম। এমন কি আন্তর্জাতিক আর্থিক ও অর্থনৈতিক মন্দা, যা কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই উৎপত্তিই হয় নি বরং একে চরমভাবে আঘাতও করেছে, এই নীতিকে খুব বেশি হলে কিছুটা শিথিল করবে মাত্র।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাথে নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর সহযোগিতার সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে দুর্বল। শ্রমিক সংগঠনগুলো (ট্রেড ইউনিয়ন) অত্যন্ত দুর্বলভাবে সংগঠিত এবং খুব কম ভূমিকাই পালন করতে পারে। যার ফলে নিয়োগ চুক্তি ও পারিশ্রমিক স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারণ করা হয়। এই ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র বহুদলীয় গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসূচক সমস্যাগুলোর একটির সম্মুখীন হয়। বিশেষ স্বার্থ উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে কেবলমাত্র যদি তা সুসংগঠিত ও আর্থিকভাবে শক্তিশালী হয়। অন্যদিকে ব্যাপক-স্বার্থের প্রভাব খুব সামান্যই থাকে যদি তা দুর্বলভাবে সংগঠিত হয়। একদিকে নির্দিষ্ট লবি গ্রুপ ও ব্যবসায়ী সংঘগুলোর জোরালো প্রভাব, আর অন্যদিকে ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাগুলোর নগণ্য প্রভাবের মাধ্যমে এই বাস্তবতাটি প্রকাশিত হয়।

প্রকৃত বাস্তবতায় এর অর্থ কী?

যুক্তরাষ্ট্রের কল্যাণ রাষ্ট্রের কাঠামো ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই বাস্তবতার প্রতিফলন কিভাবে ঘটে? এটি কী ধরনের মৌলিক অধিকারের ধারণা প্রকাশ করে?

রাজনৈতিক ব্যবস্থা

সরকারের রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন শাখা দ্বারা গঠিত দ্বৈত কাঠামোর রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার-ব্যবস্থা রয়েছে। নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি, যিনি রাষ্ট্রেরও প্রধান, তার ওপর অর্পিত। আইন প্রণয়ন শাখা 'হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ' এবং 'সিনেট' দ্বারা গঠিত, যারা একত্রে কংগ্রেস গঠন করে। আইন প্রণয়ন শাখা ও নির্বাহী শাখা একে অপরের থেকে পৃথক হলেও পরস্পরের মুখাপেক্ষী। এই 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য'র (checks and balances) নীতি রাজনৈতিক দার্শনিক মন্টেস্কু এবং লক-এর প্রবর্তিত নীতির সমার্থক, যা ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করার জন্য ব্যবহৃত। এই ব্যবস্থার লক্ষ্য অবৈধ ক্ষমতার হাত থেকে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে যথাযথভাবে রক্ষা করা।

নির্বাচনী প্রচার পরিচালনাকারী সংস্থা হিসেবে রাজনৈতিক দল

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষভাবে নয় বরং ঐতিহ্যগতভাবে প্রভাবশালী। এর ফলে রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুব বড় ভূমিকা পালন করে না। তাদের প্রধান কাজ নির্বাচনী প্রচারাভিযান পরিচালনাকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করা যারা নির্ধারিত প্রার্থীর জন্য প্রচারাভিযান পরিকল্পনা ও পরিচালনা করে। রাজনৈতিক দলগুলো নির্দিষ্ট কোনো সরকারি কর্মসূচির ঘোষণাও দেয় না। কংগ্রেসে তারা একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা পালন করে, কারণ প্রথমত, তাদের কোনো সরকারকে সমর্থন করতে হয় না, এবং দ্বিতীয়ত, প্রতিনিধিরা কোনো মতবাদের অনুসারী না হয়ে বরং ব্যক্তিগত স্বার্থ অনুযায়ী ভোট দেয়।

সংবিধান এবং মৌলিক অধিকার ব্যবস্থা

'জীবন, স্বাধীনতা ও সুখের সন্ধান'

'জীবন, স্বাধীনতা ও সুখের সন্ধান' সূত্র দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ১৭৮৯ সালের সংবিধানের শুরু। এটি রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার ব্যবস্থাসম্পন্ন একটি যুক্ত রাষ্ট্রের (federal state) প্রতিষ্ঠা করে। এটি প্রাচীনতম রিপাবলিকান সংবিধানগুলোর একটি যা এখনো বলবৎ রয়েছে। এটি সর্বজনীন ভোটাধিকারের কথা উল্লেখ করে যদিও কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গ, যারা সম্পত্তির মালিক ছিল, তারাই ভোটাধিকারের চর্চা করতে পারত।

এছাড়া অধিকার বিল যা প্রথম দশটি সংবিধান সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল, তা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের কতগুলো অপরিবর্তনীয় অধিকার দান করে। এগুলোকে অনেক সময় মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাষ্ট্রের অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য এই অধিকারগুলো দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সংবিধানের অবস্থান অনুযায়ী এই অধিকারগুলো সব ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য।

ইতিবাচক ছাড়া নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা

এই পুরানো ঐতিহ্যমণ্ডিত তথাকথিত রাজনৈতিক মৌলিক অধিকারগুলো বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের সমাজের মৌলিক অধিকারের ধারণা নির্ধারণ করে। যদিও নাগরিকের এসব তথাকথিত মৌলিক অধিকার অথবা নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে গৃহীত সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপের ফলে সীমিত হয়েছে, তবুও এগুলো যুক্তরাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার এবং ইতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে আরও বেশি গভীর সমস্যা বিদ্যমান। এসব অধিকারের কথা সংবিধানে উল্লেখ করা হয় নি, এবং যুক্তরাষ্ট্র এমন কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি সই করে নি যা এসব অধিকারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এমন কি কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণাও সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। ফলে নাগরিকরা কেবলমাত্র তখনই সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে যখন তাদের বীমা করা থাকে অথবা অত্যন্ত দুঃস্থ অবস্থায় থাকে। তবে অত্যন্ত দুঃস্থকে এসব অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, এবং কংগ্রেস চাইলে যেকোনো সময় ভোট দিয়ে এসব সুবিধার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ বাতিল করে দিতে পারে।

সমন্বয়হীন বাজার অর্থনীতি

রাজনৈতিক অর্থনীতি

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে বলা যায় মুক্ত বা সমন্বয়হীন বাজার অর্থনীতি। এর অর্থ হল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো একে অপরের সাথে মুক্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং সরকার অথবা সামাজিক অংশীদারদের মধ্যে খুব সামান্য সহযোগিতা বা সমন্বয় থাকে। এখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মূলত মুনাফা ও প্রবৃদ্ধির দিকে ধাবিত (কিছু ক্ষেত্র যেমন কৃষি ও আগ্নেয়াস্ত্র এই ধরনের খাঁটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যবস্থার বাইরে থাকে)।

শ্রমিক সংগঠন ও বণিক সমিতিগুলো সাম্প্রতিক সময়ে বর্ধিত হারে সদস্য হারাচ্ছে এবং পারিশ্রমিক নির্ধারণ অথবা কর্ম পরিবেশ নির্ণয়ে কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। যুক্তরাষ্ট্রে পারিশ্রমিক নির্ধারণী আলোচনা প্রারম্ভিক পর্যায়ে হয়ে থাকে এবং চাকরি টিকে থাকার নিশ্চয়তা অত্যন্ত কম। এটি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে বিশেষ করে নিয়োগকর্তাদের পক্ষকে অনেক বেশি স্বাধীনতা দেয় যেন তারা খুব দ্রুত কর্মী নিয়োগ দিতে পারে এবং একই দ্রুততায় ছাঁটাইও করতে পারে। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও বহুমাত্রিক দক্ষতা ও কাজ জানা কর্মী সরবরাহের লক্ষ্যে কাজ করে।

লগ্নিকারী (শেয়ারহোল্ডার) চেতনার প্রতি ঝোঁক

নমনীয়তার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থার ঝোঁক রয়েছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কার্যক্রমের অর্থায়ন মূলধন বাজারের মাধ্যমে করে থাকে। এর ফলে শেয়ারধারীর স্বার্থ অন্যকথায় স্বল্পমেয়াদী কর্পোরেট মুনাফা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়।

ব্যাংক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বলতে গেলে খুব সামান্য আন্তরিকতার সম্পর্ক থাকে। বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার সম্পর্ক গড়ে উঠে বাজার সম্পর্ক অথবা বলবৎ চুক্তির ওপর ভিত্তি করে। যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক মন্দা সৃষ্টির জন্য যুক্তরাষ্ট্র আর্থিক ব্যবস্থার নিচু মানের নিয়ন্ত্রণ এবং স্বল্পমেয়াদী লগ্নিকারীদের মুনাফা বাড়ানোর নগ্ন প্রবণতার তীব্র সমালোচনা করা হয়।

কল্যাণ রাষ্ট্র: আমেরিকার অগ্রাধিকারের প্রতিফলন

কল্যাণ রাষ্ট্র: বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের আগ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তা ছিল কেবলমাত্র একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের। ১৯৩৭ সালের সামাজিক নিরাপত্তা আইন সর্বপ্রথম একটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রদান করে। একটি অবদানভিত্তিক ভাতা ব্যবস্থা, অসহায় শিশু, বৃদ্ধ ও পরিবারের জন্য সামাজিক সহায়তা, এবং একটি কেন্দ্রীয় বেকার বীমা প্রকল্প এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। তবে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রকে একটি উদারনৈতিক কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কারণ রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধাগুলো খুব বেশি সার্বিক নয় এবং অত্যন্ত কম মাত্রায় পুনর্বণ্টনযোগ্য। সব সামাজিক সুযোগ-সুবিধার এক-তৃতীয়াংশ আসে ব্যক্তিগত উদ্যোগে। এর প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং এই বাস্তবতা যে যুক্তরাষ্ট্র শাসিত হয় রিপাবলিকান বা ডানপন্থী ডেমোক্রেটদের দ্বারা, যারা কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণাকে খুব কম গুরুত্ব দেয়। তাই কল্যাণ রাষ্ট্রের বেশিরভাগ ক্ষেত্রগুলো প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত শর্তসাপেক্ষ, এবং কেবলমাত্র অত্যন্ত প্রয়োজনে চরম দারিদ্র্য দূর করার জন্য বেঁচে থাকার অপরিহার্য উপাদান সর্বনিম্ন পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়। এটি একটি উন্মুক্ত প্রশ্ন যে আগামীতে এর ব্যত্যয় ঘটবে কিনা। বারাক ওবামা তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় সামাজিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। স্বাস্থ্য সেবা সংস্কার বিল নিয়ে বিরোধের মাধ্যমে উদারনৈতিক (অর্থনৈতিক) যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের সংস্কার বাস্তবায়নের সমস্যাগুলো ফুটে ওঠে।

বেকারত্ব বীমা

বেকারত্ব বীমা: যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রকল্পে কেন্দ্র হতে অর্থায়ন হয়, যদিও প্রতিটি অঙ্গরাজ্য এ খাতে সুযোগ-সুবিধা কমিয়ে দিচ্ছে এবং বেকারত্ব বীমা প্রকল্পটি নিয়ন্ত্রণ করছে। বেকাররা ছয়মাসের ভাতা সুবিধা পেয়ে থাকে যা বিশেষ ক্ষেত্রে কয়েক সপ্তাহ বর্ধিত করা হয়। বেকার ভাতা পূর্ববর্তী পারিশ্রমিকের ৩০-৪০ ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

আয় সহায়তা

আয় সহায়তা: যুক্তরাষ্ট্রে আয় সহায়তা বা 'কল্যাণ' হচ্ছে একটি দুঃস্থতা দূরীকরণ পদক্ষেপ, যা সমাজের সবচেয়ে দরিদ্রদের লক্ষ্য করে গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রায়ই যার ফলাফল দাঁড়ায় এই সুবিধা গ্রহণকারীদের কলঙ্কিত করার মাধ্যমে। এছাড়া বিশেষ দল, যেমন নির্ভরশীল শিশু অথবা অভাবী পরিবার, এদের জন্য বিভিন্ন সাহায্য কর্মসূচি রয়েছে। আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি অনেক সময় তারা বিভিন্ন ধরনের বিশেষ সাহায্য পেয়ে থাকে, যেমন খাবারের জন্য রেশন কার্ড (food stamps)।

অবসর ভাতা

অবসর ভাতা: যুক্তরাষ্ট্রের অবসর ভাতা অবদান-নির্ভর। নাগরিকরা যে আয়কর দেয় তা তাদেরকে অবসর ভাতা পাওয়া নিশ্চিত করে। তবে যারা পারিশ্রমিক পায় এবং তার ফলে আয়কর দিতে পারে কেবলমাত্র তারাই অবসর ভাতা পাওয়ার অধিকার লাভ করে।

অন্যদেরকে আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির ওপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়া আয়কর প্রদানের একটি উচ্চসীমা রয়েছে, ফলে উচ্চ উপার্জনকারীর জন্য আয়কর প্রদান তুলনামূলক সহজ হয়।

স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা

স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা: যুক্তরাষ্ট্রে সেবার জন্য কোনো ধরনের রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থায়নকৃত স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা নেই। কেবলমাত্র তিনটি দল রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য সেবা বন্দোবস্ত থেকে সুবিধা পেয়ে থাকে: সেনাবাহিনী, ৬৫ বছরের বেশি বয়স্ক ব্যক্তি এবং অসহায়রা। শেষোক্ত দুটি দল দিন দিনই খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজের বড় একটি অংশ বহুদিন ধরে সীমিতভাবে বীমাকৃত অথবা একেবারেই স্বাস্থ্য বীমাহীন। রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার প্রশাসন ব্যবস্থায় পাস হওয়া স্বাস্থ্য সেবা সংস্কার বিলটি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থায় একটি মৌলিক পরিবর্তন নির্দেশ করে।

শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা ব্যবস্থা: যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মীয় ও পাবলিক বিদ্যালয় ব্যবস্থায় বিভক্ত এবং শেষোক্ত ব্যবস্থাটি স্থানীয়ভাবে সংগঠিত ও অর্থায়িত। নিজস্ব নিয়মনীতি ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে এই ব্যবস্থাকে একটি সুবিধাজনক ব্যবস্থা বলা যায়, কিন্তু এর ফলাফল হচ্ছে গুণগত পার্থক্য ও বৈষম্য সৃষ্টি। যেহেতু বিদ্যালয়গুলো আয়কর হতে অর্থায়নের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, বিত্তবান গোষ্ঠী শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশি রাজস্ব বিনিয়োগ করতে পারে। অন্যদিকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার মত খুব সামান্যই সম্পদ থাকে। যার ফলে একজন ব্যক্তির বেড়ে ওঠার স্থান ও পরিবেশ অনেকক্ষেত্রে তার শিক্ষার মান নির্ধারণ করে। এসব কিছুর পরও যুক্তরাষ্ট্রে সামগ্রিকভাবে উচ্চশিক্ষিত মানুষের হার সারা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ।

সারমর্ম: যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি উভয়ই একটি দুর্বল, গৌণ রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, যার লক্ষ্যই হল ব্যক্তির জন্য সর্বোচ্চ সম্ভাব্য (নেতিবাচক) স্বাধীনতার অনুমোদন দেওয়া। রাজনৈতিক মৌলিক অধিকারের অগ্রাধিকার থাকলেও সেখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের কোনো ভূমিকা নেই। একইভাবে রাষ্ট্র বাজার বা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য খুব কমই হস্তক্ষেপ করে অথবা একেবারেই করে না, এবং আন্তর্জাতিক চুক্তিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হতেও অনাগ্রহ প্রকাশ করে। এসবের কারণ হল একটি বিভক্ত, রাজ্যভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং একটি উদারনৈতিক, ধর্মভিত্তিক ও রিপাবলিকান সংস্কৃতি। এর অর্থ হল, যুক্তরাষ্ট্র যখন কোনো অর্থনৈতিক সূচক, যেমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ভাল করে তখন সামাজিক বিচ্ছিন্নতার (social exclusion) পর্যায়ে অত্যন্ত খারাপ করে।

উদাহরণস্বরূপ, শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে অন্যান্য দেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের দারিদ্র্যের হার সর্বোচ্চ। জিনি সহগ (Gini coefficient) যা অসমতার মাত্রা পরিমাপ করে তা তুলনামূলকভাবে বেশি। সামাজিক গণতন্ত্রের মানদণ্ড হচ্ছে এর জন্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি দান প্রয়োজনীয়। তবে এই মানদণ্ড অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান অত্যন্ত বাজে। মৌলিক অধিকার, রাজনৈতিক ব্যবস্থা অথবা সহায়তা কর্মসূচি যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা হোক না কেন, একটি বিষয় পরিষ্কার যে এগুলোর প্রত্যেকটিই প্রচুর পরিমাণে উদারনৈতিক উপাদান ধারণ করে। এটি আসলে একজন ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে যে সে যুক্তরাষ্ট্রকে নিম্ন সম্পৃক্ত সামাজিক গণতন্ত্র হিসেবে দেখে নাকি পুরোপুরি উদারনৈতিক রাষ্ট্র

হিসেবে বিবেচনা করে। তবে শেষোক্ত ধারণাটির বিশুদ্ধ রূপ কেবলমাত্র তাত্ত্বিকভাবেই সম্ভব। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে, যদিও তা একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের। প্রেসিডেন্ট ওবামার সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা সফল হয় কিনা সেটি দেখার বাকি আছে। আর্থিক মন্দার প্রভাব যা যুক্তরাষ্ট্রে সৃষ্ট এবং এর অর্থনীতিকে তীব্রভাবে আঘাত করেছে; যুক্তরাষ্ট্রের মানুষকেও পুনরায় ভাবতে বাধ্য করেছে। এই অবস্থায় টিকে থেকে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের রূপ লাভ করবে কিনা তা সময়ই বলে দেবে।

যুক্তরাষ্ট্র		
চাকরির হার ২০০৮	৭০.৯% (৬৫.৫%)	মোট জনসংখ্যার তুলনায় ১৫-৬৪ বয়সী মানুষের চাকরির হার (নারীদের) (সূত্র: ইউরোস্ট্যাট)
পুরুষের তুলনায় নারীর আয়	৬২%	পুরুষের তুলনায় নারীর আয়ের হার (সূত্র: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স, ২০০৯ পৃ-১৮৬)
বেকারত্বের হার ২০০৮	৫.৮%	অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার মধ্যে বেকারের অনুপাত (সূত্র: ইউরোস্ট্যাট)
দীর্ঘ সময় ধরে বেকারত্বের হার ২০০৮	০.৬%	অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে (১২ মাস বা অধিক) বেকারের অনুপাত (সূত্র: ইউরোস্ট্যাট)
আয়ের অসমতা/ জিনি সহগ ২০০৯	৪০.৮%	আয়ের অসমতা নির্দেশকারী অনুপাত মান যত বেশি অসমতা তত বেশি (সূত্র: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ২০০৯ পৃ-১৯৫)
মানব দারিদ্র্য সূচক ২০০৯	১৫.২%	মানব দারিদ্র্য সূচক কয়েকটি নির্দেশক নিয়ে গঠিত (গড় আয়ু, স্বাক্ষরতার হার, স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ) [০ = সর্বনিম্ন দারিদ্র্য, ১০০ = সর্বোচ্চ দারিদ্র্য] (সূত্র: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ২০০৯ পৃ-১৮০)
শিক্ষা লাভে আর্থ-সামাজিক পটভূমির গুরুত্ব ২০০৬	১৭.৯%	আর্থ-সামাজিক পটভূমির কারণে শিক্ষার্থীদের ফলাফলের পার্থক্যের অনুপাত (সূত্র: ওইসিডি, ২০০৭)
শ্রমিক সংগঠনের ঘনত্ব ২০০৭	১১.৬%	অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় মানুষের মধ্যে শ্রমিক সংগঠনের সাথে জড়িতদের অনুপাত (সূত্র: ওইসিডি, ২০০৭)

আরো জানতে পড়ুন-

লেও হিনশম্যান (২০০৬), 'ইউএসএ: রেসিডুয়াল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অ্যান্ড লিবারটেরিয়ান ডেমোক্রাসি', ইন: থমাস মেয়ার (সং.), প্র্যাক্সি ডার সোজিয়ালেন ডেমোক্রাটি, উইজবাডেন, পৃষ্ঠা ৩২৭-৭৩।

উইনান্ড গেলনার অ্যান্ড মার্টিন ক্লেইবার (২০০৭), ডাস রেজিয়ারুংসসিসটেম ডার ইউএসএ, আইনে আইনফুরুং, বাডেনবাডেন ডেমোক্রাটি, উইজবাডেন, পৃষ্ঠা ১১৯-১৫৩।

৫.২ যুক্তরাজ্য

ক্রিশ্চিয়ান ক্রেল

একটি স্বল্প সম্পৃক্ত সামাজিক গণতন্ত্র

ভূমিকা

সামাজিক গণতন্ত্র তত্ত্বের কাঠামো অনুযায়ী যুক্তরাজ্যকে স্বল্প সম্পৃক্ত সামাজিক গণতন্ত্র হিসেবে বর্ণনা করা যায়। যার অর্থ হল নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারগুলোও এখানে প্রয়োগ হয়। মৌলিক অধিকারের ওপর ভিত্তি করে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে রাষ্ট্রীয় কল্যাণ কর্মসূচি রয়েছে। তবে সামাজিক সেবাগুলো কেবলমাত্র স্বল্প পরিমাণে দেওয়া হয়। মৌলিক অধিকারগুলোর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি রয়েছে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাস্তবে প্রয়োগ হয় না। অতএব, সামাজিক ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিচারে যুক্তরাজ্য সামাজিক গণতন্ত্রের প্রান্তীয় সীমা নির্দেশ করে।

কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রারম্ভিক উন্নয়ন

যুক্তরাজ্যে রাষ্ট্রীয় কল্যাণ কর্মসূচি দুর্বলভাবে গড়ে উঠেছে, যা অত্যন্ত বিস্ময়কর, কারণ কল্যাণ রাষ্ট্রের উপাদানগুলো সেখানে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের থেকে আগে গড়ে উঠেছে। আঠারো শতকের বাণিজ্য প্রসার এবং প্রযুক্তির উদ্ভাবন কেবলমাত্র সমৃদ্ধিই বয়ে আনে নি বরং শিল্পায়নের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক সমস্যা, যেমন দারিদ্র্য, পুষ্টিহীনতা ও দুর্বল স্বাস্থ্য, শিশু শ্রম এবং অপর্যাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তা, এসবের পরিমাণও বৃদ্ধি করেছে।

এসব সামাজিক ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাজ্যে কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদানগুলো অপেক্ষাকৃত আগেই গড়ে ওঠে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে শুরুতেই একটি বোধগম্য কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রশ্ন ছিল না। এর কারণ যুক্তরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী রাজনীতি ও সংস্কৃতির কাঠামোর মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে। ব্রিটিশ রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে উদারনীতি দীর্ঘদিন ধরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে, যা মুক্ত বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব করেছে এবং কিছু পরিমাণ রাজনৈতিক অধিকারও দান করেছে। তবে সামাজিক বিষয়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ ছিল। বরং আঠারো ও উনিশ শতকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতিগুলো 'লেইসে ফেয়া' (laisser-faire) উদারনীতি অর্থাৎ 'সরকার হস্তক্ষেপ করবে না' অনুযায়ী গড়ে উঠেছিল।

তথাপি একটি নিম্নমানের কল্যাণ রাষ্ট্র

রাষ্ট্রীয় সামাজিক সেবাগুলোর উন্নয়নের অভাব দাতব্য ও ব্যক্তিগত জনহিতকর কর্মকাণ্ড দ্বারা আংশিকভাবে পূরণ হয়। অগণিত দাতব্য সংস্থা ও ব্যক্তিগত অনুদান যুক্তরাজ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অ-রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যা এখনো টিকে আছে। তবে যে সমস্যাটি সবসময় দেখা যায় তা হল সব দুঃস্থ ব্যক্তিকে এই নগণ্য সাহায্য দ্বারা সহযোগিতা করা সম্ভব হয় না। উনিশ শতকে যুক্তরাজ্যে এসব সংস্থার পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী অনেক শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল।

তবে যুক্তরাজ্যে জার্মানির মত সংঘবদ্ধ কোনো শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে নি, যার ফলে এখানকার শ্রমিক সংগঠনগুলো এখন পর্যন্ত বিভক্ত।

১৯০০ সালের শ্রমিক সংগঠনের আন্দোলন থেকে যুক্তরাজ্যে সামাজিক গণতন্ত্রপন্থী লেবার পার্টির জন্ম হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লেবার পার্টি যুক্তরাজ্যের দ্বিতীয় শক্তিশালী দলে পরিণত হয় এবং অবশেষে ১৯৪৫ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করে। লেবার পার্টির নেতৃত্বের অধীনে ব্রিটিশ কল্যাণ রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটা সম্ভব ছিল।

যুদ্ধ-পরবর্তী ঐকমত্য ও 'সামাজিক চুক্তি'

কনজারভেটিভ পার্টি ও লেবার পার্টি কল্যাণ রাষ্ট্রের মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ ছিল। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশদের মতামত এবং বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির মধ্যকার সামাজিক চুক্তি প্রায়ই প্রতিরোধের সম্মুখীন হত।

থ্যাচার-এর যুগ

১৯৭০-এর শেষ দিকে কনজারভেটিভ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার বলিষ্ঠভাবে সামাজিক চুক্তির সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং রাষ্ট্রের পরিধি গুটিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান। যুদ্ধ পরবর্তী রাজনীতির ধারণার বিপরীতে গিয়ে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, রাষ্ট্র সকলের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে দায়বদ্ধ নয়। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর স্বাধীন ভূমিকা পালনে কোনো ধরনের রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ আইনপূর্বক নিষিদ্ধ করতে হবে। রাষ্ট্রের কাজ হওয়া উচিত অর্থনৈতিক কার্যাবলী বিশেষ করে অর্থের যোগানের জন্য কাঠামোগত শর্তগুলোর স্থায়িত্ব দানে জোর দেওয়া। এ কারণে থ্যাচার আধিপত্যপূর্ণ কনজারভেটিভ সরকারের শাসনামল ১৯৭৯-১৯৯৭ কে ব্রিটিশ অর্থনীতির বিভিন্ন অংশের ব্যক্তি মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণহীন হওয়ার সময় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

থ্যাচারের নীতির ফলাফলের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাজ্যের দারিদ্র্য হারের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং সামাজিক অসমতা বৃদ্ধি। এটি এবং অন্যান্য নির্দেশকগুলো থ্যাচার-পরবর্তী যুক্তরাজ্যকে কেবলমাত্র একটি সীমিত সামাজিক গণতন্ত্র হিসেবে নির্দেশ করে।

টনি ব্লেয়ার ও লেবার পার্টি

কেবলমাত্র ১৯৯৭ সালে টনি ব্লেয়ার এবং লেবার পার্টি নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে যুক্তরাজ্য পুনরায় সামাজিক গণতন্ত্রের প্রতি উন্নীত হওয়া শুরু করে। লেবার পার্টির ঘোষণাকৃত লক্ষ্য ছিল - সকলের জন্য সামাজিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা - ব্যাপক পদক্ষেপ দ্বারা সমর্থিত হয়। যুক্তরাজ্যের সামাজিক গণতন্ত্রের পথে পুনরায় অগ্রযাত্রার কয়েকটি নির্দেশক হল সামাজিক সেবাগুলোর ব্যাপক বিস্তার, বিশেষ করে স্বাস্থ্য সেবা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে স্থিরকৃত দারিদ্র্যমোচন ব্যবস্থা এবং ন্যূনতম মজুরি ব্যবস্থা চালু করা। টনি ব্লেয়ার ক্ষমতায় থাকাকালীন যখন অনেক ওইসিডি রাষ্ট্রের দারিদ্র্য হারের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে তখন যুক্তরাজ্যের দারিদ্র্য হার হ্রাস এবং নিম্ন বেকারত্বের হার এই ব্যবস্থার সাফল্য প্রমাণ করে।

তবে থ্যাচার যুগের মুক্ত শ্রমবাজার এবং উদারনৈতিক অর্থনৈতিক কাঠামো ব্যবস্থাপনা, ব্লেয়ার-এর কর্তৃত্বপূর্ণ রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রের কাছের মিত্র হিসেবে ইরাক বিষয়ে গৃহীত নীতি থেকে বোঝা যায় যে ব্রিটিশদের তৃতীয় পন্থাটি বিতর্কিত ছিল।

টনি ব্লেয়ার এর উত্তরসুরি গর্ডন ব্রাউন লেবার পার্টির মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তিনি কিছু বিষয়ে নতুন করে জোর দেন। বৈদেশিক এবং নিরাপত্তা নীতির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে গভীরভাবে অনুসরণ করার কৌশলটি আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি কৌশলে পরিণত হয়। নাগরিক সেবা ব্যবস্থায় বিনিয়োগ অব্যাহত থাকলেও সামাজিক প্রেক্ষাপটের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা

যুক্তরাজ্যকে যথার্থভাবেই ইউরোপের প্রাচীন গণতন্ত্রগুলোর একটি বলা হয়। এটি বলার পরও ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে একটি 'নির্বাচিত একনায়কতন্ত্র' হিসেবে অভিহিত করা হয়। কীভাবে এই দু'টি বৈশিষ্ট্য একই সাথে অবস্থান করে?

ব্রিটিশ আইনসভা

এই আপাত বিভেদটি একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মাধ্যমে দূর হয়। 'গৌরবময় বিপ্লবের' (১৬৮৮-৮৯) পর থেকে ব্রিটিশ আইনসভা ক্রমাগতভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। শতাব্দী ধরে সিংহাসনের অধিকারীর অধিকার ও দায়িত্বগুলো উচ্চ কক্ষ ও নিম্নকক্ষ দ্বারা গঠিত সংসদের ওপর বেশি করে অর্পিত হয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটায় যুক্তরাজ্যে সে ধরনের পরিবর্তন কখনোই সংঘটিত হয়নি। পূর্বে রাজমুকুটে যে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল তা বর্তমানে সংসদের ওপর ন্যস্ত।

কাজেই সংসদের স্বাধীনতা প্রায় সীমাহীন এবং কোনো উচ্চতর আইন অথবা সংবিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এই অবাধ স্বাধীনতা বর্তমানে সর্বোপরি নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ওপর কেন্দ্রীভূত হয়।

শক্তিশালী সরকার

বর্তমানে দু'টো বিষয় সরকারের ক্ষমতাকে আরও বেশি শক্তিশালী করে। প্রথমত, যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রভিত্তিক গঠন নির্দেশ করে যে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা গৃহীত আইনকে প্রভাবিত করার মত প্রভাবশালী অঞ্চল বা রাজ্য নেই। দ্বিতীয়ত, 'সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত বিজয়ী' (first-past-the-post) নির্বাচনী ব্যবস্থা এটিই বলে যে, সাধারণত একটি দল নিরঙ্কুশভাবে বিজয়ী হয়। জোট সরকার সংকটময় পরিস্থিতি ছাড়া সাধারণত হয় না, তা প্রয়োজনীয়ও নয়। কনজারভেটিভ পার্টি ও লেবার পার্টি পর্যায়ক্রমে সরকার গঠন করে। এই দুটি দলের পাশাপাশি উদারপন্থী দলকেও ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী দল হিসেবে উল্লেখ করা যায়। ব্যতিক্রমীভাবে তারা কনজারভেটিভ পার্টির সাথে ছোট অংশীদার হিসেবে জোট গঠন করে সরকার গঠন করে। 'সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত বিজয়ী' ব্যবস্থার কারণে অন্যান্য দলগুলো জাতীয় পর্যায়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সমস্যায় পড়ে।

সম্প্রতি ভোটারদের আচরণের বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে, যার ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর দৃশ্যপটেরও পরিবর্তন হয়েছে। ২০১০ সালে উদারপন্থীরা রক্ষণশীলদের সাথে ছোট অংশীদার হিসেবে ব্যতিক্রমীভাবে একটি জোট সরকার গঠন করে। এছাড়া ক্ষুদ্র দলগুলো, যেমন গ্রীন পার্টি এবং চরম ডানপন্থী ব্রিটিশ জাতীয় দলের সমর্থন বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় দলগুলো সমর্থন হারাচ্ছে। তবে জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচনী ফলাফল স্থায়ী এবং নিরঙ্কুশ হয়ে থাকে।

সামাজিক গণতন্ত্রের উন্নয়ন ভবিষ্যৎ উন্মুক্ত করে

রাষ্ট্রের কেন্দ্রভিত্তিক কাঠামো, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং একটি সার্বভৌম সংসদ এটিই প্রকাশ করে যে, সরকারের কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলোর মৌলিক পরিবর্তন তাই খুব দ্রুত ও সার্বিকভাবে আনা সম্ভব। অতএব, ভবিষ্যতে যুক্তরাজ্যে সামাজিক গণতন্ত্রের উন্নয়নের ধারা অন্যান্য অনেক দেশের চেয়ে অনেক উন্মুক্ত।

মৌলিক অধিকারের কাঠামো

প্রারম্ভিক মৌলিক অধিকার

যুক্তরাজ্য মৌলিক অধিকার প্রসঙ্গে আরেকটি আপাত অসংগতির দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। একদিকে ম্যাগনা কার্টা (১২১৫) ও অধিকার বিল (Petition of Rights) (১৬২৮) দ্বারা অনেক আগে থেকেই শুরুর দিকের মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করা হয়েছিল, যদিও খুব কম সংখ্যক মানুষ দ্বারা এই অধিকারের সূচনা ঘটে। এই অধিকারগুলো মূলত স্বৈরতন্ত্রের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল, আর তাই এগুলো নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যের কোনো একক দলিলভিত্তিক লিখিত সংবিধান নেই। কাজেই মৌলিক অধিকারের কোনো সাংবিধানিক রূপ যুক্তরাজ্যের নেই।

তবে যুক্তরাজ্য ১৯৭৬ সালে জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক চুক্তিতে অনুস্বাক্ষর করে। মানবাধিকার বিষয়ক ইউরোপীয় চুক্তিটি ১৯৯৮ সালের ব্রিটিশ আইনে লিপিবদ্ধ হয়।

মৌলিক অধিকারগুলো কি সত্যিই কার্যকর?

আনুষ্ঠানিক বৈধতা দেওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাজ্যে কিছু ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের বাস্তব প্রভাব অত্যন্ত কম। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যুক্তরাজ্যে প্রাচীনকাল থেকে বিরাজমান উচ্চ দারিদ্র্যের হার একটি মানসম্মত জীবনযাত্রার অধিকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসার পর থেকে কিছু মৌলিক অধিকার আগের তুলনায় আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সর্বনিম্ন মজুরি এবং খণ্ডকালীন ও স্থায়ী কর্মচারীদের জন্য একই বেতন কাঠামো ও কর্মপরিবেশ প্রদানে নিয়োগকর্তাদের বাধ্যবাধকতার কথা উল্লেখ করা যায়।

রাজনৈতিক অর্থনীতি

যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি মুক্তবাজার অর্থনীতির সর্বোচ্চ পর্যায়ভুক্ত। সমন্বিত বাজার অর্থনীতির তুলনায় তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজার এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

বাজার ব্যবস্থার ব্যাপক গুরুত্ব

বাজার ব্যবস্থার ব্যাপক গুরুত্ব নিয়োগকর্তা ও কর্মীর মধ্যকার মজুরি নির্ধারণ আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যায়। যেহেতু নিয়োগকারীদের সংগঠন ও শ্রমিক সংগঠনগুলো দুর্বলভাবে গড়ে উঠেছে ও বিভক্ত, সেহেতু কর্মী ও কোম্পানির মধ্যে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়ে থাকে। কাজেই বাজারের যে পর্যায়ে শ্রমিক পাওয়া যায়, পারিশ্রমিকও সরাসরি সেই পর্যায়ে নির্ধারিত হয়। অংশগ্রহণ অথবা যৌথ নির্ধারণ (codetermination) ব্যবস্থা (যা জার্মানির কয়লা ও ইস্পাত শিল্পে দেখা যায়) যুক্তরাজ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত।

নমনীয় শ্রম বাজার

চাকরির নিরাপত্তা দুর্বল বলে যুক্তরাজ্যে কর্মী ছাঁটাই করা সহজ। তারপরও যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীরা এই শিথিল শ্রম বাজার ব্যবস্থায় খুব সহজেই নতুন কাজ খুঁজে পায়।

সর্বোপরি একজন কর্মীর পক্ষে একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করার মেয়াদকাল তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত হয়। যার ফলে একটি নির্দিষ্ট কোম্পানি বা অর্থনীতির নির্দিষ্ট শাখার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করে কর্মীদের খুব বেশি লাভ হয় না। এটি আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় যুক্তরাজ্যের নিম্ন উৎপাদন ক্ষমতার কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম।

এই নিম্ন উৎপাদন ক্ষমতার কারণে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতে শিল্পের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। তবে সেবা খাত অনেক বেশি শক্তিশালী। বিশ্বের প্রধান আর্থিক কেন্দ্রগুলোর একটি হল লন্ডন নগরী। আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান ও বীমা কোম্পানিগুলোর এখানে খুব শক্তিশালী উপস্থিতি দেখা যায়। ব্রিটিশ কর্মজীবীদের প্রায় ৭৬ শতাংশ সেবা খাতের সাথে জড়িত।

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন প্রধানত আর্থিক বাজারের মাধ্যমে পেয়ে থাকে, যার ফলে তারা দ্রুত মুনাফা লাভের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। আরও দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়ন ব্যবস্থা, যেমন জার্মানির হাউস ব্যাংকিং (house banking - জার্মানির কোম্পানিগুলোর একটি দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য হল একটি নির্দিষ্ট ব্যাংকের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক থাকা) যুক্তরাজ্যে প্রায় অপরিচিত। এই কারণে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি স্বল্প মেয়াদী ও সর্বোচ্চ মুনাফালাভী ব্যবস্থার চক্রে পতিত হয়েছে।

কল্যাণ রাষ্ট্র

কল্যাণ রাষ্ট্রের মিশ্র বৈশিষ্ট্য

কল্যাণ রাষ্ট্রের তুলনামূলক গবেষণায় ব্রিটিশ কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণাকে সাধারণত 'মিশ্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ' হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এটি এই ঘটনারই প্রতিফলন যে ব্রিটিশ কল্যাণ রাষ্ট্র কয়েকটি ভিন্ন যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা একই ব্যবস্থার মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কিছু রাষ্ট্রীয় সেবা, যেমন স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা সর্বজনীনভাবে প্রদান করা হয়। অর্থাৎ দেশের সব ব্যক্তিকেই এই সেবা দেওয়া হয়। আবার অন্যান্য সেবা কেবলমাত্র আর্থিক সংগতি নিরীক্ষার ভিত্তিতে দেওয়া হয়, যা অনেক ক্ষেত্রে অবমাননাকর বলে বিবেচিত হয়। এসব সত্ত্বেও যুক্তরাজ্যকে একটি উদারপন্থী কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেবলমাত্র মৌলিক অধিকারগুলো পূরণ করে থাকে; মৌলিক অধিকার-বহির্ভূত প্রয়োজনগুলো মুক্ত বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে পূরণ করতে হয়।

স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা

স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা: ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় সেবার প্রধান অংশ হল জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা (এনএইচএস)। কার রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা এই সেবা প্রকল্পটির অর্থায়ন হয় যা বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ ও পণ্যের যোগান সুনিশ্চিত করে। এনএইচএস-এর সর্বজনীনতা ছাড়া আরও একটি প্রধান সুবিধা হল এর উচ্চ মাত্রার স্বচ্ছতা। তবে বহু বছর ধরে এনএইচএস প্রকল্পে অর্থায়নে ঘাটতি বিদ্যমান, যা সেবা ব্যবস্থাটিতে দীর্ঘসূত্রতার জন্ম দিয়েছে, যার প্রকাশ ঘটে কিছু অস্ত্রোপচারের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করার মাধ্যমে। ২০০০ সাল থেকে এই প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিয়োগ ঘটে।

সামাজিক নিরাপত্তা

সামাজিক নিরাপত্তা: জাতীয় বীমা ব্যবস্থা বেশ কিছু ঝুঁকি ও বিপদের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। এসব বিপদের মধ্যে রয়েছে বার্ধক্য, বেকারত্ব, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এবং অক্ষমতা। আয়ের সাথে আনুপাতিকভাবে দানকৃত অর্থের ভিত্তিতে জাতীয় বীমা ব্যবস্থার অর্থায়ন করা হয়ে থাকে। প্রদত্ত সুবিধাগুলো প্রাথমিক পর্যায়ের এবং কেবলমাত্র মৌলিক নিরাপত্তা দান করে। কোনো ব্যক্তি যদি এই মৌলিক নিরাপত্তাকে আরও পূর্ণাঙ্গ করতে চায় তবে তাকে অবশ্যই মুক্তবাজার থেকে তা অর্জন করতে হবে।

সামাজিক সহায়তা

সামাজিক সহায়তা: যারা অবদান-ভিত্তিক সুবিধার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যাদের ব্যক্তিগতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের সংগতি নেই, জাতীয় সহায়তা ব্যবস্থা তাদের বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। এসব সুবিধা কর দ্বারা অর্থায়নকৃত এবং সাধারণত কঠোরভাবে আর্থিক সংগতি নিরীক্ষাভিত্তিক। এর অর্থ হল এসব সুবিধা কেবলমাত্র তখনই ভোগ করা যাবে যখন আবেদনকারী প্রমাণ করবে যে তারা সত্যিই দুঃস্থ এবং নিজেদের সাহায্য করার তাদের আর কোনো উপায় নেই।

শিক্ষা ব্যবস্থা:

যুক্তরাজ্যের বিদ্যালয় ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় (বৈতনিক) এবং ব্যক্তি-মালিকানাধীন (বিভ্রান্তিকরভাবে যা 'পাবলিক' নামে পরিচিত) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। কারও কারও মতে একটি ক্ষুদ্র, উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন অভিজাত শ্রেণি থাকার পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাধারণ মান অত্যন্ত হতাশাজনক হওয়ার জন্য যুক্তরাজ্যের এরূপ শিক্ষা ব্যবস্থাই আংশিকভাবে দায়ী। সামাজিক পদমর্যাদা এবং শিক্ষা লাভের মধ্যে অত্যন্ত সরল সম্পর্ক বিদ্যমান। কাজেই লেবার পার্টির একটি পূর্বঘোষিত লক্ষ্য ছিল শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নয়ন ঘটানো। এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্য ব্রাউন-এর সরকার দ্বারা গৃহীত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল বাধ্যতামূলক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণের বয়সসীমাকে ধীরে ধীরে ১৬ থেকে ১৭ বছরের উন্নীত করা। এর লক্ষ্য ছিল যুক্তরাজ্যকে এমন একটি রাষ্ট্রে পরিণত করা যেখানে বেশিরভাগ ১৬ থেকে ১৮ বছরের বয়সসীমা হয় কর্মক্ষেত্রে অথবা শিক্ষা বা প্রশিক্ষণে নিয়োজিত থাকবে।

এই সময়ে শিক্ষা খাতে প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ ঘটে, যদিও শিক্ষার্থী ফি-এর প্রবর্তনসহ বেশ কিছু বিতর্কিত পদক্ষেপ এ সময় গৃহীত হয়।

সারমর্ম

১৯৯০ সালের পর থেকে যুক্তরাজ্য পুনরায় সামাজিক গণতন্ত্রের দিকে উন্নতি শুরু করে। লেবার পার্টির ঘোষণাকৃত লক্ষ্য ছিল প্রাথমিকভাবে শ্রম বাজারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সবার জন্য সামাজিক সেবা নিশ্চিত করা। সামাজিক সুযোগ-সুবিধাগুলো তাদের লক্ষ্য করেই গড়ে তোলা উচিত যারা প্রকৃতপক্ষেই দুঃস্থ ও অসহায়, এবং যত বেশি সম্ভব ততজনকে ও খুব বেশি পরিমাণে দেওয়া উচিত নয়। একইসাথে সামাজিক সহায়তা ব্যবস্থাটি এই শর্ত সাপেক্ষে ছিল যে সহায়তা-প্রত্যাশী প্রার্থীরা নিজেদেরকে সাহায্য করতে সচেষ্ট হবে। স্থায়ী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং একটি কর্মতৎপরতার শ্রম বাজার নীতি যুক্তরাজ্যে ২০০৯ সাল পর্যন্ত উচ্চ চাকরির হার বজায় রেখেছিল। ফলস্বরূপ, একদিকে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পাচ্ছিল এবং অন্যদিকে সামাজিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

তবে ধারাবাহিক উচ্চ দারিদ্র্যের হার, সামাজিক সুবিধার নিম্ন মান এবং অসমভাবে বণ্টনকৃত শিক্ষা সুযোগের ওপর ভিত্তি করে লেবার পার্টি সরকারের শেষ সময়কালীন যুক্তরাজ্য অবশ্যই একটি স্বল্প-সম্পৃক্ত সামাজিক গণতন্ত্র হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সামাজিক গণতন্ত্রের প্রান্তীয় সীমায় অবস্থান করবে। কনজারভেটিভ পার্টি বা লেবার পার্টি সরকারের অধীনে বিষয়গুলো কিভাবে উন্নতি লাভ করে তা-ই দেখার বাকি আছে।

যুক্তরাজ্য		
চাকরির হার ২০০৮	৭১.৫% (৬৫.৮%)	মোট জনসংখ্যার তুলনায় ১৫-৬৪ বয়সী মানুষের চাকরির হার (নারীদের) (সূত্র: ইউরোস্ট্যাট)
পুরুষের তুলনায় নারীর আয়	৬৭%	পুরুষের তুলনায় নারীর আয়ের হার (সূত্রঃ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স, ২০০৯ পৃ-১৮৬)
বেকারত্বের হার ২০০৮	৫.৬%	অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার মধ্যে বেকারের অনুপাত (সূত্র: ইউরোস্ট্যাট)
দীর্ঘ সময় ধরে বেকারত্বের হার ২০০৮	১.৪%	অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে (১২ মাস বা অধিক) বেকারের অনুপাত (সূত্র: ইউরোস্ট্যাট)
আয়ের অসমতা/ জিনি সহগ ২০০৯	৩৬%	আয়ের অসমতা নির্দেশকারী অনুপাত মান যত বেশি অসমতা তত বেশি (সূত্র: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ২০০৯ পৃ-১৯৫)
মানব দারিদ্র্য সূচক ২০০৯	১৪.৬%	মানব দারিদ্র্য সূচক কয়েকটি নির্দেশক নিয়ে গঠিত (গড় আয়ু, স্বাক্ষরতার হার, স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ) [০ = সর্বনিম্ন দারিদ্র্য, ১০০ = সর্বোচ্চ দারিদ্র্য] (সূত্র: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ২০০৯ পৃ-১৮০)
শিক্ষা লাভে আর্থ-সামাজিক পটভূমির গুরুত্ব ২০০৬	১৩.৯%	আর্থ-সামাজিক পটভূমির কারণে শিক্ষার্থীদের ফলাফলের পার্থক্যের অনুপাত (সূত্র: ওইসিডি, ২০০৭)
শ্রমিক সংগঠনের ঘনত্ব ২০০৭	২৮%	অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় মানুষের মধ্যে শ্রমিক সংগঠনের সাথে জড়িতদের অনুপাত (সূত্র: ওইসিডি, ২০০৭)

আরো জানতে পড়ুন-

ক্রিসচিয়ান ক্রেল (২০০৬), 'ল্যাগার্ড অর লিডার? - ডার ব্রিটিশচে সোজিয়ালস্টাট ইম স্পাইগেল ডার সোজিয়ালেন ডেমোক্রাটি', ইন: থমাস মেয়ার (সং.), প্র্যাক্সি ডার সোজিয়ালেন ডেমোক্রাটি, উইসবাডেন, পৃষ্ঠা ১৩০-২৪১।

আলেকজান্ডার পেট্রিং (২০০৬), 'গ্রোবব্রিটাননিয়েন', ইন: উলফগ্যাং মার্কেল ইথাল (সং.), ডাই রিফরমফাহিগক্রিট ডার সোজিয়ালেন ডেমোক্রাটি, উইজবাজেন, পৃষ্ঠা ১১৯-৫৩।

৫.৩ জার্মানি

ক্রিস্টোফ এগলে

সামাজিক গণতন্ত্রের একটি সাফল্যের গল্প?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় জার্মানির[২১] সামাজিক গণতন্ত্রকে সফল বলা যায়। নাজি শাসনামলের পর জার্মানি আর কখনো একটি শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হতে পারবে কিনা এই সংশয় জার্মানিতে স্থায়ী গণতন্ত্র ও একটি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দূর হয়েছে। স্বীকার করতেই হবে যে রাষ্ট্র ও সমাজের গণতন্ত্রায়ন পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছে ১৯৬০ সালের শেষ দিকে। নাজি শাসনকালের লজ্জা এবং ওয়েইমার প্রজাতন্ত্রের ধ্বংস জার্মানির রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একটি অক্ষয় চিহ্ন রেখে গেছে। দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে কেউ হয়তো তীব্র জাতীয়তাবাদের বিসর্জন ও যেকোনো প্রকার চরমপন্থার বিষয়ে গভীর সংশয়ের কথা উল্লেখ করতে পারে। তবে এর বিপরীতে আপোষের সন্ধান করা এবং আপোষের উপায় খুঁজে বের করা জার্মানিতে গুরুত্বপূর্ণ গুণ বলে বিবেচিত হয়।

'মডেল জার্মানি'

১৯৪৫ সালের পর পুনঃগণতন্ত্রায়নের পাশাপাশি অর্থনীতির অবিশ্বাস্য উন্নতি জার্মানিকে অন্যান্য পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশগুলোর আদর্শ হিসেবে আবির্ভূত হতে সাহায্য করেছে। এই উন্নতি অর্থনৈতিক কার্যক্রম, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক ভারসাম্যের একটি প্রায় অনন্য সন্নিবেশের ওপর ভিত্তি করে সম্ভব হয়েছে। জার্মানির সামাজিক গণতন্ত্র ব্যবস্থাও নিজেকে রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধারা দ্বারা পরিচিত করে, যাকে রাজনৈতিক মূল্যবোধের অনুধাবন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন, ১৯৭৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে এসপিডি আদর্শ জার্মানির ('মডেল জার্মানি') ধারণাকে কেন্দ্র করে নির্বাচনী প্রচারণা চালায়। তবে জার্মানির পুনর্মিলনীর পর এটি ক্রমাগত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে জার্মানি আর এই আদর্শ অনুযায়ী টিকে থাকতে পারছে না এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পিছিয়ে পড়ছিল। এটি খুবই কৌতুহলোদ্দীপক যে ১৯৮০'র দশকে অগ্রগতি প্রাপ্ত বেশ কিছু বিষয় যা জার্মান আদর্শের সফলতায় ভূমিকা রেখেছিল সেগুলোকে ১৯৯০-এর দশকে জার্মানির ব্যর্থতার জন্য দায়ী বলে চিহ্নিত করা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সরকার ব্যবস্থা যা পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির (বিশ্বায়ন) সাথে খুব দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারত না এবং কল্যাণ রাষ্ট্র ব্যবস্থার নির্দিষ্ট কিছু কাঠামো, যা কিছু ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান তৈরিতে বাধা বলে প্রমাণিত হয়েছে (বিশেষকরে নিম্ন যোগ্যতাপূর্ণ ব্যক্তি ও নারীদের জন্য)। অন্যদিকে এটিকে সৌভাগ্যই বলতে হবে যে মৌলিক আইনটি অপরিবর্তিত রয়েছে, যা মূলত কেবলমাত্র একটি পরিবর্তনাধীন সময়কালের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

[২১] দুঃখজনকভাবে পর্যাপ্ত স্থানের অভাবে পূর্ব জার্মানির (ডিডিআর) উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভব হল না।

বেসিক ল'তে মৌলিক অধিকার কাঠামো

বেসিক ল'তে নেতিবাচক ও ইতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা

ওয়েইমার প্রজাতন্ত্রের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বেসিক ল'র প্রথম ২০টি অনুচ্ছেদেই মৌলিক মানবিক ও নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যা রাষ্ট্র সংক্রান্ত প্রায় সব কিছুর উর্ধ্বে। বেসরকারি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ হতে মুক্ত থাকার উদারনৈতিক অধিকার (নেতিবাচক স্বাধীনতা) এবং অংশগ্রহণের গণতান্ত্রিক অধিকার (ইতিবাচক স্বাধীনতা) উভয়ই এই আইনের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন সামাজিক অধিকার, যেমন কাজ করার অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, শিক্ষার অধিকার অথবা সর্বনিম্ন আয়ের অধিকার মৌলিক আইনে উল্লেখ করা হয় নি, যদিও কিছু রাজ্যের সংবিধানে এসবের উল্লেখ রয়েছে। বেসিক ল'তে কোনো বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয় নি, কিন্তু এতে অনিয়ন্ত্রিত বাজার পুঁজিবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনাকৃত অর্থনীতি উভয়ের বিপক্ষেই বেশ কিছু নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন, বেসিক ল'র ১৪ অনুচ্ছেদে সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে, কিন্তু সম্পত্তির ব্যবহার জনসাধারণের জন্যও কল্যাণকর হতে হবে। এই অনুচ্ছেদটি 'সামাজিক বাজার অর্থনীতি' ধারণার মধ্য দিয়ে ব্যবহারিক রাজনৈতিক রূপ পায়।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ক্ষমতার পৃথককরণ ও সীমাবদ্ধতার উচ্চ পর্যায়

জার্মানিতে সরকার ব্যবস্থা এমনভাবে গঠন করা হয়েছিল যে গণতন্ত্রের ব্যর্থতা কোনোভাবেই সম্ভব হওয়া উচিত নয়। এই উদ্দেশ্যে উচ্চ মাত্রায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যেখানে নির্বাহীদের ক্ষমতা প্রায় যেকোনো গণতন্ত্রের তুলনায় বেশি নিয়ন্ত্রিত ছিল। অতিরিক্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিপক্ষে গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে ফেডারেল ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন (Bundesrat; বা উচ্চকক্ষের মাধ্যমে) ব্যবস্থায় রাজ্যগুলোর অংশগ্রহণ, কেন্দ্রীয় সাংবিধানিক আদালতের শক্তিশালী অবস্থান, বুনডেসবাংক-এর (Bundesbank - বর্তমানে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক) স্বাধীনতা, নাগরিক সমিতিকে কিছু রাষ্ট্রীয় কাজের দায়িত্ব প্রদান, এবং সবশেষে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রশাসনে সামাজিক অংশীদারদের অংশগ্রহণ। এই প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিজ্ঞানী পিটার কাটজেনস্টেইন একবার জার্মানিকে একটি 'প্রায়-সার্বভৌম' রাষ্ট্র হিসেবে বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে এটি বিবেচনা করা জরুরি যে ১৯৯০ সালের পূর্ব পর্যন্ত পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে জার্মানি সম্পূর্ণ সার্বভৌম ছিল না।

রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় ভূমিকা

বিভিন্ন স্বার্থের ক্ষমতা বিধানের এই প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা জার্মানির জন্য কোনো ধরনের বৈরি অবস্থা সৃষ্টি করে নি। জার্মানির সরকার ব্যবস্থা উচ্চমাত্রায় কার্যকর ও প্রতিনিধিত্বমূলক। সংসদীয় ব্যবস্থা সামাজিক উন্নয়নের (যেমন নতুন দলের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে) জন্য যথেষ্ট উদার বলে প্রমাণিত এবং সেই সাথে সরকার গঠনে স্থায়িত্ব দান করে।

আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বাইরের বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ করা হয় এবং স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলোর প্রতিনিধিদের সাথে নিয়মিত আলোচনা করা হয়। তবে একটি অবহিত মতামত গড়ে তুলতে রাজনৈতিক দলগুলোই কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে; এই প্রক্রিয়াটি সরকারি কার্যালয়গুলোতেও প্রয়োগ করা হয়। এইভাবে তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা বাদে আরও মোট ১৬টি রাজ্য সরকার ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলো অংশগ্রহণ করতে পারে, সেহেতু কোনো দলই প্রায় কখনোই নিরঙ্কুশ সরকার বা বিরোধী দল গঠন করতে পারে না। এটি বড় দুটি রাজনৈতিক দল এসপিডি এবং সিডিইউ/সিএসইউ-এর জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যার ফলে জার্মানি কখনোই একটি আনুষ্ঠানিক মহাজোট সরকার থেকে বেশি দূরে থাকে না। পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতি এই বাধ্যবাধকতা একটি 'মধ্যপন্থী নীতি'র (ম্যানফ্রেড জি স্মিট) দিকে পরিচালিত করে, বিশেষকরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির ক্ষেত্রে যা ওপরে উল্লিখিত জার্মানির রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে পুরোপুরি খাপ খেয়ে যায়।

স্থায়িত্বের দিকে জার্মানির ঝোঁকের সবলতা ও দুর্বলতা

রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ফেডারেল সরকারব্যবস্থা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যে দলীয় রাজনীতির কারণে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাহত হয় বা অসন্তোষজনক আপোষ করা হয়। ১৯৯০ সালের পর থেকে এমন অবস্থা আরও বেড়ে যায়, যখন দুই জার্মানি একীভূত হয় এবং রাজ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বর্ধিষ্ণু বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলো যথেষ্ট দ্রুত সম্পাদন করা হয় নি। জাড্যতার প্রবণতার কারণে স্থায়িত্বের প্রতি রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রাধান্য, যা দীর্ঘদিন ধরে সফলতার প্রতীক ছিল, পরবর্তীতে একটি সমস্যায় পরিণত হয়। বেশ কয়েক বছর ধরে এটিকে আরও বেশি দ্রুত 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ উপযোগী' করার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কার চলছে।

রাজনৈতিক অর্থনীতি

'রাইন পুঁজিবাদ'

সমন্বিত বাজার অর্থনীতির একটি আদর্শ উদাহরণ হচ্ছে জার্মানি, যেখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের 'হাউস ব্যাংক' থেকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের মাধ্যমে ব্যবসায়ের অর্থায়ন করে থাকে। এটি মুক্তবাজার অর্থনীতির সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ, যেখানে মূলধন বাজারের ওপর নির্ভরশীল। ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক খাতের পরস্পর নির্ভরশীলতা রাইন পুঁজিবাদেরই একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের' ওপর ভিত্তি করে একটি দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোর আওতায় স্বল্প মেয়াদী শেয়ারধারীদের প্রতি গুরুত্ব দান ব্যবস্থার চেয়ে এই ব্যবস্থায় কৌশলী ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়।

সহ-নির্ধারণ ও মুক্ত যৌথ দর-কষাকষি

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের তুলনায় গতানুগতিক 'জার্মানি এজি' হচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় (কর্মীদের প্রতিষ্ঠা পর্যায় কর্মস্থান, কর্মসূচি এবং ব্যক্তিগত বিষয়ের ব্যবস্থাপনা) এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় (পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং অন্যান্য বৃহৎ অংশীদারী কোম্পানির তত্ত্বাবধানকারী বোর্ডে প্রতিনিধিত্ব করা) উভয় ক্ষেত্রেই সুদূরপ্রসারী

অংশগ্রহণ। এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সামাজিক সম্পর্কগুলোর মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা। মালিক ও কর্মচারীদের মাঝে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে (মুক্ত সামষ্টিক আলোচনা) পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জাতীয় সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানগুলোতে আয়োজিত হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের তুলনায় শিল্প খাতে সংঘর্ষ কম এবং সাধারণত সংক্ষিপ্ত আকারে হয়ে থাকে।

তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সমন্বিত অর্থনীতির এই রূপটির মৌলিক অংশগুলোতে ভেঙ্গে পড়ার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। যার কারণ একদিকে বিশ্বায়ন অথবা এর সাথে সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজারে জার্মান প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণের বর্ধিষ্ণু প্রবণতা, এবং অন্যদিকে শিল্প ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষয়, যা শ্রমিক সংঘ এবং মালিক সমিতি উভয়েরই ক্রমাগত ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, এবং তার ফলে সমন্বয় করার ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে ঘটেছে।

কল্যাণ রাষ্ট্র

রক্ষণশীল/ করপোরেট ধাঁচের কল্যাণ রাষ্ট্র

জার্মানি হল আলোচিত রক্ষণশীল/ কর্পোরেট ধাঁচের কল্যাণ রাষ্ট্র ধারণার উৎকৃষ্ট উদাহরণ, যা 'ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক' বা 'বিসমার্ক' ব্যবস্থা নামেও পরিচিত। এই পরিভাষাটি এটি স্পষ্ট করে যে জার্মান কল্যাণ রাষ্ট্র ব্যবস্থাটি সর্বপ্রথম সামাজিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা তৈরি হয় নি, বরং এর ঐতিহাসিক আবির্ভাব ঘটে মূলত রক্ষণশীল এবং ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটদের দ্বারা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কল্যাণ রাষ্ট্র ব্যবস্থার সম্প্রসারণ দুইটি কল্যাণ রাষ্ট্র অনুসারী দল, এসপিডি ও সিডিইউ/সিএসইউ দ্বারা পরিচালিত হয়।

একটি বিশাল আর্থিক ব্যবস্থা সত্ত্বেও জার্মানির কল্যাণ রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে কেবলমাত্র মধ্য পুনর্বণ্টন ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কারণ বিদ্যমান সামাজিক বৈষম্য প্রায়ই স্থায়িত্ব পেয়ে থাকে। কল্যাণ রাষ্ট্রের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন পেশাজীবী দলের জন্য বিভিন্ন সামাজিক বীমা ও সেবা ব্যবস্থা। আবশ্যিক সামাজিক বীমা কেবলমাত্র কর্মজীবীদের জন্য প্রযোজ্য; অন্যদিকে আত্ম-কর্মসংস্থানকারী এবং সরকারি চাকরিজীবীরা সামাজিক দুর্ঘটনার বিপরীতে ব্যক্তিগতভাবে বীমা করতে পারে অথবা একটি পৃথক বীমা ব্যবস্থার (যেমন সরকারি চাকরিজীবী ভাতা) অধীন হতে পারে।

উচ্চ অতিরিক্ত পারিশ্রমিক ব্যয়

জার্মান কল্যাণ রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রধান কর্মসূচিগুলো হল বিভিন্ন স্বাধীন সামাজিক বীমা ব্যবস্থা, যা কর্মীদের মূল্যায়ন-নির্ভর বাধ্যতামূলক অবদান দ্বারা অর্থায়িত। এর সাথে প্রয়োজনমত অথবা ক্রমাগতভাবে (যেমনটি ভাতা বীমার ক্ষেত্রে হয়) কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে ভর্তুকি প্রদান করা হয়। যেহেতু কল্যাণ রাষ্ট্র ব্যবস্থার ব্যয়ভার প্রধানত ব্যক্তির পারিশ্রমিকের ওপর পড়ে এবং তাই ব্যক্তির শ্রমের মূল্যও বৃদ্ধি পায়, অর্থায়নের এরূপ ধারা কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বাধা বলে প্রমাণিত, বিশেষ করে উচ্চ শ্রম-নির্ভর সেবা ক্ষেত্রগুলোতে।

বীমা সুবিধাগুলো কম-বেশি সামঞ্জস্য নীতি-নির্ভর, যার অর্থ হল একজন কর্মী যত বেশি চাঁদা দেবে অথবা যত বেশি অর্থ আয় করবে, তার প্রাপ্য সুবিধাও তত বেশি হবে। এই কর্ম নির্ভর ব্যবস্থা স্বল্পস্থায়ী কর্মজীবীদের জন্য সমস্যার হতে পারে। তারা খুব সীমিত পরিমাণ সামাজিক সুরক্ষা পাওয়ার সামর্থ্য রাখে।

অবসর ভাতা

অবসর ভাতা: সংবিধিবদ্ধ ভাতা বীমা (সম্পূরক কোম্পানি বীমা ব্যতীত) থেকে দেওয়া আদর্শ ভাতা গড় মূল পারিশ্রমিকের প্রায় ৭০ ভাগ হয়ে থাকে। অতি সাম্প্রতিক ভাতা ব্যবস্থা সংস্কারের ফলে এর পরিমাণ দীর্ঘ মেয়াদে প্রায় ৫০ ভাগে নেমে আসবে। এই অবনমনের ক্ষতিপূরণের জন্য রাষ্ট্রীয় ভাতা এবং কর সুবিধা দেওয়া হবে এবং মানুষকে তহবিলকৃত সম্পূরক ভাতা গ্রহণে উৎসাহিত করা হবে। যদি কোনো ব্যক্তির ভাতার পরিমাণ আয় সহায়তার পরিমাণের কম হয় তাহলে যাদের বয়স হয়েছে তাদের জন্য একটি মৌলিক বীমা ব্যবস্থা কার্যকর হবে।

বেকার বীমা

বেকার বীমা: বেকার বীমা থেকে দেওয়া 'বেকার সুবিধা ১' পরিবারের অবস্থা অনুযায়ী পূর্ব বেতনের প্রায় ৬০-৬৭ ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে। গ্রহীতার বয়স এবং অবদানের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে ৬ থেকে ২৪ মাস বয়স পর্যন্ত এই সুবিধা দেওয়া হয়। এই সুবিধা শেষ হয়ে গেলে কর দ্বারা অর্থায়নকৃত 'বেকার সুবিধা ২' বা আয় সহায়তা পাওয়া যায়। এই বেকার সুবিধা ২ বা আয় সহায়তা (কাজ করতে অক্ষম এমন ব্যক্তির জন্য) গ্রহণের শর্ত হচ্ছে পরীক্ষা-নির্ভর; সেই সাথে অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয়দের কাছ থেকে তারা যে কাজ করতে আগ্রহী এবং কর্মসংস্থানের চেষ্টা করছে তার প্রমাণ উপস্থাপন করবে তা প্রত্যাশা করা হয়। এসব কল্যাণ সুবিধা আইনি বাধ্যবাধকতা, যা সবার জন্য একটি ন্যূনতম সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবিকা নিশ্চিত করে।

স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা: আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের তুলনায় সংবিধিবদ্ধ স্বাস্থ্য বীমা ব্যবস্থার সুবিধাগুলো ভাল এবং ব্যবস্থাটি অনুরূপভাবে ব্যয়বহুল। সন্তান ও কর্মসংস্থানহীন সঙ্গী তাদের অভিভাবক অথবা অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় সঙ্গীর সাথে সহ-বীমাকৃত, এবং যারা সামাজিক সুবিধা গ্রহণ করতে তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সংবিধিবদ্ধ স্বাস্থ্য বীমা ব্যবস্থার আওতাধীন সুবিধা ভোগ করে। আত্ম-কর্মসংস্থানকারী, সরকারি চাকরিজীবী এবং উচ্চ আয়কারী কর্মজীবীরা আবশ্যিক বীমা চাঁদা দিতে বাধ্য নয় এবং ব্যক্তিগতভাবে আরও ভাল শর্তে নিজেদের বীমা করাতে পারে।

শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা ব্যবস্থা

রাজ্যগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা কম-বেশি তাদের নিজেদের অধীনে একমাত্র দায়িত্ব, এবং কাঠামো ও মানের বিচারে উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক পার্থক্য নির্দেশ করে। একদিকে অনেক রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বের সেরা শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে তুলনা করা যায়, আর অন্যদিকে বাকি রাজ্যগুলোর শিক্ষার্থীরা ওইসিডি'র গড়ের চেয়েও নিম্ন মানের। এটিও

পরিষ্কার যে খুব সামান্য সংখ্যক দেশেই শিক্ষার সাফল্য শিক্ষার্থীর সামাজিক প্রেক্ষাপটের ওপর এত বেশি নির্ভরশীল। অন্য কথায় বলা যায়, জার্মানিতে সমান সুযোগের আকাঙ্ক্ষা খুব কম পরিমাণেই অর্জিত হয়েছে।

জার্মানি		
চাকরির হার ২০০৮	৭০.৭% (৬৫.৪%)	মোট জনসংখ্যার তুলনায় ১৫-৬৪ বয়সী মানুষের চাকরির হার (নারীদের) (সূত্র: ইউরোস্ট্যাট)
পুরুষের তুলনায় নারীর আয়	৫৯%	পুরুষের তুলনায় নারীর আয়ের হার (সূত্র: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স, ২০০৯, পৃ. ১৮৬)
বেকারত্বের হার ২০০৮	৭.৩%	অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার মধ্যে বেকারের অনুপাত (সূত্র: ইউরোস্ট্যাট)
দীর্ঘ সময় ধরে বেকারত্বের হার ২০০৮	৩.৭%	অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে (১২ মাস বা অধিক) বেকারের অনুপাত (সূত্র: ইউরোস্ট্যাট)
আয়ের অসমতা/ জিনি সহগ ২০০৯	২৮.৩%	আয়ের অসমতা নির্দেশকারী অনুপাত মান যত বেশি অসমতা তত বেশি (সূত্র: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ২০০৯, পৃ. ১৯৫)
মানব দারিদ্র্য সূচক ২০০৯	১০.১%	মানব দারিদ্র্য সূচক কয়েকটি নির্দেশক নিয়ে গঠিত (গড় আয়ু, স্বাক্ষরতার হার, স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ) [০ = সর্বনিম্ন দারিদ্র্য, ১০০ = সর্বোচ্চ দারিদ্র্য] (সূত্র: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ২০০৯ পৃ. ১৮০)
শিক্ষা লাভে আর্থ-সামাজিক পটভূমির গুরুত্ব ২০০৬	১৯%	আর্থ-সামাজিক পটভূমির কারণে শিক্ষার্থীদের ফলাফলের পার্থক্যের অনুপাত (সূত্র: ওইসিডি, ২০০৭)
শ্রমিক সংগঠনের ঘনত্ব ২০০৭	১৯.৯%	অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় মানুষের মধ্যে শ্রমিক সংগঠনের সাথে জড়িতদের অনুপাত (সূত্র: ওইসিডি, ২০০৭)

আরো জানতে পড়ুন-

ক্রিসটপ এগলে (২০০৬), 'ডিউটশল্যান্ড: ডার ব্লকিয়ারটে মাসটার্কনাবে', ইন: থমাস মেয়ার (সং.), প্র্যাক্সি ডার সোজিয়ালেন ডেমোক্রাটি, উইজবাডেন, পৃষ্ঠা ২৭৩-৩২৬।

পিটার জে. কাটজেনস্টেইন (১৯৮৭): পলিসি অ্যান্ড পলিটিকস ইন ওয়েস্ট জার্মানি, দ্য গ্রোথ অব এ সেমিসভরিন স্ট্রেট, ফিলাডেলফিয়া।

ম্যানফ্রেড জি. স্কিমিডট (২০০৭), ডাস পলিটিশে সিসটেম ডিউটশল্যান্ডস, মিউনিক।

তবে দ্বৈত কারিগরি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা শিক্ষানবীশীর সহজলভ্যতার অভাব সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক তুলনায় দৃষ্টান্তমূলক। এই ব্যবস্থাটি কোম্পানিগুলোর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সৃষ্টির পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক বিদ্যালয় উপস্থিতির মাধ্যমে সম্যক শিক্ষা নিশ্চিত করে।

সারমর্ম

১৯৭০ দশকের শেষ ভাগ পর্যন্ত 'মডেল জার্মানি' দীর্ঘদিন ধরে একটি উচ্চ-সম্পৃক্ত সামাজিক রাষ্ট্রের উদাহরণ হিসেবে টিকে ছিল। তবে দুই জার্মানির একত্রীকরণ ও বিশ্বায়নের সংকটগুলোর ফলে এই পূর্ব প্রাধান্য হারিয়ে গিয়েছে। এখন জার্মানিকে বরং একটি মধ্য-সম্পৃক্ত সামাজিক গণতন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কল্যাণ রাষ্ট্র ব্যবস্থার অর্থায়নের ধারা দেশের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হওয়া এবং স্থায়িত্বের প্রতি প্রবণতাপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার কারণে প্রয়োজনীয় সংস্কার সময়মত গৃহীত না হওয়া এর প্রধান কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম। ১৯৯০ দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে প্রথমে কোল সরকার এবং পরবর্তীতে কিছু দ্বিধার পর শ্রোয়েডার সরকার কল্যাণ রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পুনঃব্যবস্থাপনা এবং আংশিক ভেঙ্গে ফেলার মাধ্যমে এবং জনসংখ্যাতত্ত্বগত বয়স ও পরিবর্তিত পরিবার কাঠামো অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জার্মান অর্থনীতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। এসব সংস্কার কিছু কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। তবে সবদিক বিবেচনায় এসব সংস্কার ছাড়া কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা আর কোনোভাবে সম্ভব নয়। তবে ভবিষ্যতে জার্মানি আরও একবার একটি উচ্চ-সম্পৃক্ত সামাজিক গণতন্ত্রের কাছাকাছি যেতে পারবে কিনা তা দেখার বাকি আছে।

৫.৪ জাপান[২২]

ইউন-জিউং লি

জাপান: একটি ব্যতিক্রমী কেস

প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনায় প্রায় কোনো দেশই জাপানের মত এত বেশি পরিমাণ বৈশিষ্ট্য দ্বারা বর্ণিত হয় না। বিশেষকরে 'কল্যাণ রাষ্ট্র' অথবা 'কল্যাণ সমাজের' ধারণার ক্ষেত্রে জাপানের যে চিত্র ফুটে ওঠে তা শক্তিশালী 'সামাজিক গণতান্ত্রিক' বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উদারনৈতিক রক্ষণশীল কল্যাণ শাসনব্যবস্থা থেকে 'মার্ক্সীয় শ্রেণিহীন সমাজ ব্যবস্থা' পর্যন্ত বিস্তৃত।

জিডিপি'র তুলনায় নিম্ন সামাজিক ব্যয়

জাপানের পরিস্থিতি সাধারণ ক্ষেত্রগুলোর মাধ্যমে খুব সহজে তুলে ধরা যাবে না। ১৯৯৩-৯৪ সালে একটি সংক্ষিপ্ত ব্যতিক্রম বাদে ১৯৫৫ সাল থেকে প্রত্যেক প্রধানমন্ত্রী রক্ষণশীল উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দল (এলপিডি) থেকে হয়েছে।

সামাজিক ব্যবস্থায় সরকারি ব্যয়ের বিচারে জাপান উচ্চ শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে নিচের দিকে অবস্থান করে। ২০০৫ সালে জিডিপি'র ২২.৯ শতাংশ সামাজিক ব্যয় নিয়ে জাপান গড়ের চেয়েও কম সামাজিক খাতে ব্যয় করে (ওইসিডি'র গড় ২৪.৪ শতাংশ) যা জার্মানি (৩১.১ শতাংশ) এবং সুইডেন (৩৩.৬ শতাংশ) থেকে অনেক কম।

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উচ্চ কার্যকরতা

তবে জাপানের রয়েছে বিশ্বের সর্বোচ্চ গড় আয়ু বিশেষকরে নারীদের, অবিশ্বাস্য রকমের নিম্ন শিশু মৃত্যুহার এবং উল্লেখযোগ্য সুষম আয় বণ্টন ব্যবস্থা। এই সবকিছুই জাপানের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকরতা প্রমাণ করে। আরও উল্লেখ্য, মতামত জরিপ অনুযায়ী প্রায় ৯০ ভাগ জাপানিই নিজেদেরকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সদস্য বলে মনে করে।

বিভিন্ন বিষয়ে এরূপ জটিলতার কারণে জাপানের বিষয়টি খুব সতর্কতার সাথে আলোচনা করতে হবে। প্রায়ই জাপানের বিষয়ে আলোচনা বিকল্প স্বতন্ত্র বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে: জাপান কি অনন্য নাকি নয়? এর উত্তর অবশ্যই 'হ্যাঁ এবং না' হবে। অন্যান্য সমাজের মত জাপানেও একইসাথে অনন্য এবং তুলনীয় উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে। এটি পারস্পরিক স্বতন্ত্র বিকল্পের বিষয় নয়, বরং এটি সহ-অবস্থানের বিষয়।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা

তিনটি পর্যায়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিবর্তন

জাপানের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সংসদীয় গণতন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করা যায়। একদিকে ১৯৪৭ সালের সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলোর নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, আর অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোকে ভিত্তি করে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ও সিদ্ধান্ত তৈরি হয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

[২২] এই অংশটি থমাস মেয়ার (সম্পাদিত), প্রাক্সিস ডার সোজিয়ালেন ডেমোক্রাটি, উইজবাডেন, পৃ. ৩৭৪-৪৪ এর ইউন-জিউং লি (২০০৬), 'সোজিয়াল ডেমোক্রাটি ইন জাপান, এলিমেনটে সোজিয়ালের ডেমোক্রাটি ইম জাপানিশচেন সিস্টেম' থেকে নেওয়া।

প্রথম পর্যায়টি (১৯৪৫-৫৫) ছিল যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠনের সময়, দ্বিতীয় পর্যায়টি (১৯৫৫-৯৩) সাধারণত '৫৫ ব্যবস্থা' নামে পরিচিত, আর তৃতীয় পর্যায়টি (১৯৯৩ পরবর্তী) একটি রাজনৈতিক সংস্কারের পর্যায় হিসেবে ধরা হয়। '৫৫ ব্যবস্থা' নামকরণ এসেছে ১৯৫৫ সালে প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দল এলপিডি এবং এসপিজে'র (সোশ্যালিস্ট পার্টি অফ জাপান) প্রতিষ্ঠা হওয়ার ঘটনা থেকে। উদারনৈতিক দল জিউতো (Jiyuto) এবং গণতান্ত্রিক দল মিনশুতো (Minshuto) একত্রিত হয়ে রক্ষণশীল এলপিডি গঠন করে। অন্যদিকে বামপন্থী ও ডানপন্থী সমাজতন্ত্রীরা মিলে এসপিজে গঠন করে। যে প্রত্যাশা নিয়ে এই ব্যবস্থা গঠন করা হয়েছিল তা হচ্ছে এটিও ইংরেজদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মত একটি দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার প্রচলন ঘটাবে। তবে ১৯৬০ এর দশকে এটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে একটি একক দলীয় প্রাধান্য-বিশিষ্ট ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে যা সুইডেনের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, ইতালির ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং ভারতের ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টি'র নেতৃত্বের সাথে তুলনীয়। ১৯৯৩ সালের আগস্ট থেকে ১৯৯৪ সালের জুন পর্যন্ত ১০ মাস ছাড়া ১৯৫৫ সাল থেকেই এলপিডি'র প্রাধান্য নিয়ে সংসদ গঠিত হয়ে আসছে; এমনকি প্রধানমন্ত্রীর পদও এলপিডি'র। ২০০৯ সালের নির্বাচনে এসপিজে'র জয়লাভ কী পরিবর্তন নিয়ে আসে সেটিই দেখার বাকি।[২৩]

সংবিধান ও মৌলিক অধিকার ব্যবস্থা

'প্রগতিশীল সংবিধান'

জেনারেল ডগলাস ম্যাক আর্থার-এর অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের অধিগ্রহণকারী প্রশাসন দ্বারা রচিত সংবিধান ১৯৪৭ সালের ৩ মে হতে কার্যকর হয়। এই সংবিধান নিজেই খুবই প্রগতিশীল। অনুচ্ছেদ ৯ যা পুনঃসামরিকায়ন নিষিদ্ধ করেছে তা ছাড়া অনুচ্ছেদ ২৫-এ বলা হয়েছে:

১. প্রত্যেক নাগরিকের ন্যূনতম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার মান রক্ষা করার অধিকার থাকবে।

২. জীবনের সর্বক্ষেত্রে সামাজিক কল্যাণ, নিরাপত্তা ও জনস্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সাধন করতে রাষ্ট্র সর্বদা পদক্ষেপ নেবে।

অনুচ্ছেদ ২৭ ঘোষণা দেয় যে, 'প্রত্যেক নাগরিকের কাজ করার অধিকার ও বাধ্যবাধকতা থাকবে'।

কল্যাণ রাষ্ট্রের অঙ্গীকার

জাপানের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট অনুচ্ছেদ ২৫-কে বারবার এভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে, এটি কোনো প্রায়োগিক অধিকারের উল্লেখ করে না, বরং এটিকে একটি কর্মসূচির ঘোষণাপত্র হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। যার ফলে কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতি এই অঙ্গীকার বরং রাষ্ট্র ও আইনের জন্য মৌলিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

জাপানের সংবিধানে কাজ করার অধিকার ও মৌলিক সামাজিক অধিকারগুলোর উল্লেখ জাপানি সরকারকে একটি কর্মসংস্থান নীতি ও কল্যাণ রাষ্ট্র কর্মসূচি গ্রহণে বাধ্য করে। কাজেই কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ জাপানের কল্যাণ ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ

[২৩] দেখুন এন্ড্রু ডিউইট (২০০৯), চেঞ্জ কামস্ টু জাপান?, ফ্রেডেরিক-এবার্ট-স্টিফটুং (সংকলিত), বার্লিন।

স্থান দখল করে আছে, যেখানে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যেমন অবসর ভাতা, স্বাস্থ্য সেবা, সেবা ব্যবস্থা ও বেকারত্ব বীমা অবশ্যই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একটি শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তির ওপর গড়ে তুলতে হবে।

রাজনৈতিক অর্থনীতি

উদ্যোক্তাদের নেটওয়ার্কের ওপর ভিত্তি করে সমন্বিত বাজার অর্থনীতি

জাপানের অর্থনীতি 'সমন্বিত বাজার অর্থনীতি'র অন্তর্ভুক্ত। জাপানে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্কের মাঝে সমন্বয়ের কাজটি হয়ে থাকে, যে নেটওয়ার্ক বিভিন্ন শিল্প গোষ্ঠীর দ্বারা গঠিত। এসব গোষ্ঠী বা দল কাইরেতসু (keiretsu) নামে পরিচিত। কাইরেতসু কাঠামো অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি আদান-প্রদান প্রক্রিয়ার আয়োজন করা হয়। শ্রমিকদেরকে বিশেষ দলের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে উৎসাহিত করা হয় এবং প্রতিদানে আজীবন কর্মসংস্থানের প্রত্যাশা দেওয়া হয়। শ্রমিক সংগঠনগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, যা শ্রমিকদেরকে কোম্পানির বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণের অধিকার প্রদান করে।

জাপানের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়ন দীর্ঘমেয়াদী ব্যাংক ঋণ দ্বারা হয়ে থাকে, যা তাদেরকে পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে উচ্চ মাত্রার নিশ্চয়তা দেয় এবং তার ফলে ব্যবসার দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নে মনোনিবেশে সাহায্য করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর পর এবং ১৯৬০-এর দশকে রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার ছিল শ্রম বাজার ও কর্মসংস্থান। ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগে এবং ১৯৭০-এর দশকের শুরুতে এলডিপি সরকার প্রথমে সমাজতান্ত্রিক বা সামাজিক গণতান্ত্রিক মেয়রদের 'প্রগতিশীল' সামাজিক নীতি পদক্ষেপের চাপে পড়ে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ শুরু করে। তেলের সংকটের শুরুর কারণে এই সম্প্রসারণশীল সামাজিক নীতি রোধ করা হয়, যদিও তা কমানো হয়নি। সামাজিক অংশীদার ও রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরা এ বিষয়ে একমত হয় যে বর্ধিষ্ণু বিশ্বায়ন ও এর বিপদ মোকাবিলায় সক্রিয় শ্রম বাজার নীতির সম্প্রসারণ অবশ্যই করতে হবে।

সক্রিয় শ্রম বাজার নীতি

সক্রিয় শ্রম বাজার নীতির কাঠামোয় পারিশ্রমিক ভর্তুকি, জরুরি ঋণ ও অধিকার প্রশিক্ষণের জন্য আর্থিক সাহায্যসহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ১৯৯০-এর দশকের দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত সম্প্রসারিক কর্মসংস্থান ও নিম্ন বেকারত্বের হার এই নীতির সফলতা প্রমাণ করে।

কল্যাণ রাষ্ট্র

ব্যাপক কোম্পানি সামাজিক সুবিধা

যদিও জাপানের সংবিধানে কল্যাণ রাষ্ট্র নিয়ে অনুচ্ছেদ ২৫-এ একটি ধারা রয়েছে এবং এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১৯৪৭ সালেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইনগুলো সংস্কার অথবা নতুন করে কার্যকর করা হয়েছিল, তবুও জাপান তার অর্থনৈতিক গতিশীলতার সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যাবৎ একটি বিলম্বিত উন্নয়নকারী দেশ

হিসেবে পরিচিত ছিল। এছাড়া অন্যান্য ওইসিডি দেশগুলোর তুলনায় জাপানের জিডিপি'র অনুপাতে রাষ্ট্রীয় সামাজিক সুবিধার হার জাপানকে অবিরতভাবে তালিকার নিচের দিকে স্থান দেয়।

তবে রাষ্ট্রীয় সামাজিক সুবিধাগুলোর প্রতি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিপাত জাপানের কল্যাণ রাষ্ট্রের একটি মাত্র দিক তুলে ধরে, কারণ এখানে কোম্পানির সামাজিক সুবিধাগুলো অনেক ব্যাপক যা মোট সামাজিক পণ্যের প্রায় ১০ ভাগ। কোম্পানিগুলো (যেমন ২০০১ সালে) এক মাসে প্রত্যেক কর্মচারীর পেছনে বাধ্যতামূলক সামাজিক অবদান হিসেবে গড়ে ৫৭০ ইউরো এবং কোম্পানি সামাজিক সুবিধাগুলোর জন্য গড়ে আরও ১,০০০ ইউরো খরচ করে।

এর বাইরেও জাপানের কল্যাণ রাষ্ট্র ব্যবস্থা সামাজিক সমতা বা সামাজিক একতাকে উৎসাহিত করে থাকে। এটি ব্যক্তিকে সামাজিক সুবিধা প্রদান করে নয়, বরং শ্রম বাজার ও কর্মসংস্থান নীতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে করা হয়।

অবসর ভাতা

অবসর ভাতা: ১৯৭৩ সালের সংস্কার অনুযায়ী কর্মচারী বীমা পরিকল্পনার অধীনে 'নির্ধারিত ভাতা গ্রহীতাদের' ভাতা গড় পারিশ্রমিকের ৪৫ ভাগ পর্যন্ত উন্নীত করা হয় এবং জীবনযাত্রার ব্যয় সূচকের সাথে সমন্বিত করা হয়। ১৯৮৫ সালের ভাতা সংস্কার ধীরে ধীরে অবদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং ভাতা প্রদান হ্রাস করে, যাতে করে ২০২৫ সাল নাগাদ জাপানের জনসংখ্যার দ্রুত বয়স বৃদ্ধির প্রভাবের সামঞ্জস্য করা যায়। তথাকথিত জাতীয় ভাতা বীমা একটি অবদান-নির্ভর সবার জন্য বাধ্যতামূলক বীমা ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মৌলিক চাহিদাগুলো নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়।

২০০৭ সালে প্রতিমাসে জাতীয় ভাতা ব্যবস্থার অধীন গড় বৃদ্ধ ভাতার পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০৫ ইউরো। ২০০৭ সালে ৬০ বছরের বেশি বয়সী সব নাগরিকের ৯৬ ভাগ একটি জাতীয় ভাতা গ্রহণ করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জনগণ দুই ধরনের ভাতার যেকোনো একটি গ্রহণ করে - একটি হচ্ছে কোম্পানি ভাতা, ২০০৪ সালে এক মাসে যার পরিমাণ ছিল গড়ে প্রায় ১,৩০০ ইউরো, যা গড় পারিশ্রমিকের প্রায় ৫৩.৪ ভাগ; অথবা অবসর গ্রহণের বয়স হয়ে গেলে এককালীন ভাতা হিসেবে ৬৪ মাসের বেতনের সমপরিমাণ পর্যন্ত টাকা।

স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা

স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা: সর্বজনীনতা এবং রাষ্ট্রীয় নিশ্চয়তা নীতির ওপর ভিত্তি করে স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্র নিশ্চয়তা দেয় যে চিকিৎসা সেবা কর্মসূচি ছাড়াও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বীমাহীন ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্যও বর্ধিত হবে। ১৯৮৪ সালের কর্মচারী চিকিৎসা বীমা সংস্কারের মাধ্যমে ১০ শতাংশ হারে ব্যক্তিগত অবদান প্রচলিত হয়, যা বর্তমানে ২০-৩০ ভাগ পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছে। এটি এই ব্যবস্থাটিকে জাতীয় চিকিৎসা বীমা ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে, যার অধীনে যারা কোনো কর্মচারী চিকিৎসা বীমার সদস্য নয় বা পূর্বে ছিল কিন্তু এখন আর নেই, যেমন আত্ম-কর্মসংস্থানকারী কৃষক, ছোট কোম্পানির

কর্মচারী এবং পরিবারের সদস্য, তাদের বীমা সুবিধা দেওয়া হয়। জাতীয় বীমা ব্যবস্থার অধীনে ব্যক্তিগত অনুদানের পরিমাণ দীর্ঘদিন ধরেই মাত্র ৩০ ভাগ।

শিক্ষা ব্যবস্থা

জাপানের কল্যাণ ব্যবস্থায় শিক্ষার জন্য উচ্চ স্থান রয়েছে। ২০০৭ সালে বাধ্যতামূলক শিক্ষা (৯ বছর) সমাপনকারীদের ৯৩ ভাগ তিনবছর মেয়াদী উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়। যদি দূরবর্তী স্থান থেকে পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও সান্ধ্যকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে এর পরিমাণ ৯৭.৩ ভাগ পর্যন্ত উন্নীত হয়। এতদসত্ত্বেও, শিক্ষা খাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় আন্তর্জাতিক দেশগুলোর তুলনায় অত্যন্ত কম, যা ২০০৬ সালে জিডিপি'র ৩.৫ ভাগ ছিল। জাপানের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই ব্যবস্থাটিকে তুলনামূলক উচ্চ আনুপাতিক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে, যেমন জাপানের ৭৭.৫ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ই বেসরকারি।

সারমর্ম

জাপানে সামাজিক গণতন্ত্রের সব উপাদান উপস্থিত রয়েছে। তারপরও এখানে আলোচিত অন্যান্য সামাজিক গণতন্ত্রগুলোর সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণভাবে জাপানের সামাজিক গণতন্ত্র কোনো শক্তিশালী সামাজিক গণতান্ত্রিক দল বা সামাজিক গণতান্ত্রিক আদর্শিক ভিত্তি ছাড়াই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাপানের আমলাতান্ত্রিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাজনৈতিক শ্রেণির বৈশিষ্ট্যই হল যে তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এবং কোনোরূপ আদর্শ বা ধারণার অনুবর্তী না হয়ে স্থায়ী সমাধানের সন্ধান করে এবং সেই উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সব দেশ থেকে তথ্য, চিন্তা ও ধারণা সংগ্রহ ও সমন্বয় করে থাকে।

জাপানের ব্যবস্থাটির একটি দুর্বলতা হল, এটি প্রধানত জাপানি নাগরিকদের জন্যই প্রযোজ্য। ঐতিহ্যগতভাবে জাপানে বিদেশী ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলোর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি তত্ত্বীয়ভাবে অথবা কর্মক্ষেত্রে খুব সামান্য বিবেচনাই পেয়ে থাকে। তবে শ্রমিকদের অভিবাসন প্রক্রিয়া অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া লৈঙ্গিক সমতার ক্ষেত্রেও উন্নতির সুযোগ রয়েছে।

জাপানের উন্নত ও কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাবিশিষ্ট সামাজিক গণতন্ত্রে এসব অসমাধানকৃত সমস্যাগুলোর ছায়া পড়ে। ১৯৮০ সালের সামাজিক নীতি সংস্কারের পর রাজনৈতিক বিতর্কে বিষয়গুলোকে অর্থনীতির আন্তর্জাতিকীকরণ ও বিশ্বায়নের জন্য আর বাধা বলে মনে করা হয় না। ১৯৯০ সালে মালিক সমিতিগুলো অর্থনৈতিক মন্দা ও তীব্র বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ মুক্তির পাশাপাশি কর্মসংস্থান কাঠামোর নমনীয়তা ও কর্মশক্তি ছাঁটাইয়ের দাবি করে। এই প্রক্রিয়ায় তারা তাদের শ্রম বাজারের চাহিদার ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করতে ব্যর্থ হয়। ইতোমধ্যে মালিক সমিতিগুলোও তাদের অবস্থান থেকে সরে এসেছে ও তাদের সদস্য কোম্পানিগুলোকে ও রাষ্ট্রকে কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বৃদ্ধি করতে আরও বেশি করে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছে।

একদিকে ব্যাপক কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও অন্যদিকে উপরোক্ত বাধা ও সমস্যাগুলোর ওপর ভিত্তি করে জাপানকে একটি মধ্য-সম্পৃক্ত সামাজিক গণতন্ত্র বলা যায়। এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, জার্মানিকেও মধ্য-সম্পৃক্ত সামাজিক গণতন্ত্র বলা হয়, যদিও জার্মানির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং কল্যাণ ও অর্থনৈতিক মডেলগুলোতে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

জাপান		
চাকরির হার ২০০৮	৭০.৫% (৫৯.৭%)	মোট জনসংখ্যার তুলনায় ১৫-৬৪ বয়সী মানুষের চাকরির হার (নারীদের) (সূত্র: ইউরোস্ট্যাট)
পুরুষের তুলনায় নারীর আয়	৪৫%	পুরুষের তুলনায় নারীর আয়ের হার (সূত্র: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স, ২০০৯, পৃ. ১৮৬)
বেকারত্বের হার ২০০৮	৪.০%	অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার মধ্যে বেকারের অনুপাত (সূত্র: ইউরোস্ট্যাট)
দীর্ঘ সময় ধরে বেকারত্বের হার ২০০৮	১.৩%	অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে (১২ মাস বা অধিক) বেকারের অনুপাত (সূত্র: ইউরোস্ট্যাট)
আয়ের অসমতা/ জিনি সহগ ২০০৯	২৪.৫%	আয়ের অসমতা নির্দেশকারী অনুপাত মান যত বেশি অসমতা তত বেশি (সূত্র: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ২০০৯, পৃ. ১৯৫)
মানব দারিদ্র্য সূচক ২০০৯	১১.৬%	মানব দারিদ্র্য সূচক কয়েকটি নির্দেশক নিয়ে গঠিত (গড় আয়ু, স্বাক্ষরতার হার, স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ) [০ = সর্বনিম্ন দারিদ্র্য, ১০০ = সর্বোচ্চ দারিদ্র্য] (সূত্র: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ২০০৯ পৃ. ১৮০)
শিক্ষা লাভে আর্থ-সামাজিক পটভূমির গুরুত্ব ২০০৬	৭.৪%	আর্থ-সামাজিক পটভূমির কারণে শিক্ষার্থীদের ফলাফলের পার্থক্যের অনুপাত (সূত্র: ওইসিডি, ২০০৭)
শ্রমিক সংগঠনের ঘনত্ব ২০০৭	১৮.৩%	অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় মানুষের মধ্যে শ্রমিক সংগঠনের সাথে জড়িতদের অনুপাত (সূত্র: ওইসিডি)

আরো জানতে পড়ুন-

ইউন-ঝুং লি (২০০৬), 'সোজিয়ালে ডেমোক্রাটি ইন জাপান, এলিমেন্টে সোজিয়ালার ডেমোক্রাটি ইম জাপানিশচেন সিস্টেম', ইন: থমাস মেয়ার (সং.), প্র্যাক্সি ডার সোজিয়ালেন ডেমোক্রাটি, উইজবাডেন, পৃষ্ঠা ৩৭৪-৪৪৪।

৫.৫ সুইডেন

এরিক গুর্গসডিয়েস

ঐতিহ্যবাহী কল্যাণ রাষ্ট্র পরিচালনা

এই বিশ্বায়নের যুগেও ব্যাপক পরিমাণ সরকারি (আর্থিক) সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা এবং উন্নতমানের জনসেবা ব্যবস্থার মাধ্যমে সুইডেন এখন পর্যন্ত ঐতিহ্যবাহী কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা বজায় রেখেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শিশু শ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা সুইডিশদের জন্য বিনামূল্যে দেওয়া হয়। সুইডিশদের জন্য স্বাস্থ্য সেবাও বিনামূল্যের, শুধু প্রবেশাধিকারের জন্য একটি নামমাত্র ফি দিতে হয়। বেকারত্বের ক্ষেত্রে অব্যবহিত আগের বেতনের সর্বোচ্চ ৮০ ভাগ পর্যন্ত সুবিধা প্রদান করা হয়, এবং বৃদ্ধ বয়সে অপর্যাপ্ত আয়কারী ব্যক্তির জন্য কর দ্বারা অর্থায়নকৃত নিশ্চিত অবসর ভাতার ব্যবস্থাসহ একটি আয় সংক্রান্ত সাধারণ ভাতার ব্যবস্থা বৃদ্ধ বয়সে দারিদ্র্যের বিপরীতে সুরক্ষা প্রদান করে।

যদি কেউ এটি বিবেচনা করে যে সুইডেনের এক-তৃতীয়াংশ অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় ব্যক্তি জনগণের সেবার ক্ষেত্রগুলোতে নিয়োজিত, যার অর্থ সুইডেনের কর ও অবদানের অনুপাত বিশ্বের সর্বোচ্চগুলোর একটি, আর ১৯৯০ সালের শুরুর দিকে সুইডেনে মহামন্দা-পরবর্তী যুগের সবচেয়ে বাজে অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল, তাহলেও এই প্রশ্নটি জাগে যে এই বিশ্বায়নের যুগে অন্য সব দেশের বিপরীতে কীভাবে সুইডেনে কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা রক্ষা পেয়েছে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমতার দ্বারা প্রভাবিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি

এই প্রসঙ্গে সুইডিশ মানসিকতা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা স্মরণাতীত কাল থেকেই সামাজিক সমতার ধারা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এই মানসিকতা ও সংস্কৃতি প্রাচীন জার্মান জীবনধারা থেকে এসেছে যা একটি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সামন্ততন্ত্রও দূর করতে পারে নি। আরেকটি ব্যাখ্যা হচ্ছে অন্তত সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত সুইডেনের উল্লেখযোগ্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমতা। স্থানীয় জীবন ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত স্বাধীন সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেখানে ভৌগোলিক দূরত্ব বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করে এমন দেশে জাতীয় চেতনাবোধ সৃষ্টিতে স্থানীয় প্রশাসনের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তারপরও কেন্দ্রীয় আইন ব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় আর্থিক ভর্তুকি স্থানীয় জীবনযাত্রার মানের মাঝে একটি উচ্চ পর্যায়ের একতা নিশ্চিত করে।

ঐকমত্যসম্পন্ন ও একীভূত রাজনৈতিক কাঠামো

রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ঐকমত্য, দর-কষাকষি ও একীভূত হওয়া সুইডিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আরও উল্লেখ্য, সুইডিশ আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ অনেক বেশি। নতুন আইন প্রণয়নের শুরুতেই এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করার জন্য সরকার একটি কমিটি গঠন করে। সাধারণত সরকারই

এই ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিয়ে থাকে; তারপরও সংসদ, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এমনকি নাগরিক সমাজও এই ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। আইনের বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে রাজনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠিত হয় এবং আলোচনার জন্য অনুকূল একটি অবস্থান গ্রহণ করে। একটি আপোষকারী ও ঐকমত্য সৃষ্টিপ্রবণ সমাজের ধারণা এরূপ 'শিথিল' প্রক্রিয়ার সুযোগ করে দেয়।

সামাজিক গণতন্ত্রের শক্তিশালী অবস্থান

১৯৩০ সাল থেকেই সামাজিক গণতন্ত্র সুইডেনের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রভাবশালী অবস্থান দখল করে আছে। মহামন্দার সময়ে বিশ্বের প্রধান অর্থনৈতিক মূলধারার বিপরীতে সুইডেনে সঞ্চয় দ্বারা অর্থায়নকৃত একটি পাবলিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল বড় পরিবারগুলোর আবাসন ব্যবস্থা ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য। দীর্ঘদিনের প্রধানমন্ত্রী ট্যাজে ইরল্যান্ডার কর্মসংস্থান কর্মসূচির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর জোর দিয়ে বলেন, "মধ্য ইউরোপে মানুষ রাস্তায় বাধা তৈরি করেছে আর সুইডেনে আমরা উড়ালসড়ক নির্মাণ করে উন্নয়নের চেষ্টা করছি।" কর্মসংস্থান কর্মসূচির সফলতা কেবলমাত্র সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক ওয়ার্কার্স পার্টিকে নির্বাচনে জয়ীই করে নি, এর সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করেছে, আর আদর্শগত মিলের কারণে এলও (Landsorganisationen) শ্রমিক সংগঠনের জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি করেছে। মধ্য ডানপন্থী বিরোধী দলের বিচ্ছিন্নতার জন্যও সামাজিক গণতন্ত্রের প্রভাবশালী অবস্থান শক্তিশালী হয়েছিল। ডেমোক্র্যাট, গ্রীনস ও বামপন্থী এবং সাবেক ইউরোকম্যুনিস্টদের (Eurocommunist) দ্বারা গঠিত তথাকথিত 'সমাজতান্ত্রিক পক্ষ', রক্ষণশীল (Conservatives), উদারনীতিক (Liberals), কেন্দ্রীয় (সাবেক কৃষক) পার্টি ও ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটদের (Christian Democrats) নিয়ে গঠিত তথাকথিত 'বুর্জোয়া' বা 'মধ্য ডানপন্থী ব্লক' দ্বারা চ্যালাঞ্জের সম্মুখীন হয়। ২০০৬ সাল থেকে 'মধ্য ডানপন্থী'রা সরকার গঠন করে আসছে। তবে মধ্য ডানপন্থী ব্লকের (যা 'সুইডেনের জোট' নামে পরিচিত) নির্বাচনে জয়লাভ করার পরও পার্টিগুলোর একটি বড় অংশ কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণাকে সমর্থন করে।

সংবিধান এবং মৌলিক অধিকার কাঠামো

সংবিধানে নেতিবাচক ও ইতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা

সুইডেনের সংবিধান কেবলমাত্র নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতাই দান করে না, একইসাথে সুদূর-প্রসারী ইতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতাও প্রদান করে। যদিও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার অর্থাৎ ইতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা রাজনৈতিক মৌলিক অধিকারের মত আইনগতভাবে অবশ্য পালনীয় নয়, তারপরও এগুলো সামাজিক-রাজনৈতিক কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন, সংবিধানের ২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে, "ব্যক্তির ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কল্যাণ সাধনই পাবলিক কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হবে। বিশেষকরে সরকারি প্রশাসনের দায়িত্ব হবে কাজ করার, আবাসন ও শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা এবং সামাজিক সেবা, সামাজিক নিরাপত্তা ও একটি উন্নত বাসযোগ্য পরিবেশের ব্যবস্থা করা।" আইনগতভাবে

অবশ্য পালনীয় হোক বা না হোক, মূল কথা হল যে এসব সামাজিক, রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলো সংবিধানে এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে যে জনগণের চেতনায় এগুলোর উচ্চ অবস্থানের আশ্বাস দেয়। এটি সুইডেনের কল্যাণ রাষ্ট্র কর্মসূচি নির্ধারণ এবং এর রাজনৈতিক (বাজার) অর্থনীতিতেও প্রতিফলিত হয়।

রাজনৈতিক অর্থনীতি

রেন-মেইডনার মডেল

সুইডেনের অর্থনৈতিক নীতি "রেহেন-মেইডনার (Rehn- Meidner)" মডেলের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। শ্রমিক সংগঠন অর্থনীতিবিদ গোস্তা রেন (Gosta Rehn) ও রুডলফ মেইডনার (Rudolf Meidner) এর নাম অনুসারে এই মডেলের নামকরণ করা হয়েছে। ১৯৫১ সালে তারা এমন একটি সামষ্টিক অর্থনীতির মডেল তৈরি করে যা কোনো ধরনের মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা তৈরি করা ছাড়াই সকলের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি অভিন্ন পারিশ্রমিক নীতির সমাবেশ ঘটায়।

এর মূল ধারণাটি ছিল কেবলমাত্র একটি উচ্চবর্ধিত চাহিদার মাধ্যমে সকলের জন্য স্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা কখনোই সম্ভব হবে না। এই চাহিদার কারণ ছিল হয় অনুকূল বিশ্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন অথবা জাতীয় অর্থনৈতিক প্রণোদনা। যেহেতু ভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলো সবসময় ভিন্ন হারে সম্প্রসারিত হয়, সেহেতু সার্বক্ষণিক উচ্চ চাহিদা খুব দ্রুত বিভিন্ন খাতে চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতা সৃষ্টি করে। অতএব এ ধরনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলো প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর কর্মীদের আকর্ষণের চেষ্টা করে।

যখন সকলের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকে তখন এই চেষ্টা কেবলমাত্র উচ্চ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অর্জন করা সম্ভব হয়, এবং তার ফলে এই ক্ষেত্রগুলোতে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটে। এই পরিস্থিতি অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর কর্মীদের ক্রয়ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার জন্য অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর পারিশ্রমিক বৃদ্ধির প্রতি পরিচালিত করে, যা সব দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটায় এবং এইভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

অভিন্ন পারিশ্রমিক নীতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরিস্থিতি আরও খারাপ করার জন্য সুইডেনের শ্রমিক সংগঠনগুলো তথাকথিত 'অভিন্ন পারিশ্রমিক নীতি' বাস্তবায়নের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়। এই নীতির দুইটি লক্ষ্য রয়েছে। প্রথমত, এটি 'সমজাতীয় কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক' নীতি বাস্তবায়ন করতে চায়, এবং এর মাধ্যমে গড় শ্রম উৎপাদন ক্ষমতার প্রতি ঝোঁক প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়ত, এটি বিভিন্ন কাজের পারিশ্রমিকের পার্থক্য হ্রাস করবে বলে ধারণা করা হয়। এসব লক্ষ্য অর্জন নিম্ন পর্যায়ের চেয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পারিশ্রমিক নির্ধারণ আলোচনার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপের ওপর নির্ভরশীল। মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা যেন অভিন্ন পারিশ্রমিক নীতি নষ্ট হয়ে না যায় সেজন্য 'রেন-মেইডনার মডেল' বাজেটের উদ্বৃত্ত দ্বারা একটি কঠোর পাবলিক অর্থায়ন নীতির সুপারিশ করে যা বর্ধিত চাহিদার ওপর শক্ত নিয়ন্ত্রণ আনবে।

অর্থনৈতিক নীতির এরূপ ধারা কম উৎপাদনশীল কোম্পানিগুলোকে দুইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। প্রথমত, তাদের দুর্বল ব্যয় এবং মূল্য ব্যবস্থার কারণে চাহিদার স্বল্পতার সময় তারা বিক্রয় সমস্যার সম্মুখীন হয়। দ্বিতীয়ত, অভিন্ন পারিশ্রমিক নীতি তাদের বিদ্যমান ব্যয় সমস্যাকে আরও বৃদ্ধি করে তাদের প্রতিযোগিতাকে ব্যাহত করবে, কারণ সব ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক চাহিদা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং সব কোম্পানি গড় শ্রম উৎপাদন ক্ষমতার উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। অন্যদিকে ঠিক বিপরীতভাবে, উচ্চ উৎপাদনশীল কোম্পানিগুলো দুই দিক থেকে সুবিধা ভোগ করছে: প্রথমত, তাদের অনুকূল ব্যয় ব্যবস্থা এবং তার ফলে অনুকূল দ্রব্যমূল্যের কারণে তারা প্রচুর চাহিদার সম্মুখীন হচ্ছে, এবং দ্বিতীয়ত, বন্দোবস্তকৃত পারিশ্রমিক ইচ্ছাকৃতভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হয় যাতে করে মজুরির জন্য নির্ধারিত অর্থ সম্পূর্ণভাবে বণ্টিত না হয়। এভাবে এসব কোম্পানি নতুন উচ্চ উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য মূলধন পেয়ে থাকে।

সরকারি পদক্ষেপ হিসেবে বেকারত্ব

কাজেই সীমাবদ্ধ আর্থিক নীতি ও অভিন্ন পারিশ্রমিক নীতির সমন্বয়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিম্ন উৎপাদনশীল কোম্পানিগুলো ও কোম্পানি-সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা। এর ফলে সৃষ্ট বেকারত্বকে নেতিবাচকভাবে জনগণের সমস্যা হিসেবে দেখা হয় না, বরং ইতিবাচকভাবে জনগণের জন্য চ্যালেঞ্জ মনে করা হয়, যা একটি অতি উন্নত সক্রিয় শ্রম বাজার নীতির দ্বারা সমাধান করতে হবে। একটি বোধগম্য প্রশিক্ষণ ও দ্রুত সহায়তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে বেকারদের উৎপাদনশীল ও উচ্চ পারিশ্রমিকপূর্ণ কাজের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন করা হয়। এসব ক্ষেত্রে একটি নিয়ন্ত্রিত রাজস্ব নীতি, অভিন্ন পারিশ্রমিক নীতি এবং সক্রিয় শ্রম বাজার নীতি বৈশ্বিক বাজারের প্রয়োজন অনুযায়ী সুইডেনের অর্থনীতির প্রতিনিয়ত নবায়ন ও গঠনগত সমন্বয় অর্জনের জন্য কাজ করে।

১৯৯০ সালের সংকটের পর থেকে একটি রপ্তানি-নির্ভর দেশ হিসেবে দ্রুত আবির্ভূত হওয়ার একটি ভাল ব্যাখ্যা এটি, কারণ সেখানে একটি উন্নত সক্রিয় শ্রম বাজার নীতি ছিল এবং সংগঠনগুলো ও ব্যবস্থাপনা পরিষদ ঐতিহ্যগতভাবেই উচ্চ উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব দেয়, যাতে করে নিম্ন উৎপাদনশীল খাতগুলোকে রক্ষা করা যায়। সৃজনশীলতা খুব দ্রুত কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে পারে। আন্তর্জাতিক অনুকূল অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে সুইডেনের রপ্তানির অনুপাত মাত্র পাঁচবছরে এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩ থেকে ৪৫ শতাংশে উন্নীত হয়।

কল্যাণ রাষ্ট্র

সমাজে কাঠামোগত উন্নয়ন সামাজিক নীতির ক্ষেত্রে নতুন বার্তা দেয়

যুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সূচনার ফলে সুইডেনে দ্রুত পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়, আর শ্রমিক ও কৃষকদের একটি দরিদ্র রাষ্ট্র থেকে একটি 'কর্মজীবী সমাজে' পরিণত হয়। ব্যক্তি মানুষের প্রাচুর্যের সুবিধা কাজে লাগিয়ে সামাজিক কাঠামোতে এসব উন্নয়নের পাশাপাশি মৌলিক বীমা নীতি, যেমন রাজা হতে ভিখারি পর্যন্ত একই রাষ্ট্রীয় ভাতা, কৌশলগতভাবে একটি জীবনযাত্রার মান রক্ষাকারী সম্পূরক ব্যবস্থা (যেমন অতিরিক্ত আয় সংক্রান্ত ভাতা ব্যবস্থা) দ্বারা সংযুক্ত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ভোটারদের সন্তুষ্ট রাখা এবং পুনরায় রাজনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিত করা।

তবে সুইডিশ কল্যাণ রাষ্ট্র নগদ সুবিধা দেওয়া ছাড়াও নাগরিকদের জীবনের সম্ভাব্য মৌলিক সমস্যা থেকে রক্ষা করতে নানা সুবিধা দিয়ে থাকে। এছাড়াও সেখানে শ্রম বাজার নীতির আওতায় একটি উন্নত পাবলিক সেবা ব্যবস্থা রয়েছে যা শিশু ও বৃদ্ধদের প্রায় বিনামূল্যে সেবা দেওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সুবিধা ও শিক্ষা প্রদান করে থাকে এবং প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রত্যেকে নিজের আয় অনুযায়ী কর দেয়। সমাজ যেসব সুবিধা দিয়ে থাকে তা প্রধানত ব্যক্তির দেওয়া কিস্তির ওপর নির্ভর না করে বরং ব্যক্তির অবস্থার ওপর নির্ভর করে। এসব সুবিধা বাজারের ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয় না, বরং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দ্বারা নির্ধারিত হয় (মেইডনার/ হেডবার্গ, ১৯৮৪: ৫৬)।

সরকারি সেবার সম্প্রসারণ

সাধারণভাবে কেবলমাত্র নারীদের সক্রিয় করার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক পূর্ণকালীন কর্মসংস্থান পরিস্থিতে সরকারি সেবাগুলোর দ্রুত সম্প্রসারণ অর্জিত হতে পারে। ১৯৬০ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সময়ে সুইডেনের অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় নারীদের কর্মসংস্থানের হার ইউরোপীয় গড় ৫০ শতাংশ থেকে বিশ্বের সর্বোচ্চ ৮৩ শতাংশে উন্নীত হয়।

কল্যাণ রাষ্ট্রের স্তম্ভগুলো নিচে বর্ণিত হল।

অবসর ভাতা

অবসর ভাতা: পুরানো অবসর ভাতা ব্যবস্থা, যেমন সবার জন্য রাষ্ট্রীয় ভাতা ও কর্মসংস্থান আয় সংক্রান্ত ভাতা, ১৯৯০ সালে একটি 'জনসংখ্যা তত্ত্বের প্রমাণ' হিসেবে সংস্কার করা হয়। এখন থেকে ৬১ থেকে ৬৭ বছর পর্যন্ত ভাতা ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ করা যাবে। এইভাবে কর দ্বারা অর্থায়নকৃত নিশ্চিত ভাতা কর্মসংস্থান দ্বারা পর্যাপ্ত ও অপর্যাপ্ত আয়কারী উভয়েই পেয়ে থাকে এবং তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এক্ষেত্রে হিসাব করা হয় না। কর্মজীবীরা তাদের পরিমাপকৃত আয় সংক্রান্ত ভাতা ব্যবস্থার জন্য নির্দিষ্ট ১৬ শতাংশ হারে কর দেয়, এবং ২.৫ শতাংশ হারে পৃথক প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য গঠিত অপর একটি বিনিয়োগ তহবিলে বিনিয়োগ করে, যা থেকে একটি ব্যক্তিগত ভাতার কিস্তি দেওয়া হয়।

বেকারত্ব বীমা

বেকারত্ব বীমা: এখন পর্যন্ত বেকারত্ব বীমা একটি স্বেচ্ছার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে। এই তহবিলটি শ্রমিক সংগঠনগুলো দ্বারা পরিচালিত, যা অত্যন্ত উচ্চ ঘনত্বপূর্ণ শ্রমিক সংগঠনের উপস্থিতির একটি কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এসব অবদান সবসময় নিম্ন এবং সুবিধা সিংহভাগ কর দ্বারা অর্থায়নকৃত। তবে ২০০৬ সাল থেকে ক্ষমতায় থাকা কেন্দ্র ডানপন্থী জোট এসব অবদানে পরিবর্তন আনে, যা এই ব্যবস্থার ওপর এমন বিরূপ প্রভাব ফেলে যে বহু মানুষ তহবিল ও শ্রমিক সংগঠনগুলো ত্যাগ করে। শ্রমিক সংগঠনগুলোর ঘনত্ব গত ১০০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। তহবিল সদস্যের জন্য বেকারত্ব সুবিধা বর্তমানে স্বাভাবিক আয়ের ৮০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

বেকারত্বের অষ্টম দিন হতে পরবর্তী ২০০ দিন পর্যন্ত এই হারে সুবিধা প্রদান করা হয়, এবং এরপর অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত হ্রাসকৃত ৭০ শতাংশ হারে সুবিধা প্রদান করা হয়। সদস্য নয় এমন ব্যক্তিরা একটি নিম্ন রাষ্ট্রীয় সুবিধা পেয়ে থাকে।

সামাজিক সহায়তা

আয় সহায়তা: সুইডেনে আয় সহায়তা স্বাস্থ্য ও সামাজিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব, কিন্তু এটি স্থানীয় প্রশাসন দ্বারা আয়োজিত এবং স্থানীয় কর দ্বারাই অর্থায়নকৃত। আর্থিক সহায়তার মাত্রা প্রতিনিধিত্বমূলক জীবনযাত্রার মানের ওপর ভিত্তি করে জাতীয় স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বোর্ড দ্বারা নির্ধারিত হয়।

স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা

স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা: সুইডেনের সব অভিবাসীর প্রায় বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এই ব্যবস্থাটি স্থানীয় পরিষদ দ্বারা পরিচালিত এবং প্রধানত সরাসরি আয়কর দ্বারা অর্থায়নকৃত। দেশভেদে একটি সামান্য পরিমাণ ফি দিতে হয়। এছাড়াও বছরে প্রায় ৬,০০০ ক্রোনারের বেশি আয় করে এমন ব্যক্তিরা আয়-ঘাটতি পূরণের জন্য অধিকারপ্রাপ্ত। চিকিৎসা বীমা করের বাইরে একটি বাধ্যতামূলক কর্মজীবীদের অনুদান এবং বীমা অনুদান দ্বারা অর্থায়নকৃত।

সর্বজনীন নীতি

যদিও বর্তমানে ওইসিডি দেশগুলোর মধ্যে করের অনুপাত সুইডেনে সবচেয়ে বেশি, তার মানে এই নয় যে কল্যাণ রাষ্ট্র কর্মসূচি বিশেষ ব্যয়বহুল। সুইডিশরা যে পরিমাণ কর ও সামাজিক অনুদান দেয়, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা ব্যক্তিগতভাবে জীবনের মৌলিক জরুরি অবস্থা - বেকারত্ব, অসুস্থতা, বার্ধক্যের ক্ষেত্রে - নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তার চেয়ে কম কর দেয় না। তবে সবচেয়ে বড় পার্থক্যটি হল সুইডেনে সব জনগণ এই নিরাপত্তা লাভ করলেও যুক্তরাষ্ট্রে যারা টাকা দিতে পারে না তারা ব্যক্তি মালিকানাধীন বীমা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয় না।

যদি বিশ্বায়নের বিস্তৃতির ফলে অর্থনৈতিক সীমানা উন্মুক্ত হয়, তবে অভ্যন্তরীণভাবে আমদানি প্রতিযোগিতা নিম্ন উৎপাদনশীল কর্মী দলের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। যদি কর্মীদের চাকরি হারানো এবং সামাজিক স্তরে নিম্নগামী হওয়া আশঙ্কা একটি ভালো আয় বীমা এবং প্রশিক্ষণ সম্ভাবনার মাধ্যমে দূর করা যায়, তাহলে অর্থনৈতিক কৌশল নির্ধারণে বিশাল সুবিধা পাওয়া যাবে এবং অর্থনীতিকে বহির্বিশ্বে উন্মুক্ত করতে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যয় কমে যাবে। কাজেই বর্ধিষ্ণু অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের কালে জীবনযাত্রার মান ধরে রাখতে এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য একটি কল্যাণ নীতি তাই একটি দুর্দান্ত অর্থনৈতিক নীতি গঠন করবে। এ ধরনের নীতি কেবলমাত্র অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের রক্ষার জন্য গঠিত সামাজিক নীতির বিপরীত।

শিক্ষা ব্যবস্থা

যেহেতু আধুনিক শিল্প ও সেবাভিত্তিক সমাজের প্রকৃত 'মূল উপাদান' জ্ঞান ও এর সৃজনশীল ব্যবহার নিয়ে গঠিত, তাই শিক্ষা ব্যবস্থা একটি বিশ্বায়নকৃত অর্থনীতির উপর্যুপরি উন্নয়নের জন্য কৌশলগত গুরুত্ব বহন করে। সুইডেনে একটি উন্নত এবং কেবলমাত্র কিন্ডারগার্টেন ব্যবস্থা ছাড়া প্রাক-বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় বিনামূল্যের শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে।

সুইডেনে ৭-১৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং সব শিক্ষার্থী (ব্যাপক) গ্রুন্ডসকোলা (Grundskola) পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে। গ্রুন্ডসকোলা পর্যায়ে পাশকৃতদের প্রায় ৯০ ভাগ তিনবছর মেয়াদী জিমনাসিয়েসকোলা (Gymnasieskola) পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে। হগসকোলা (Hogskola) বা কলেজ হল তৃতীয় স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ১৯৭০ সালে সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়। অংশগ্রহণের যোগ্যতাসম্পন্ন যে কেউ তার পছন্দ অনুযায়ী বিষয়ে ভর্তি হতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত আসন খালি থাকে; অন্যথায় বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে তাদের একটি অপেক্ষমাণ তালিকায় রাখা হয়। এছাড়া সুইডেনে উন্নত মানের বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থাও রয়েছে।

পরিশেষেঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণির কৌশলগত গুরুত্ব

যতদিন মধ্যবিত্ত শ্রেণি কল্যাণ রাষ্ট্রের সুবিধাগুলোর মূল্যায়ন করবে ততদিন পর্যন্ত স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কল্যাণ রাষ্ট্র ব্যবস্থা টিকে থাকবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণি সিংহভাগ অবদান রাখে এবং প্রতিদানে একটি উন্নত মানের সেবা প্রত্যাশা করে। তবে যদি সরকারি বীমা সুবিধা মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রত্যাশা অনুযায়ী না হয় তবে তারা ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহী হবে। সাধারণত কোনো ব্যক্তিই দুইগুণ খরচ করতে চায় না। তাই মধ্যবর্তীভাবে তারা ভোটের মাধ্যমে উচ্চ করযুক্ত কল্যাণ রাষ্ট্রের বিরোধিতা করবে। এটি কেবলমাত্র দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিতদের অস্তিত্ব সর্বনিম্ন পর্যায়ে টিকিয়ে রাখার বিষয় নয়। হার্জ-৪ এর মতে বরং সমগ্র জাতিকে উচ্চ সুবিধা দেওয়াটাই হল মুখ্য। এটিই কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণার প্রশ্নে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার উত্তর।

সংবিধানে লিপিবদ্ধ ইতিবাচক ও নেতিবাচক নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে সুইডেনের মৌলিক অধিকার কোনোভাবেই কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতার খোলস নয়, বরং এটি বাস্তব সত্য। অতএব সুইডেনকে উচ্চ-সম্পৃক্ত সামাজিক গণতন্ত্র হিসেবে শ্রেণিকরণ করা যায়।

সুইডেন		
চাকরির হার ২০০৮	৭৪.৩% (৭১.৮%)	মোট জনসংখ্যার তুলনায় ১৫-৬৪ বয়সী মানুষের চাকরির হার (নারীদের) (সূত্র: ইউরোস্ট্যাট)
পুরুষের তুলনায় নারীর আয়	৬৭%	পুরুষের তুলনায় নারীর আয়ের হার (সূত্র: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স, ২০০৯, পৃ. ১৮৬)
বেকারত্বের হার ২০০৮	৬.২%	অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার মধ্যে বেকারের অনুপাত (সূত্র: ইউরোস্ট্যাট)
দীর্ঘ সময় ধরে বেকারত্বের হার ২০০৮	০.৮%	অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে (১২ মাস বা অধিক) বেকারের অনুপাত (সূত্র: ইউরোস্ট্যাট)
আয়ের অসমতা/ জিনি সহগ ২০০৯	২৫%	আয়ের অসমতা নির্দেশকারী অনুপাত মান যত বেশি অসমতা তত বেশি (সূত্র: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ২০০৯, পৃ. ১৯৫)
মানব দারিদ্র্য সূচক ২০০৯	৬.০%	মানব দারিদ্র্য সূচক কয়েকটি নির্দেশক নিয়ে গঠিত (গড় আয়ু, স্বাক্ষরতার হার, স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ) [০ = সর্বনিম্ন দারিদ্র্য, ১০০ = সর্বোচ্চ দারিদ্র্য] (সূত্র: হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ২০০৯ পৃ. ১৮০)
শিক্ষা লাভে আর্থ-সামাজিক পটভূমির গুরুত্ব ২০০৬	১০.৬%	আর্থ-সামাজিক পটভূমির কারণে শিক্ষার্থীদের ফলাফলের পার্থক্যের অনুপাত (সূত্র: ওইসিডি, ২০০৭)
শ্রমিক সংগঠনের ঘনত্ব ২০০৭	৭০.৮%	অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় মানুষের মধ্যে শ্রমিক সংগঠনের সাথে জড়িতদের অনুপাত (সূত্র: ওইসিডি, ২০০৭)

৬. উপসংহারে শুরু

সামাজিক গণতন্ত্রের ভিত্তির ওপর পড়াশোনা শেষ করার জন্য একজন পাঠকের সবচেয়ে সেরা উপায় কী? একভাবে এটি হতে পারে এই পড়াশোনার সারাংশ তৈরি করা, তাদের গুরুত্ব নির্ণয় করা আর তাদের যুক্তিগুলোর স্বপক্ষে নিজেদের দাঁড়াতে দেওয়া। কিন্তু এটি শুধু একটি খণ্ডচিত্র দেবে, যেহেতু এই বইতে আমরা দেখেছি যে ধারণাগত মডেল হিসেবে হোক বা রাজনৈতিক কাজ হিসেবেই হোক, সরলভাবে সামাজিক গণতন্ত্রের উপসংহারে পৌঁছানো যায় না। অন্যদিকে একটি ধারণা ও একটি রাজনৈতিক কাজ উভয় হিসেবেই সামাজিক গণতন্ত্রের পথকে বারবার পরীক্ষা করতে হবে, অভিযোজন করতে হবে আর পুনর্নির্মাণ করতে হবে, যদি একে সফলভাবে অনুসরণ করতে হয়।

সামাজিক গণতন্ত্রের বিতর্ক একটি আলাদা বিষয়, এই কারণে যে এটি স্থির থাকে না। কিন্তু সামাজিক গণতন্ত্র সমাজের বিকাশের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে, ঝুঁকি নেয় ও সুযোগ নেয় আর তারপর রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে। এই বৈশিষ্ট্য সামাজিক গণতন্ত্রকে অন্যান্য রাজনৈতিক মডেল থেকে আলাদা করে। এটি যা বলা হয়েছে তার সাথে লেগে থাকে না বা পরিবর্তিত বাস্তবতা ও নতুন সংকটের প্রতি অন্ধও থাকে না।

কিভাবে বিশ্বায়নকে মোকাবেলা করা যায় তা হবে অদূর ভবিষ্যতের মূল চ্যালেঞ্জগুলোর একটি। এতে যেমন ঝুঁকি আছে, তেমনি আবার সুযোগও আছে। জার্মানির এসডিপি তার হামবুর্গ কর্মসূচিতে এই চ্যালেঞ্জ নিয়েছে, যা বিশ্বায়নের বিভিন্ন বিষয় থেকে সামাজিক গণতন্ত্রের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত কাজ চিহ্নিত করে।

উন্নয়ন, ন্যায্যতা ও গণতন্ত্র

"একবিংশ শতাব্দী হচ্ছে প্রথম সত্যিকার বৈশ্বিক শতাব্দী। এর আগে কখনোই মানুষেরা বিশ্ব জুড়ে একে অপরের ওপর এত নির্ভরশীল ছিল না। [...] এই শতাব্দী হয় সামাজিক, পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি শতক হবে যা সবার জন্য সম্পদশীলতা, ন্যায্যতা ও গণতন্ত্র নিয়ে আসবে, অথবা এটি হবে বন্টন ও অনিয়ন্ত্রিত সহিংসতার তিক্ত যুদ্ধের একটি শতক। আমাদের শিল্পোন্নত দেশগুলোর বর্তমান জীবনযাত্রা পৃথিবীর পরিবেশগত টেকসই অবস্থাকে চাপে ফেলেছে ... যা ঝুঁকির মধ্যে আছে তা হল একটি সুন্দর ছিমছাম জীবন উপভোগের সুযোগ, বিশ্ব শান্তি আর আমাদের পৃথিবীর বাসযোগ্যতা।"

(হামবুর্গ কর্মসূচি ২০০৭: ৬)

ঠিকঠাকভাবে চলা পুঁজি ও আর্থিক বাজার

"একটি আধুনিক বৈশ্বিকভাবে আন্তঃসংযুক্ত জাতীয় অর্থনীতির প্রয়োজন ভালভাবে কার্যকর আর্থিক ও পুঁজি বাজার। আমরা গুণগত প্রবৃদ্ধির জন্য পুঁজি বাজারের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে চাই। [...]

যেখানে আর্থিক বাজার শুধু স্বল্পমেয়াদী লাভ করতে চায় সেখানে তারা উদ্যোক্তাদের দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধির কৌশল ব্যাহত করে, আর এভাবে কর্মসংস্থান নষ্ট করে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আমরা এমন বিনিয়োগকারীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য কর ও কোম্পানি আইন ব্যবহার করতে চাই যারা দ্রুত লাভের বদলে দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি চায়। ...পণ্য ও আর্থিক বাজারের মধ্যে ক্রমবৃদ্ধিমান আন্তর্জাতিক তদারকিও আরও জরুরি হয়ে পড়েছে।"

(হামবুর্গ কর্মসূচি ২০০৭: ৪৭)

উপযুক্ত কাজ (Decent Work)

"মানুষের যদি শুধু এমন সুযোগ থাকত যার ওপর তারা নির্ভর করতে পারে, তাহলে তারা তাদের প্রতিভা ও সক্ষমতার পুরোপুরি বিকাশ ঘটাতে পারত। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি উন্নতির গতি, বিশ্বে কাজের ও প্রবলতর প্রতিযোগিতার দ্রুত পরিবর্তন অনেক বেশি নমনীয়তা দাবি করে। একইসাথে তারা ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য আরও সুযোগ দেয়। ... নিরাপত্তা ও নমনীয়তা একসাথে করা ও এই পরিবর্তনের পথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা একটি আধুনিক কাজের সময়ের নীতি তৈরি করতে চাই, আর কর্মসংস্থান বীমা হিসেবে বেকার বীমার নতুন মডেল প্রবর্তন করতে চাই। ... কিন্তু নমনীয়তা যতদূর প্রয়োজন ও কাম্য; তার অবশ্যই অপপ্রয়োগ হতে পারে না। আমরা এমন কর্মসংস্থান উৎসাহিত করতে চাই যা স্থায়ী এবং সামাজিক বীমার ওপর নির্ভরশীল, আর আমরা অনিশ্চিত কর্মসংস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে চাই যেন কর্মীরা আর অরক্ষিত না থাকে।"

(হামবুর্গ কর্মসূচি ২০০৭: ৫৪ ছ)

ওপরের বিষয়গুলো থেকে দেখা যায় সামাজিক গণতন্ত্রকে সবসময়ই নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। আর তা করতে হয় এর ভিত্তি সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন থেকে ও বাস্তবতার স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে।

সামাজিক গণতন্ত্রের ওপর বিতর্কে অংশগ্রহণের জন্য আমরা আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং-এর আকাডেমি ফর সোশ্যাল ডেমোক্রাসি এই উদ্দেশ্যে একটি ক্ষেত্র তৈরি করেছে। সামাজিক গণতন্ত্রের মুখ্য মূল্যবোধ ও তাদের বাস্তবিক অনুশীলন নিম্নলিখিত আটটি সেমিনার মডিউলে আনা হয়েছে।

- সামাজিক গণতন্ত্রের ভিত্তি
- অর্থনীতি ও সামাজিক গণতন্ত্র
- কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ও সামাজিক গণতন্ত্র
- বিশ্বায়ন ও সামাজিক গণতন্ত্র
- ইউরোপ ও সামাজিক গণতন্ত্র
- একীকরণ, অভিবাসন ও সামাজিক গণতন্ত্র
- রাষ্ট্র, সুশীল সমাজ ও সামাজিক গণতন্ত্র
- শান্তি ও সামাজিক গণতন্ত্র

www.fes-soziale-demokratie.de

গ্রন্থপঞ্জী

Adler, Max (1926), *Neue Menschen. Gedanken über sozialistische Erziehung,* 2nd expanded edition, Berlin.

Aglietta, Michel (2000), *Ein neues Akkumulationsregime. Die Regulationstheorie auf dem Prüfstand,* translated by Marion Fisch, Hamburg.

Albers, Detlev, and Andrea Nahles (2007), *Linke Programmbausteine. Denkanstöße zum Hamburger Programm der SPD,* Berlin.

Altvater, Elmar (2006), *Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Eine radikale Kapitalismuskritik,* 4th edition, Münster.

Beck, Kurt, and Hubertus Heil (eds) (2007), *Soziale Demokratie im 21. Jahrhundert. Lesebuch zur Programmdebatte der SPD,* Berlin.

Benner, Dietrich, and Friedhelm Brüggen (1996), 'Das Konzept der Perfectibilité bei Jean-Jacques Rousseau. Ein Versuch, Rousseaus Programm theoretischer und praktischer Urteilsbildung problemgeschichtlich und systematisch zu lesen', in: Otto Hansmann (ed.), *Seminar: Der pädagogische Rousseau, Vol. 2: Kommentare, Interpretationen, Wirkungsgeschichte, Weinheim,* pp. 12–48.

Berlin, Isaiah (1958), *Two Concepts of Liberty,* Oxford.

Bernstein, Eduard (1899), *Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie,* Stuttgart.

Bieling, Hans-Jürgen, Klaus Dörre et al. (2001), *Flexibler Kapitalismus. Analysen, Kritik, politische Praxis,* Hamburg.

Bourdieu, Pierre et al. (1997), *The Weight of the World: Social Suffering in Contemporary Society,* Stanford.

Brinkmann, Ulrich Karoline Krenn and Sebastian Schief (eds) (2006), *Endspiel des Kooperativen Kapitalismus. Institutioneller Wandel unter den Bedingungen des marktzentrierten Paradigmas,* Wiesbaden.

Brinkmann, Ulrich, and Klaus Dörre et al. (2006), *Prekäre Arbeit. Ursachen, Ausmaß, soziale Folgen und subjektive Verarbeitungsformen unsicherer Beschäftigungsverhältnisse, Friedrich-Ebert-Stiftung,* Bonn.

Buchstein, Hubertus, Michael Hein and Dirk Jörke (2007), *Politische Theorien, Wochenschau für politische Erziehung, Sozial- und Gemeinschaftskunde*, Frankfurt am Main.

Carigiet, Erwin (2001), *Gesellschaftliche Solidarität. Prinzipien, Perspektiven und Weiterentwicklung der sozialen Sicherheit,* Basel, Geneva and Munich.

Castel, Robert (2000), *From Manual Workers to Wage Labourers: The Transformation of the Social Question,* translated from the French by Richard Boyd, New Brunswick and London: Transaction Publishers.

Castells, Manuel (2003), *The Information Age, Vol. 1: The Rise of the Network Society; Vol. 2: The Power of Identity; Vol. 3: End of Millennium,* Oxford: WileyBlackwell.

Dahl, Robert A. (2000), *Polyarchy: Participation and Opposition,* New Haven.

Demirovic, Alex (2007), *Demokratie in der Wirtschaft. Positionen, Probleme, Perspektiven,* Münster.

Dörre, Klaus (2005), *'Prekarität – eine arbeitspolitische Herausforderung,* in: WSI-Mitteilungen 5 / 2005, pp. 250–58.

Dowe, Dieter, and Kurt Klotzbach (eds) (2004), *Programmatische Dokumente der Deutschen Sozialdemokratie,* 4th revised and updated edition, Bonn.

Duncker, Hermann (1931), *'Einleitung', in: Max Beer, Allgemeine Geschichte des Sozialismus und der sozialen Kämpfe,* with additions by Dr Hermann Duncker, 7th edition, Berlin, p. 9.

Erler, Fritz (1947), *Sozialismus als Gegenwartsaufgabe,* Schwenningen.

Euchner, Walter, and Helga Grebing et al. (2005), *Geschichte der sozialen Ideen in Deutschland. Sozialismus – Katholische Soziallehre – Protestantische Sozialethik. Ein Handbuch,* 2nd edition, Wiesbaden.

Fraser, Nancy, and Axel Honneth (2003), *Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kontroverse,* Frankfurt am Main.

Grebing, Helga (2007), *Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Von der Revolution 1848 bis ins 21. Jahrhundert*, Berlin.

Hamburg Programme (SPD) (2007), *Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands*, agreed at the Hamburg Party Conference of the SPD, 28 October 2007.

Haverkate, Görg (1992), *Verfassungslehre. Verfassung als Gegenseitigkeitsordnung*, Munich.

Heidelmeyer, Wolfgang (ed.) (1997), *Die Menschenrechte. Erklärungen, Verfassungsartikel, internationale Abkommen,* 4th updated and expanded edition, Paderborn, Munich, Vienna and Zurich.

Heinrichs, Thomas (2002), *Freiheit und Gerechtigkeit. Philosophieren für eine neue linke Politik*, 1st edition, Münster.

Hondrich, Karl Otto, and Claudia Koch-Arzberger (1994), *Solidarität in der modernen Gesellschaft*, Frankfurt am Main.

Kant, Immanuel (1963), *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: Kants Werke in sechs Bänden*, edited by W. Weischedel, Vol. IV, Darmstadt.

Kersting, *Wolfgang (ed.) (2000), Politische Philosophie des Sozialstaats,* Weilerswist.

Kocka, Jürgen (1995) (ed.), *Bürgertum im 19. Jahrhundert,* Vol. 1: Einheit und Vielfalt Europas, Göttingen.

Lassalle, Ferdinand (1987), *Reden und Schriften, edited by Jürgen Friederici,* 1st edition, Leipzig.

Lehnert, Detlef (1983), *Sozialdemokratie zwischen Protestbewegung und Regierungspartei 1848–1983*, 1st edition, Frankfurt am Main.

Die Linke (2007), *Programmatische Eckpunkte der Partei Die* Linke. Available at: http://www.die-linke.de/ index.php?id=377 (accessed on 24 July 2009).

Locke, John (1988), T*wo Treatises of Government*, 3rd edition, Cambridge University Press.

Luxemburg, Rosa (1990 [1899]), *Sozialreform oder Revolution? Mit einem Anhang Miliz und Militarismus,* in: Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke, Vol. 1: 1893– 1905, part 1, 7th edition, Berlin, pp. 367–466.

Marx, Karl (1998), *Kritik der politischen Ökonomie (= MEW 23)*, Berlin.

Meidner, Rudof and Anna Hedborg (1984), *Modell Schweden. Erfahrungen einer Wohlfahrtsgesellschaft*, Frankfurt/New York.

Montesquieu, Charles de Secondat (1989), *The Spirit of the Laws*, edited and translated by Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller and Harold Samuel Stone, Cambridge University Press.

Merkel, Wolfgang et al. (2006), *Die Reformfähigkeit der Sozialdemokratie. Herausforderungen und Bilanz der Regierungspolitik in Westeuropa*, 1st edition, Wiesbaden.

Meyer, Thomas, in collaboration with Nicole Breyer (2005), *Die Zukunft der Sozialen Demokratie*, Bonn.

Meyer, Thomas (2005), *Theorie der Sozialen Demokratie*, 1st edition, Wiesbaden.

Meyer, Thomas (2006), *Praxis der Sozialen Demokratie*, 1st edition, Wiesbaden.

Neugebauer, Gero (2007), *Politische Milieus in Deutschland. Study,* Friedrich- Ebert-Stiftung, Bonn.

Platzeck, Matthias, Frank-Walter Steinmeier and Peer Steinbrück (eds) (2007), *Auf der Höhe der Zeit. Soziale Demokratie und Fortschritt im 21. Jahrhundert*, Berlin.

Nida-Rümelin, Julian, and Wolfgang Thierse (eds) (1997), *Philosophie und Politik*, 1st edition, Essen.

Plehwe, Dieter, and Bernhard Walpen (2001), *'Gedanken zu einer Soziologie der Intellektuellen des Neoliberalismus',* in: Hans-Jürgen Bieling, Klaus Dörre et al. (2001), Flexibler Kapitalismus. Analysen, Kritik, politische Praxis, Hamburg, pp. 225–39.

Rawls, John (1979), *A Theory of Justice,* revised edition, Harvard University Press.

Ritsert, Jürgen (1997), *Gerechtigkeit und Gleichheit*, 1st edition, Münster.

Rousseau, Jean-Jacques (1997), *Discourse on Inequality,* translated by Maurice Cranston, Harmondsworth: Penguin.

Schultheis, Franz, and Kristina Schulz (eds) (2005), *Gesellschaft mit begrenzter Haftung. Zumutungen und Leiden im deutschen Alltag*, Konstanz.

Sen, Amartya (1985), *Commodities and Capabilities*, Amsterdam.

Walzer, Michael (1997), *'Pluralismus und Demokratie',* in: Julian Nida-Rümelin und Wolfgang Thierse (1997), Philosophie und Politik, 1st edition, Essen, pp. 24–40.

সহায়ক গ্রন্থ

এই রিডারের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে যারা সামাজিক গণতন্ত্রের ভিত্তির ওপর আরো পড়তে চায় তাদের জন্য নিম্নলিখিত পাঠ্য সুপারিশ করা হচ্ছে।

সামাজিক গণতন্ত্র রিডার

Vaut, Simon et al.:
Reader 2: Economics and Social Democracy. 2011.
Division for International Cooperation,
Friedrich-Ebert-Stiftung
(ISBN: 978-3-86872-698-5)

কিভাবে একটি আধুনিক, মূল্যবোধ-নির্ভর সামাজিক গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নীতি সফল হতে পারে? কোন তত্ত্বের মধ্যে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও একতার ওপর ভিত্তি করে একটি অর্থনৈতিক নীতি আবেদন তৈরি করতে পারে? এর অধীনে কোন নীতিসমূহ থাকে? এবং সর্বোপরি: সেগুলো বাস্তবে কিভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে? অর্থনীতি ও সামাজিক গণতন্ত্রের ওপর এই রিডার এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইনস-এর তত্ত্বসমূহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থনীতির উত্তাল সময়ে, যেখানে এখনও অনেকে পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে চলছে, প্রত্যেকের নিজস্ব (অর্থনৈতিক) নীতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকা সর্বতো গুরুত্বপূর্ণ।

Petring, Alexander et al.:
Reader 3: Welfare State and Social Democracy. 2012.
Divison for International Cooperation,
Friedrich-Ebert-Stiftung
(ISBN 978-3-86498-103-6)

গণতন্ত্র ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক; রাজনৈতিক দলগুলোর সামাজিক নীতি সম্পর্কিত কর্মসূচি; বহুল আলোচিত সমালোচনা ও বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ: এই সকল বিষয়সমূহ 'কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ও সামাজিক গণতন্ত্র' শীর্ষক রিডারে আলোচনা করা হয়েছে। এর কেন্দ্রে যে সকল প্রশ্ন রয়েছে: করারোপ ব্যবস্থা, বেকারত্ব বীমা, অবসরভাতা, স্বাস্থ্য সেবা এবং শিক্ষার ওপর নীতি নির্ধারণে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের কোন্ কম্পাস ব্যবহার করতে হবে? তাত্ত্বিকভাবে ও বাস্তবিক অনুশীলনের অভিজ্ঞতার ওপর যে মৌলিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে তা এখানে পরিষ্কারভাবে ও যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

রাজনৈতিক ভাবনার ইতিহাস

Euchner, Walter, Helga Grebing et al.
Geschichte der sozialen Ideen in Deutschland. Sozialismus. Katholische Soziallehre. Protestantische Sozialethik. 2005.

সমাজতন্ত্র, ক্যাথলিক সামাজিক মতবাদ, এবং প্রটেস্ট্যান্ট সামাজিক নৈতিকতা কেন্দ্রিক ভাবনার ইতিহাসে সামাজিক আন্দোলন ও উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্কগুলো ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে এই সমন্বিত হ্যান্ডবুকে।

Langewiesche, Dieter:
Liberalismus und Sozialismus. Ausgewählte Beiträge. 2003.
Verlag J. H. W. Dietz Nachf. (ISBN: 978-3-8012-4132-2)

১৭টি নিবন্ধে টুবিনজেনের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ ডিটার ল্যানজিউইশে ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের সামাজিক মূল্যবোধসমূহ - উদারনৈতিকতাবাদ ও সমাজতন্ত্র - তাদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে কতটা গতিশীল ও পারস্পরিক প্রভাবশালী ছিল তা নিরীক্ষা করেছেন।

ফাউন্ডেশন

Meyer, Thomas:
Theory of Social Democracy. 2007 [original German edition: 2005].
Polity Press

বিশ্বায়নকৃত এই পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তারের জন্য দুটি শক্তি প্রতিযোগিতা করছে: আপেক্ষিক উদারনৈতিকতার গণতন্ত্র ও সামাজিক গণতন্ত্র। থমাস মেয়ার এখানে সামাজিক গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি পরিষ্কার করেছেন। এখানে নাগরিক ও রাজনৈতিক মৌলিক অধিকারের সাথে সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।

Meyer, Thomas, in collaboration with Nicole Breyer:
Die Zukunft der sozialen Demokratie. 2005.
Politische Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung. (ISBN: 3-89892-315-0)

এই প্রকাশনায় 'দ্য থিওরি অব সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি অ্যান্ড প্রাক্সিস ডার সোজিয়ালেন ডেমোক্রাটি'-এর অতি গুরুত্বপূর্ণ উপসংহারসমূহের সারাংশ করা হয়েছে।

জার্মানিতে সামাজিক গণতন্ত্র

Eppler, Erhard:
Eine Partei fur das zweite Jahrzehnt: die SPD? 2008.
Vorwarts buch Verlag. (ISBN: 978-3-86602-175-4)

এসপিডি'র একজন মতামত তৈরিকারী নেতা এরহার্ড এপলার শুধু তার দলের কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ সুবিধা নিয়ে লেখা একটি বই প্রকাশ করেছেন। কিভাবে গত সিকি শতাব্দীতে বাজার মৌলবাদীদের ভাবনা ইউরোপ ও জার্মানিকে বদলে দিয়েছে তার একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। এখন এমন একটি জার্মান সমাজের ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে যার ন্যায্যতার ধারণা গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আর এখানে ধনী ও গরিবদের ব্যবধান এমন একটি পর্যায়ে বেড়েছে যে একটি সামাজিক আন্দোলনের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

Gabriel, Sigmar:
Links neu denken. Politik fur die Mehrheit. 2008.
(ISBN: 978-3-492-05212-2)

সিগমার গ্যাব্রিয়েল একটি রাজনৈতিক ছক উপস্থাপন করেন যা বামপন্থী হওয়ার অর্থ কী সে বিষয়ে নতুন করে ভাবায়, আর হয় স্বীকৃতি না পাওয়ার মত হারিয়ে যাওয়া অথবা পুরানো বামপন্থী মডেলে ফিরে যাওয়ার মত একটি মারাত্মক ফাঁদ থেকে সাবধান করে। গ্যাব্রিয়েলের মতে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মন জয় করা যায় যথাযোগ্য নীতির মাধ্যমে, ক্ষমতার হিসাব-নিকাশ বা অন্তহীন বিতর্কের মাধ্যমে নয়। তিনি অন্তহীন ক্ষমতার রাজনীতি ও ব্যক্তিত্ব-ভিত্তিক বিতর্কের বাইরের রাজনীতিতে ফেরত যেতে বলেন।

Beck, Kurt, and Hubertus Heil (eds):
Soziale Demokratie im 21. Jahrhundert.
Lesebuch zur Programmdebatte der SPD. 2007.
Vorwärts Verlag. (ISBN: 978-3-86602-525-7)

এই বইয়ের সম্পাদকদ্বয় অন্যান্য লেখকের সাথে এই বিতর্কের কাঠামোয় একমত হয়েছেন যেখানে ভবিষ্যতের সংকট মোকাবেলায় দলের কর্মসূচি নিয়ে বিতর্ক ওঠে: কিভাবে আমরা বিশ্বায়নকে একটি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে পারি আর কাকে সাথে নিয়ে? ইউরোপের ভবিষ্যৎ কী? কিভাবে আমরা গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে পারি? আমাদের অর্থনীতি কিভাবে বিকশিত হতে পারে, আর একইসাথে সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা মেটাতে পারে? নতুন কর্মসংস্থান কোথা থেকে হবে আর প্রতিরোধমূলক কল্যাণ রাষ্ট্র কী অর্জন করতে পারে? জ্বালানি নিয়ে কী ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে পারে? সামাজিক গণতন্ত্র নিয়ে রাজনৈতিক জোটের ভবিষ্যৎ কী?

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সামাজিক গণতন্ত্র

Meyer, Thomas:
Praxis der Sozialen Demokratie. 2005.
VS Verlag für Sozialwissenschaften. (ISBN: 978-3-531-15179-3)

এই বইয়ে উপস্থাপিত হয়েছে থমাস মেয়ারের সামাজিক গণতন্ত্রের তত্ত্বের আলোকে স্বনামখ্যাত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সম্পন্ন বিভিন্ন দেশের ওপর সাম্প্রতিক গুণগত গবেষণা। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে সুইডেন, জাপান, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাষ্ট্র। সামাজিক গণতন্ত্রের পরিমাপক নতুন সূচকও এখানে অন্তর্ভুক্ত।

Krell, Christian:
Sozialdemokratie und Europa. Die Europapolitik von SPD, Labour Party und Parti Socialiste. 2009.
VS Verlag fur Sozialwissenschaften. (ISBN: 978-3-531-16498-4)

কোনো দলের ইউরোপ সংক্রান্ত নীতি কে আর কী নির্ধারণ করে? এর উত্তর খোঁজার জন্য ক্রিশ্চিয়ান ক্রেল তিনটি জাতীয় দলের ১৯৭৯ ও ২০০২ সালের ইউরোপীয় নীতির তুলনা করেন। দল তিনটি হচ্ছে জার্মানির এসপিডি, যুক্তরাজ্যের লেবার পার্টি ও ফ্রেঞ্চ পার্টি সোশিয়ালিস্টে। লেখক এই তিনটি দলের ইউরোপীয় একীভূত হওয়ার কৌশলে যোগাযোগ আর একইসাথে পরিষ্কার পার্থক্যও চিহ্নিত করেন।

Merkel, Wolfgang, Christoph Egle, Christian Henkes,
Tobias Ostheim and Alexander Petring:
Die Reformfähigkeit der Sozialdemokratie. Herausforderungen und Bilanz der Regierungspolitik in Westeuropa. 2005.
VS Verlag für Sozialwissenschaften. (ISBN: 978-3-531-14750-5)

১৯৯০ এর দশকের শেষ দিকে সামাজিক গণতান্ত্রিক দলগুলো বেশিরভাগ ইউ-ভুক্ত রাষ্ট্রগুলোতে সরকারে অংশগ্রহণ করছিল। এসব দল কতটুকু সফলভাবে তাদের সংস্কার নীতি বাস্তবায়ন করতে পেরেছিল? তারা কি কোনো একক 'তৃতীয় উপায়' অবলম্বন করেছিল? বিভিন্ন দেশের বিস্তারিত গবেষণার ওপর ভিত্তি করে জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস সুইডেন ও ডেনমার্কের সামাজিক গণতান্ত্রিক নীতির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে এই বইয়ে।

ইতিহাস

Dieter Dowe:
Von der Arbeiter- zur Volkspartei. Programmentwicklung der deutschen Sozialdemokratie seit dem 19. Jahrhundert. Reihe Gesprächskreis Geschichte 2007, Heft 71 (http://library.fes.de/pdf-files/historiker /04803.pdf)

একটি মুক্ত, গণতান্ত্রিক ও ন্যায্য রাষ্ট্র ও সমাজের ওপর কর্মসূচি ও চর্চা উভয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘস্থায়ী ও অন্তহীন বিতর্ক সাপেক্ষে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সময় থেকে সামাজিক গণতন্ত্রের ইতিহাস তুলে ধরেন ডিয়েটার ডাউই।

Grebing, Helga:
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung.
Von der Revolution 1848 bis ins 21. Jahrhundert. 2002.
Vorwarts Verlag. (ISBN: 978-3-86602-288-1)

বহু বছর ধরে দলগুলো তাদের শ্রম বাজার নীতির ওপর কতটুকু আস্থা বাড়াতে পেরেছিলো তার সক্ষমতার ওপর রাজনৈতিক সাফল্য নির্ভর করেছে। দীর্ঘদিন ধরে যে বিষয়ে ঘাটতি ছিল তা হচ্ছে ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য ঐতিহ্যবাহী কর্মসংস্থানের বাইরে একটি টেকসই মডেল। একটি সুন্দর জীবন যাপনের জন্য মানুষকে অবশ্যই সক্রিয় হতে হবে। কাজেই সবার জন্য কর্মসংস্থান নিয়ে শিল্প বিপ্লব-উত্তর জার্মানি কেমন হতে পারে? আর এই ক্ষেত্রে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে এসপিডি ও শ্রম আন্দোলনের কাজ কী হতে পারে?

Miller, Susanne, and Heinrich Potthoff:
Kleine Geschichte der SPD 1848–2002. 2002.
Verlag J. H. W. Dietz Nachf. (ISBN: 978-3-8012-0320-7)

'ব্রিফ হিস্ট্রি অব দি এসপিডি' একটি মানসম্পন্ন কাজ হিসেবে গণ্য হচ্ছে। এটি জার্মানির সবচেয়ে পুরানো রাজনৈতিক দলের শুরু থেকে গেরহার্ড শ্রোয়েডার-এর সরকার পর্যন্ত এর কাহিনী তুলে ধরে। পাঠকের এক নজরে দেখার জন্য একটি বছরভিত্তিক ক্রমপঞ্জী এখানে দেওয়া হয়েছে।

Schneider, Michael:
Kleine Geschichte der Gewerkschaften. Ihre Entwicklung in Deutschland von den Anfängen bis heute. 2000.
Verlag J. H. W. Dietz Nachf. (ISBN: 978-3-8012-0294-1)

মাইকেল স্নাইডার এখানে শিল্পায়নের সময়ে ট্রেড ইউনিয়নের শুরু থেকে বর্তমানের বিশ্বায়নের যুগের সমসাময়িক সংকটের সময় পর্যন্ত একটি বিস্তারিত ও সু-জ্ঞাত ইতিহাস উপস্থাপন করেছেন।

২০টি মূল শব্দ

১. শ্রমিক আন্দোলন

২. বার্লিন, ইসাইয়াহ

৩. গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র

৪. ফ্রেজার, ন্যান্সি

৫. স্বাধীনতা

৬. নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা

৭. ন্যায্যতা

৮. সমতা

৯. কান্ট, ইমানুয়েল

১০. পুঁজিবাদ

১১. রক্ষণশীলতা

১২. উদারনৈতিক গণতন্ত্র

১৩. উদারনৈতিকতা

১৪. আপেক্ষিক উদারনৈতিক গণতন্ত্র

১৫. লক, জন

১৬. রাউলস, জন

১৭. রুশো, জাঁ-জাক

১৮. একতা

১৯. সামাজিক গণতন্ত্র

২০. সামাজিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব (থমাস মেয়ার)

সিরিজের প্রশংসা

‘সামাজিক গণতন্ত্রের ওপর রিডারগুলো জটিল বিষয়গুলোকে সংক্ষেপে ও সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করে। প্রতিদিনকার রাজনীতির খুঁটিনাটি - কে, কী, কিভাবে এবং বিশেষকরে কেন - তার ওপর একটি ঠাসা সার্বিক পর্যালোচনা যা সোনার চেয়েও মূল্যবান।’

ডিয়ানে কোস্টার, ট্রেড ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক

‘সামাজিক গণতন্ত্রের ভিত্তির ওপর রিডার প্রকৃতই একটি টনিক। যখন রাজনৈতিক পার্থক্য দুর্বল হয়ে যায়, এমন সময়গুলোতে কোনো একজনের রাজনৈতিক কার্যক্রমের ভিত্তি আবার নিশ্চিত করার সামর্থ্য উৎসাহব্যঞ্জক। পাঠকের কাছে প্রত্যাশা তত্ত্বীয় ও চর্চা উভয় ক্ষেত্রেই সামাজিক গণতন্ত্রের বিভিন্ন দিকের প্রতি সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখার। এটি রাজনৈতিক বিবেচনাকে আরও ধারালো করে। এই বইয়ে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা সার্বিক চিত্রকে ঝাপসা করে দেয় না। এই বিষয়ের পরিষ্কার কাঠামো ও সংগঠন বিশেষ আগ্রহের বিষয়বস্তু খুঁজে পেতে সাহায্য করে। এক কথায়: অতিরিক্ত সরলীকরণ ছাড়া পরিষ্কার ধারণা।’

উলরিকে উইট, পিইএস অ্যাকটিভিস্ট গ্রুপ গটিনজেন

‘এক কথায় বলা যায়, সামাজিক গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর বিভিন্ন ধরনের পাঠকের জন্য লেখার কঠিন কাজটিতে সফল হয়েছেন লেখকরা। যেভাবে এই বিষয়কে সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেজন্য এই বইটি [সামাজিক গণতন্ত্রের ভিত্তি] বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য। যেসব লেখা থেকে এটি নেওয়া হয়েছে তা স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আর বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জী, অনেক চিত্র, পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত প্রক্রিয়া, প্রত্যেক দার্শনিকের জীবনীর ওপর মন্তব্য, বর্তমান বিতর্ক থেকে নেওয়া বাস্তবে প্রাসঙ্গিক কর্মসূচিভিত্তিক দ্বন্দ্বের বিষয় এই বইয়ে দেওয়া হয়েছে। একইসাথে এটি এএসডি’র সেমিনার ও স্বতন্ত্রভাবে রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা ও কার্যক্রমের জন্য ব্যবহারযোগ্য।’

মাইকেল রেশকে, কাসেল বিশ্ববিদ্যালয়

‘সামাজিক গণতন্ত্র ও অর্থনীতি রিডার এমন ব্যক্তিদের জন্য খুবই সহায়ক যারা তাদের কর্মক্ষেত্রের “অর্থনৈতিক জীবনের” অভিজ্ঞতা কী হবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে, অথবা ভোক্তা হিসেবে “সামাজিক রাষ্ট্র” অর্থ সংবিধানে কী বলা হয়েছে তা নিয়ে সন্দিগ্ধ থাকে।’
জোসেফ ভট, এসপিডি, আইজি-মেটল ও এডব্লিউও এর বহু পুরানো সদস্য

‘চলমান নাটকীয় অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষাপটে একটি যুগোপযোগী সামাজিক, গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতির প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যা আর্থিক খাতে শুধু প্রতিদিনকার সমস্যা মোকাবেলা করার চেয়েও বেশি কিছু করবে। পাঠ্য হিসেবে আর রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জন্য এটি একটি খুবই পাঠযোগ্য রিডার, যারা এফইএস-এর অ্যাকাডেমি ফর সোশাল ডেমোক্র্যাসি’র [অর্থনীতি ও সামাজিক গণতন্ত্র] কার্যক্রম ও সেমিনার থেকে উঠে এসেছে। এটি খুব সুন্দরভাবে অর্থনীতিতে অনভিজ্ঞদের জন্যও অর্থনৈতিক নীতির ধারণা ও চর্চার একটি সার্বিক ইতিহাস তুলে ধরে।’
উলরিক হরনিং, রেফারেন্ট ইম বুন্দেসমিনিস্টারিয়াম ফুর ফিনানজেন, জুলাই ২০০৯

‘সামাজিক নীতি নিয়ে তীব্রভাবে বিতর্ক হয়। বাস্তবে অন্য কোনো বিষয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তাদের মূল অবস্থান নিয়ে এত তীব্র মতভেদ তৈরি করে না। [সামাজিক গণতন্ত্র] রিডার ৩: কল্যাণ রাষ্ট্র ও সামাজিক গণতন্ত্র একজন ব্যক্তিকে এসব বিতর্কের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করে। এই বইয়ে ন্যায্যতার বিভিন্ন ধারণার আলোচনা রয়েছে। এটি দেখায় কে কোন ধরনের কল্যাণ রাষ্ট্র চায় আর ব্যাখ্যা করে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কল্যাণ রাষ্ট্রগুলো থেকে আমরা কী শিখতে পারি। এই প্রক্রিয়ায় এটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে সামাজিক নীতি নিয়ে যেকোনো আলোচনা একইসাথে বণ্টনের আলোচনাও। কাজ, অবসর ভাতা, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা/ প্রশিক্ষণ সবার জন্য সমানভাবে আয়োজিত হতে হবে, আর আজকে অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে একতার ভিত্তিতে অর্থায়িত হতে হবে। রিডার ৩ এসব বিষয়ই আরও গুরুত্বের সাথে আর বোধগম্যভাবে আলোচনা করে।’
সাশা ভট, ডেপুটি ফেডারেল চেয়ার, জুসো

লেখক পরিচিতি

জুলিয়া ব্লাসিয়াস (*১৯৮১) ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং -এর আন্তর্জাতিক ডায়ালগ বিভাগের একজন কর্মী। তিনি পাসাউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষা, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। এরপর তিনি লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস থেকে ইউরোপিয় রাজনৈতিক অর্থনীতি থেকে এমএসসি লাভ করেন।

ফ্রেডেরিক বোল (*১৯৮৩) মুনস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী, যিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে সাথে যোগাযোগ ও মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছেন।

জোকেন ডাম (*১৯৮১) ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং -এর পলিটিক্যাল অ্যাকাডেমির একজন কর্মী। তিনি মুনস্টার ও মালাগা থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, যোগাযোগ বিজ্ঞান ও পাবলিক আইন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন।

ড. ক্রিস্টোফ এগলে (*১৯৭৪) মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষণা সহযোগী। স্নাতক পর্যায়ে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও দর্শন নিয়ে পড়েছেন, আর জার্মানি ও ফ্রান্সে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি সংস্কার নিয়ে ডক্টরেট করেছেন। ২০০১ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত তিনি হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণা প্রকল্পে জড়িত ছিলেন, যেখানে পশ্চিম ইউরোপিয় দেশগুলোতে সামাজিক গণতান্ত্রিক সংস্কার নীতির তুলনা নিয়ে কাজ করা হয়।

টোবিয়াস গোমবার্ট (*১৯৭৫) ওয়ার্কস কাউন্সিলের হয়ে সেমিনার আয়োজন করেন। তিনি যোগাযোগ ও তত্ত্ব বিষয়ে সেমিনার ও কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবেও কাজ করেন। ২০০৩ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত সময়ে তিনি এসপিডি'র ইয়াং সোশালিস্টস এর ডেপুটি চেয়ার এবং ২০০৫ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত সময়ে জাতীয় নির্বাহী কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। ২০০৭ থেকে অ্যাকাডেমি অব সোশাল ডেমোক্র্যাসি'র একজন প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন। এই সময়ে তিনি ইয়াং সোশালিস্ট অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠায় অংশ নিয়েছেন। তাঁর অ্যাকাডেমিক কাজের বিষয় ছিল জাঁ জাক রুশো, মার্ক্সীয় তত্ত্ব ও নৈতিক দর্শন।

ড. এরিক গুরসডিয়েস (*১৯৪৪) ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং -এর মেকলেনবার্গ-ভরপমার্ন আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ছিলেন। তাঁর পড়াশোনা অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে। এরপর তিনি বার্গনেউসটাট ও আরেনসবার্গ-এ বয়স্ক শিক্ষা ইনস্টিটিউটে অর্থনীতির প্রভাষক হিসেবে কাজ করেন। একইসাথে তিনি হামবুর্গ স্কুল অব ইকোনমিকস অ্যান্ড পলিটিকস-এর প্রভাষক ছিলেন।

মার্ক হারটার (*১৯৭৪) হাম-এ (ওয়েস্টফালিয়া) এসপিডি কাউন্সিল গ্রুপের সভাপতি। তিনি মুনস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করছেন। ২০০২ সাল থেকে তিনি এনআরডব্লিউ-এসপিডি'র আঞ্চলিক নির্বাহী কমিটির একজন সদস্য, আর ২০০৬ সাল থেকে এই আঞ্চলিক দলের স্টিয়ারিং কমিটিরও একজন সদস্য।

ড. ক্রিশ্চিয়ান ক্রেল (*১৯৭৭) ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং -এর একজন সদস্য, এবং অ্যাকাডেমি অব সোশাল ডেমোক্র্যাসি'র জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। তিনি সাইজেন বিশ্ববিদ্যালয় ও ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। ২০০৭ সালে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর বিষয় ছিল এসপিডি, লেবার পার্টি ও পার্টি সোশালিস্টে'র ইউরোপিয় নীতি।

ড. ইউন-জিউং লি (*১৯৬৩) ২০০৮ সাল থেকে বার্লিনের ফ্রি ইউনিভার্সিটির কোরিয়ান স্টাডিজ-এর প্রধান। তিনি সোল-এর এহওয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও গিওর্গ-অগাস্ট বিশ্ববিদ্যালয় গটিনজেন-এ পড়াশোনা করেছেন, আর শেষের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করেছেন। ২০০১ সালে মার্টিন লুথার ইউনিভার্সিটি হল-উইটেনবার্গ-এ হ্যাবিলিটেশন সমাপ্ত করেন আর সেখানে অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর হিসেবে শিক্ষা দেন। তিনি আলেক্সান্ডার ভন হামবোল্ট স্টিফটুং থেকে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ লাভ করেন। তিনি জাপান ফাউন্ডেশনের একজন ফেলো আর টোকিও'র চুও ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং রিসার্চ ফেলো। বর্তমানে তিনি জার্মানি ও কোরিয়ায় শিক্ষকতা করছেন।

ম্যাথিয়াস নেইস (*১৯৭৬) মুনস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও যোগাযোগ নিয়ে পড়াশোনা করেন। ২০০৪ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি রেকলিংহাউজেন-এ 'আরবেইট-বিলডুং-পাটিজিপেশন' রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সহকারী গবেষক হিসেবে কাজ করেন। ২০০৬ সাল থেকে তিনি ফ্রিয়েডরিখ শিলার ইউনিভার্সিটি জেনার এইচবিএস প্রকল্প 'অ্যাকাডেমিক স্পন্সরশিপ অ্যাজ অ্যান ইকোনমিক ফ্যাক্টর' বিষয়ে গবেষণা সহকারী হিসেবে কাজ করছেন।

ক্রিস্টিনা রেনশ (*১৯৮২) মুনস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছেন। এর আগে তিনি কোলন-এ বিজ্ঞাপনের ওপর প্রশিক্ষণ নেন।

মার্টিন টিমপে (*১৯৭৮) এসপিডি'র ইয়াং সোশালিস্টস এর বিশ্ববিদ্যালয় দলের ফেডারেল এক্সিকিউটিভ। ২০০৭ সাল থেকে তিনি অ্যাকাডেমি অব সোশাল ডেমোক্র্যাসি'র একজন সেমিনার লিডার। তিনি ফ্রি ইউনিভার্সিটি বার্লিনের অটো-সুর ইনস্টিটিউটে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছেন।

রাজনীতি বুঝতে প্রয়োজন এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা: যারা তাদের লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম তারাই শুধুমাত্র তা অর্জন করতে এবং অপরকে উৎসাহিত করতে পারে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে সামাজিক গণতন্ত্রের ভিত্তির ওপর এই রিডারটি একুশ শতকের সামাজিক গণতন্ত্রের অর্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। এর অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ কী কী? এর লক্ষ্য কী? এটা কিভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করা যেতে পারে?

এই রিডারের বিষয়বস্তু 'অ্যাকাডেমি ফর সোশ্যাল ডেমোক্রাসি'-এর সেমিনারের সাথে সম্পর্কিত। যে সকল মানুষ রাজনীতির সাথে জড়িত এবং এ সম্পর্কে আগ্রহী তাদের জন্য ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং এই অ্যাকাডেমি ফর সোশ্যাল ডেমোক্রাসি গঠন করেছে।

এই অ্যাকাডেমি সম্পর্কে আরো জানার জন্য: www.fes-soziale-demokratie.de

"সামাজিক গণতন্ত্রের ভিত্তির ওপর এই রিডারটি প্রকৃতই বলবর্ধক ঔষধ। একটি সময়ে যখন মনে হচ্ছিল রাজনৈতিক পার্থক্য অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন একটি রাজনৈতিক কার্যক্রমের ভিত্তির পুনর্ব্যক্ত করতে সক্ষম হওয়া উৎসাহব্যঞ্জক।"

-আলরিকে উইট, পিইএস অ্যাকটিভিস্ট গ্রুপ গটিনজেন

"এএসডি'র সেমিনারের একটি সহচর এবং স্বাধীনভাবে, রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কাজের ওপর একটি প্রাথমিক গাইড উভয়ই পাওয়া যাবে এই বইয়ে।"

-মাইকেল রেসককে, ইউনিভার্সিতাত কাসেল

ISBN 978-984-33-9769-0